পাভলভ পরিচিতি

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



পাভলভ পরিচিতি

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাভলভ পরিচিতি

প্রথম পর্ব

প্রথম খণ্ড ।। পাভলভীয় মনোবিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড ।। পাভলভ ফ্রয়েড
পাভলভ-স্কীনার

● সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত ●

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-বম্বে-দিল্লী-হায়দ্রাবাদ

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৮৪

প্রকাশক :
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩২/১এ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

পরিবেশক :
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ দাশ
মুদ্রাকর প্রেস
১০/১ সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম বসু

দাম : টাঃ ৪০·০০
£ 4·00
$ 9·50

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ

কবি অরুণাচল বসুর স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

আজ মনোবিদ্যার প্রয়োগ ব্যক্তি ও সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দর্শনের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করা সত্ত্বেও মনোবিদ্যা কিন্তু আজও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। মনোবিদ্যায় পরীক্ষামূলক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মী বহুবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালিত করছেন, অজস্র তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে, প্রচুর প্রকল্প গঠিত হচ্ছে ; কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো তত্ত্ব এখনও গড়ে ওঠেনি। মনোবিদ্যা বহু শাখা উপশাখায় খণ্ডিত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে ; শিশুচর্যায়, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যরক্ষায়, শিল্পায়নে, উৎপাদনে, সামাজিক ব্যাপারে—সর্বত্র মনোবিদদের অভিমত গ্রহণের প্রবণতা সব দেশে পরিদৃষ্ট হচ্ছে ; কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী অভিমত সাধারণ মানুষ ও মনোবিদ্যার ছাত্রদের বিভ্রান্ত করছে।

দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্য সমর্থিত করতে চাই।

বুকের দুধ পান করিয়ে ছেলে মানুষ করার পদ্ধতি প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে থেকে পশ্চিমী দেশে অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলে গণ্য হয়। বোতলের দুধ শুধু দেহের নয়, মনের পুষ্টির পক্ষেও অপরিহার্য—এই বিশ্বাস যখন প্রায় বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে, তখন *American Journal of Psychiatry* (1961)-তে অ্যাশলে মণ্টেগু লিখলেন যে অন্তত নয় মাস পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো উচিত (breast feeding is indispensably necessary)। যে-সমাজে অন্য প্রথা গৃহীত হয়েছে, সেখানে অনিবার্যভাবে মনোরোগীর সংখ্যা বাড়বে। এই বক্তব্য প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ৯৪টি শিশু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে মণ্টেগুর অভিমতের কোনো গুরুত্ব নেই ; বুকের দুধ পান শিশুদের মানসিকতাকে আদৌ প্রভাবিত করে না ; পারিবারিক আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ থাকলেই শিশুমন সুস্থভাবে গড়ে উঠবে। আর-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে হস্তমৈথুনকে দেহ-মনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর মনে করা হ'ত। অস্বাভাবিক উপায়ে যৌন উত্তেজনা ও বীর্যক্ষয়—শুধু গুরুতর অপরাধ নয়—ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ, পক্ষাঘাত, স্মৃতিশক্তিহীনতা, উন্মত্ততা ইত্যাদির কারণ এবং আসক্তদের পরবর্তীকালে আত্মঘাতী হবার সম্ভাবনা থাকে।

ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিবাগিশদের অভিমতের কথা বলছি না, চিকিৎসকরা এই মত পোষণ করতেন। ফ্রয়েডের শিশু-যৌনতা সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রচারিত হবার পর এই ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সুবিখ্যাত 'কিন্‌সে প্রতিবেদনে'র অন্যতম রচয়িতা মনস্তাত্ত্বিক ওয়ার্ডেল পমেরয় সম্প্রতি আমেরিকার একটি পত্রিকায় লিখেছেন : "হস্তমৈথুন বিততি-মুক্তির (tension-release) একটি অনুমোদিত উপায়, আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য হবে এই উপায়কে চিকিৎসাপদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা এবং আনন্দ উৎপাদনের উৎস রূপে গণ্য করা।" শুধু শিশুমনের বিকাশে শিশুর আচরণ নির্ধারণ ও শিক্ষার ব্যাপারে নয় ;—মনস্তাত্ত্বিকদের এই ধরনের বিপরীত মতামত প্রায় সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় ও তার ভিত্তিতে বুদ্ধির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে যত বেশী উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, তত বেশী বিতর্কের ঝড় উঠছে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে।

মনোবিদ্যার শাখা উপশাখা যত, তার থেকে বেশী বোধহয় বিভিন্ন মতাবলম্বী ও পৃথক পৃথক পদ্ধতি অনুসরণকারী দল ও উপদলের অস্তিত্ব। জ্যানেট, ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার, ম্যাক্‌ডুগাল, হর্নি, ফ্রম, মীড—প্রমুখ প্রবৃত্তিবাদী অন্তর্দর্শীদের তবুও এক গোষ্ঠীতে ফেলা যায় ; শারীরবৃত্তিক, জীববিদ্যাভিত্তিক, ব্যবহারবাদী ও শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক ইত্যাদি মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে কিন্তু এক গোত্রীভূত করা চলে না। গেস্টাল্‌টবাদী ও অস্তিত্ববাদী মনোবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী ; আবার মানবতাবাদী মনোবিদ্যা সব দলের কিছু কিছু মেনে নিয়েও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষপাতী।

কাজেই মনোবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই, মানসিকতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নিরূপণের চেষ্টা নেই। যাঁরা গবেষণাগারে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে উপাত্ত সংগ্রহে ব্রতী, শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা, জৈবরসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিভাগের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অনুসন্ধানে চেষ্টিত,—তাঁরাও বস্তুবাদী বিজ্ঞান সমর্থিত সামগ্রিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বা সমর্থনের ব্যাপারে অনীহ। পশুমন ও মানবমনকে হয় যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমীকৃত করছেন, অথবা মানবমনকে পরমাত্মার অংশজ্ঞানে শেরিংটনের মতো পরীক্ষানিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে ভাবতে পারছেন না। আবার, মনোবিদ্যাচর্চারত অনেকেই গ্রহণবর্জন ব্যাপারে উদারপন্থী ; বহুতত্ত্বভিত্তিক বা মিশ্রতত্ত্বভিত্তিক মতবাদের পক্ষপাতী : সাইকোঅ্যানালিটিক তত্ত্ব, গেস্টাল্টতত্ত্ব, ব্যবহারবাদ, অস্তিত্ববাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ ইত্যাদি সব তত্ত্বের মধ্যেই কিছু কিছু সারবস্তু আছে—সুবিধামতো, প্রয়োজনমতো, বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করাই বিধেয়। এক কথায় বলা চলে, মনোবিদ্যার

প্রয়োগ ও গবেষণায় এখনও অপরিকল্পিত খেয়ালী মনোভাবের প্রাধান্য। সঠিক বিজ্ঞানী মনোভাব খুব বেশী নজরে পড়ে না। শারীরবৃত্তিক জীববিদ্যাভিত্তিক মনস্তত্ত্বের গবেষকরাও তাঁদের পরীক্ষানিরীক্ষার বাইরের কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যায় সমাজে প্রচলিত ধারণা অথবা জনপ্রিয় ফ্রয়েডবাদের প্রয়োগে অভ্যস্ত। এই প্রসঙ্গে বছর কয়েক আগে আমস্টার্ডাম থেকে প্রকাশিত 'Biological Psychology'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যের উল্লেখ করতে পারি। সম্পাদক লিখেছেন: বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োফিজিক্স-এর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে পরীক্ষানিরীক্ষাভিত্তিক মনোবিদ্যার গবেষণা দ্রুতায়িত হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কার্যত সেটা সম্ভবপর হয়নি; কারণ জীববিজ্ঞান ও আচরণবিজ্ঞানের পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির সম্পর্ক বিবৃত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার (but in practice this potential advantage is offset by the difficulty in delineating the relationship between the behavioural and biological sciences): অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় এই সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব হয়েছে এবং সেই সম্পর্ক ভিত্তি করে Biological Psychology গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ—জটিল মননক্রিয়ার কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা জ্ঞেয়; বাদবাকি অজ্ঞেয় বা রহস্যাশ্রিত। নতুন পদ্ধতি ও নতুন ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্জ্ঞেয় স্থানেও যে আলোকপাত সম্ভব—এ-কথা সম্পাদক বলতে চান না। মানবমন সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ল্যাবরেটরিতে বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে জীববিদ্যা-ভিত্তিক মনোবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করতে চান—সামগ্রিক কোনো তত্ত্ব গড়তে চান না। ভাববাদী বিষয়ীমুখীন দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার ইচ্ছে এঁদের নেই।

এইসব দ্বিধাগ্রস্তদের বাদ দিলে, মনোবিদ্যাকে আমরা তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি: (১) ভাববাদ ও দ্বয়বাদাশ্রিত অধিমনোবিদ্যা অভিহিত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব; (২) যান্ত্রিক জড়বাদপুষ্ট থর্নডাইক স্কিনারের ব্যবহারবাদী মনস্তত্ত্ব; (৩) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদসম্ভূত পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব।

দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল মনস্তত্ত্ব, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। বস্তুবাদ ও ভাববাদ গ্রীস, রোম ও ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস, লুক্রেটিয়াস সম্বন্ধে আমরা পুঁথিপুস্তক থেকে যতটা জানতে পারি, চার্বাক সম্পর্কে ততটা জানি না। এঁদের মতে মানবমনের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, ব্যবহার—এককথায়, মানসিকতা—পার্থিব ও সামাজিক কারণ থেকে উদ্ভূত। অপর পক্ষে, প্লেটো

এবং অ্যারিস্টটলের মতে মানবপ্রকৃতি স্বভাবজাত ; প্লেটোর মতে ঈশ্বরদত্ত, অ্যারিস্টটলের মতে জৈবিক ও অন্তর্নিহিত,—জন্মগত। আমাদের পরিচিত ভারতীয় দর্শনেও অনেকটা এই ধরনের কথাই আছে।

প্রথম দলের, অর্থাৎ বস্তুবাদীদের তত্ত্বই অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ ব্যবহারবাদী মনোবিদ্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ধরনের মতবাদ ধর্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা পরিপন্থী এবং রাজনৈতিক দিক থেকে 'র‍্যাডিক্যাল' নামে বিশেষিত। সমাজ বা রাষ্ট্র পরিবর্তনে এই পরিবেশবাদ অনেক সময় বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছে। এঁদের মতে সামাজিক দুর্নীতির জন্য ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রকৃতি দায়ী নয়। দায়ী সামাজিক সংগঠন। দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের মতবাদকে যান্ত্রিক জড়বাদপুষ্ট বলা হয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কিছুমাত্র দায়ী না করে কেবলমাত্র সমাজ সংগঠনকে দায়ী করা চলে কি? এই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও সফল করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। জন লকের 'ট্যাবুলা রাজা' (tabula raza) তত্ত্ব ব্রিটেন আমেরিকায় একসময় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দলের ধারণা সব দেশের ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক ও অনেক দেশের শাসকশ্রেণী কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। মানবপ্রকৃতির সবকিছু অন্তর্নিহিত ঈশ্বর প্রদত্ত, অথবা জৈবধর্ম ও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ও অপরিবর্তনীয়—এ-মতবাদ শাসক-শ্রেণী দ্বারা সমর্থিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। অ্যারিস্টটল কর্তৃক প্লেটোর মতবাদ কিছুটা সংশোধিত হলেও শাসকশ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ভীতির কারণ ঘটেনি। পরবর্তীকালে অগস্টিন প্লেটোর মতবাদের প্রবক্তা এবং অ্যাকুইনাস অ্যারিস্টটলের প্রচারক হয়ে ইয়োরোপের জনসমাজে এই মতবাদের প্রসার ঘটান। সমাজে শ্রেণীআধিপত্য বজায় রাখার দিক থেকে এই মতবাদ বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। দু'হাজার বছর ধরে মানুষ বিশ্বাস করে আসছিল যে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজবিন্যাস গড়ে ওঠে। কোনো ব্যক্তির প্রকৃতি-গত দিক ক্রীতদাস হবার উপযুক্ত বলেই সে ক্রীতদাস ; আর প্রভুত্বের গুণাবলী প্রকৃতিতে নিহিত থাকার দরুনই সামন্তরাজ প্রভু। এইভাবে সমাজে জাতি-প্রাধান্য, শ্রেণীপ্রাধান্য, ব্যক্তিপ্রাধান্য, পুরুষপ্রাধান্যের সরলীকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনও বিজ্ঞানসমর্থিত হতে পারে না। ফ্রয়েড ও ফ্রমের সাইকো-অ্যানালিটিকতত্ত্ব এই ধারণারই যুগোপযোগী মার্জিত রূপ।

উপরোক্ত দু'ধরনের মতবাদই একদেশদর্শিতাদুষ্ট। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা নিঃসন্দেহে বিশেষ মানবিক ধর্মের অধিকারী হয়েছে ; কিন্তু মানবসমাজের মধ্যে থেকে উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে মানবিক কোনো বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ ঘটতে পারে না—এই হচ্ছে পাভলভীয় অভিমত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতা বিকাশের

সঠিক ধারণা গঠন সম্ভব নয়। 'পাভলভ পরিচিতি' তিন খণ্ডে বিজ্ঞান সমর্থিত এই কথাটি বলবার চেষ্টা করেছি।

আজ বহুবছর ধরে 'নেচার ও নারচার' (nature and nurture)-এর 'যথাযথ সংমিশ্রণ' তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে; এবং বর্তমান কালের বেশির ভাগ মনস্তাত্ত্বিকই এই তত্ত্বের সমর্থক। তবে সংমিশ্রণের পদ্ধতি ও নিয়ম সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'শিশুমনের ক্রমবিকাশ'-এ এ-বিষয় আলোচিত হয়েছে।

প্রতিটি যৌনকোষে প্রায় ৩০,০০০ জিন আছে। ডিম্বকোষ ও শুক্রকীটের মিলনের পর দুই কোষের জিনের মিশ্রণ ঘটে এবং তাদের অবস্থান, সংগঠনের শৃংখলা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন ও বিন্যাস বর্তমানে বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন নয়। এই জিনের পুনর্বিন্যাস থেকে দৈহিক সব কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় ঠিকই; কিন্তু মানসিকতা গঠনে জিনের ভূমিকা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আজকের বিজ্ঞান শুধু এইটুকু বলতে পারে যে গর্ভসঞ্চারের পর থেকে কুলসংক্রমণকারী জিনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটতে থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধি মায়ের স্বাস্থ্য, অভ্যাস ও পরিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গর্ভাবস্থায় সুরা ও মাদক সেবন, রোগ ও সুষম খাদ্যের অভাব ভ্রূণকে প্রভাবিত করে। চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে জন্মের সময়কার ওজনের বেশিকমের সঙ্গে (ওজন মায়ের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ওপর প্রধানত নির্ভর করে) ভবিষ্যতের, বিশেষ করে পাঁচ বছর অবধি বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। দরিদ্র মাতাপিতার সন্তান শৈশব থেকেই অসুবিধার বোঝা কাঁধে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভ্রূণের লিঙ্গপার্থক্যের ব্যাপারে ক্রোমোজোমের ভূমিকা স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে XY ক্রোমোজোম-ধারীরা XX ক্রোমোজোমধারীদের তুলনায় হীন নয়। তেমনি জাতিবৈশিষ্ট্য শারীরিক পার্থক্যের দিক থেকে অনেকখানি জিননির্দিষ্ট হলেও বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতার সঙ্গে জিনের কোনো সম্পর্ক এখনও জানা যায়নি।

কাজেই মানসিকতার ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য, জাতিপ্রাধান্য ও শ্রেণীপ্রাধান্য যদি কোনো দলের মনোবিদ্যার তত্ত্ব কর্তৃক সমর্থিত হয়, বুঝতে হবে তাঁরা প্লেটো অ্যারিস্টটল, আগাস্টিন অ্যাকুইনাস দ্বারা প্রধানত প্রভাবিত; বিজ্ঞানবুদ্ধি তাঁদের কাছে গৌণ।

পৃথিবীর মানুষ আজ জাতিগত, শ্রেণীগত, লিঙ্গগত ইত্যাদি সবরকমের বৈষম্য দূর করতে চায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কাছে মানুষ জানতে চায় তাদের সমসমাজ গড়ে তোলবার আকাঙ্খা বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক ও চারিত্রিক সংশোধন শিক্ষাসাপেক্ষ কিনা?

পাভলভ পরিচিতির তিন খণ্ডে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টা আছে।

আমরা এই খণ্ডে প্রথমে পাভলভের মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিদ্যা ও পরে প্রধানত পাভলভ ও ফ্রয়েডের তত্ব ও প্রয়োগপদ্ধতির পার্থক্যের পরিচয় দিয়েছি। বিবরণ যতদূর সম্ভব সরল করবার চেষ্টায় কতদূর সাফল্য লাভ করেছি—তার বিচার করবেন পাঠক। অতিসংক্ষিপ্ত এই পরিচয়ে অনেক কিছুই হয়তো বলা সম্ভব হয়নি। তবে মোটামুটি ফ্রয়েডবাদ ও পাভলভীয় তত্ত্বের সারমর্ম বোধহয় পাঠককে জানাতে পেরেছি। স্থানাভাবে পাভলভ ও স্কিনার সম্পর্কিত আলোচনা অতি সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। আমাদের দেশের ব্যবহারবাদী মনস্তত্ব বা চিকিৎসা এখনও সীমিত একাংশের মধ্যেই আবদ্ধ। সাধারণ পাঠক ও চিকিৎসকমহল ফ্রয়েডের সঙ্গেই বেশী পরিচিত; কাজেই ফ্রয়েডবাদই আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। উদ্ধৃতির বাহুল্য অনেকের পছন্দ না হতে পারে। এই বাহুল্যের সমর্থনে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ফ্রয়েডের ও তাঁর বিদেশী সমালোচকদের বক্তব্য তাঁদের ভাষাতে উদ্ধৃত না করলে আমার বক্তব্য অনেকের কাছে মনগড়া অথবা অবিশ্বাস্য মনে হ'ত। এটা যাঁরা ত্রুটি মনে করবেন, তাঁদের কাছে আগে থেকেই মার্জনা চেয়ে রাখছি।

এই পুস্তক রচনায় পাভলভ ইনস্টিটিউটের প্রতিটি সভ্য—বিশেষ করে, সুনীল, উশ্রী, সরিৎ, তন্ময়,—আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে; শ্রদ্ধাস্পদ প্রখ্যাত ডঃ বিষ্ণু মুখার্জি, ও ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা, এবং বন্ধুবর ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি, ডাঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি ও অধ্যাপিকা অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ত উৎসাহিত করেছেন, শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায় প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আর যে দু'জন 'পাভলভ পরিচিতি' প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন তাঁরা আজ নেই। একজন কবি অরুণাচল বসু; দ্বিতীয় জন সদ্যপ্রয়াত সুহৃদ কুমুদ রায়। এই খণ্ডটি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হ'ল।

গোড়ার কথা

পাভলভের পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের পরিচয় প্রসঙ্গে মনের বস্তুগত অধঃস্তর (material substratum)—মস্তিষ্কের ও স্নায়ুসংস্থার কিছু বিবরণ অত্যাবশ্যক। প্রথম খণ্ডে সংক্ষেপে সেই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, জীববিজ্ঞানের সঙ্গে অপরিচিতি পাঠকের পক্ষে পরাবর্তের শারীরবৃত্ত বোঝা এর ফলে অনেকটা সহজ হবে এবং মননক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা করা সম্ভব হবে।

পাভলভের উত্তরসূরিরা গত চল্লিশ বছরে জটিল পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে পরাবর্ত সম্পর্কে আরো অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মস্তিষ্ক সম্পর্কে আরো অনেক নতুন কথা জানা গেছে, মনের অনেক অন্ধকার কোণে বিজ্ঞানের আলো পড়েছে। এই ক্ষুদ্রপরিসর পুস্তকে সব-কিছুর আলোচনা সম্ভব নয়, এমনকি উল্লেখেরও সুযোগ নেই। বর্তমানে পাঠকদের সঙ্গে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য। কিছুটা সাফল্যলাভ করতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করব ; কেননা বিষয়টি দুরূহ এবং আমাদের ক্ষমতা অতিশয় সীমিত। এই পরিচয় ঘটানোর ব্যাপারে পূর্বপ্রকাশিত বহু পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি। এখানে সেইসব লেখকদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

মনোবিজ্ঞান, তথা মস্তিষ্কবিজ্ঞান চর্চার পথ আজকের দিনে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার অগ্রগতির ফলে অনেকখানি সুগম হয়েছে। বিজ্ঞানের অন্য শাখার সাহায্য নিয়ে, পাভলভ প্রদর্শিত বস্তুবাদী ধারা অনুসরণ করে যে-সব গবেষণা চলছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধহয় স্নায়ুকোষ-সংগঠন সম্পর্কিত গবেষণা। অনেক দেশে অনেক বিজ্ঞানী স্নায়ুকোষ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এতদিন ধরে করেছেন, ফলে কোষের জৈবরাসায়নিক ও শারীরবৃত্তিক জ্ঞান অনেক বেড়েছে। কিন্তু স্নায়ুকোষের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ এবং গোটা মস্তিষ্কের সংগঠিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এতদিন কোনো সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়নি। এদিক দিয়ে আমাদের অজ্ঞতা নানা অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। গ্রিগরী পলিয়াকভের নিউরোটেক্টনিক্স বা স্নায়ু-সংগঠন বিজ্ঞান এতদিনে এই অজ্ঞতা দূর করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। তিনি মস্তিষ্কের ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। মাইক্রো-ইলেকট্রোড ও ইলেকট্রন মাইক্রোসকপির সাহায্যে পলিয়াকভ স্নায়ুর বিবর্তন ও ভ্রূণস্থ স্নায়ুর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। স্নায়ুকোষের বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের ও

তাদের সংগঠন ও সমাবেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান মানবমনের বৈচিত্র্যের ওপর নতুন আলোকপাত করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে। প্রমাণিত হয়েছে যে, গোটা মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে, স্নায়ুকোষের বিভিন্ন 'কালেকটিভ'ও ঠিক সেইভাবে কাজ করে। তারাও সংকেত ও সংবাদ বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে অভিযোজন ব্যাপারে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রমাণের গুরুত্ব অসীম।

সব থেকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত বল্কল অঞ্চলে সবচেয়ে জটিল সংবাদ ও সংকেতের 'প্রসেসিং' অনুষ্ঠিত হয়। পথনির্দেশের ভূমিকার দায়িত্ব বল্কল অঞ্চলের। সংহতি রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের ভার স্নায়ুসংস্থার নিম্নতর অংশে। আরো অনেক এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যার সফল প্রয়োগে মানবপ্রজাতির বর্তমান বহু সমস্যার সমাধান হবার সম্ভাবনা।

মস্তিষ্কের কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধির আর কতটা সম্ভাবনা আছে—এ নিয়ে বহুদিন ধরে বাদানুবাদ চলছিলো। আমরা জানি শারীরস্থানিক কোনো উন্নতি বা পরিবর্তন আর ঘটবে না। অথচ পরিবেশে দ্রুত পরিবর্তন চলেছে। এও জানি, প্রতিদিন প্রজাতির সামনে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, যার সমাধান ব্যতিরেকে প্রজাতির পক্ষে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। মস্তিষ্ক কি সেইসব সমস্যা সমাধানে সক্ষম? সংবাদ বিস্ফোরণ ঘটছে বিপুল বেগে। প্রতি দশ বছরে আমাদের জানবার ও মনে রাখার মতো বিষয় দ্বিগুণ হচ্ছে। মস্তিষ্কের পক্ষে এত সংবাদ ধরে রাখা কি সম্ভব? নাগরিকদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। কতদিন আর মস্তিষ্ক এই চাপ সহ্য করতে পারবে! শুধু মনোরোগ নয়, নানা ধরনের নতুন মারাত্মক ব্যাধি—যা সভ্যতা ও প্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত—বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক তৈরি করা কি মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব?

পাভলভীয় মনোবিদরা মনে করেন এই নয়া ক্ষমতা আয়ত্ত করা মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব নয়। মানুষের কোটি কোটি কোষ সমৃদ্ধ মস্তিষ্কের মাত্র চার শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা প্রণালীতে যে-সব পরাবর্ত গঠিত হতে পারে তাদের সংখ্যা সম্ভাব্য পরাবর্ত সংখ্যার পঁচিশ ভাগের একভাগ। মস্তিষ্কের অব্যবহৃত রিজার্ভ কোষগুলির উপযুক্ত ব্যবহারপ্রণালী আবিষ্কার করতে পারলে পরিবেশের সব পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা অনায়াসে মানিয়ে নিয়ে মানুষের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারবো। সেই আবিষ্কারের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত নয়।

এ-ছাড়া, মস্কোর মস্তিষ্ক-গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা বলেছেন: বর্তমানের পরীক্ষালব্ধ তথ্য মন-মস্তিষ্ক সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে, পাভলভের তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মস্তিষ্কের আংশিক ও সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাবার ফলে স্নায়ু-শল্য চিকিৎসা, মনোরোগ চিকিৎসা ও মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে উপকৃত হতে চলেছে। সিবারনেটিক্স এইসব গবেষণা দ্বারা

প্রভাবিত হবে, এবং সিবারনেটিক্সের সাহায্যেই হয়তো মস্তিষ্কের অব্যবহৃত (Reserve) শক্তি ব্যবহারের উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ দেবার আগে পাভলভের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দু'চার কথা তোমাকে শোনাবো ; আর সেই সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক সমাজের একটা রেখাচিত্র তোমার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি রুশদেশে নবজাগরণের বন্যা এসেছিল, তার ফলে দেশের মাটিতে জমা পুরনো সংস্কারের জঞ্জালের বোঝা ধুয়ে গিয়ে সেখানে পলিমাটির আস্তরণ পড়ে। সেই নতুন মাটিতে, নতুন পরিবেশে, নতুন ভাবধারা নিয়ে অনেক নতুন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। ইভান পেত্রভিচ এই যুগের এক বিশিষ্ট প্রতিভা। প্রতিভার উন্মেষ আপনা-আপনি ঘটে না। প্রতিভার বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্য অপরিহার্য। উপযুক্ত বলতে আমি কিন্তু অনুকূল পরিবেশের কথা বলছি না। আমি জানি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে অবস্থাকে বদলেছেন, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপযুক্ত পরিবেশ মানে প্রতিভা-উন্মেষের কতকগুলি অতি-আবশ্যকীয় শর্ত। কোনো বৈপ্লবিক ধারণা আকাশ থেকে নেমে আসে না। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাদান নতুন ধারণার জন্মদাতা। কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত আবশ্যক। যে-কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখবে যে সেই আবিষ্কারের প্রেরণা জুগিয়েছে সামাজিক প্রয়োজন ; সাফল্য এনে দিয়েছে পূর্বসূরিদের গবেষণালব্ধ সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা তোমার কাছে আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আকাশে ওড়ার ইচ্ছে সেই আদিম যুগের মানুষের মনেও ছিল। রামায়ণ মহাভারতে পুষ্পক রথের কথা নিশ্চয় পড়েছো। ডানা লাগিয়ে আকাশে উড়তে গিয়ে কিছু মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছে। মনোরথে ভারতচন্দ্রের নায়ক একদিনে এক মাসের পথ অতিক্রম করে নায়িকার সন্দর্শনে এলেও, সত্যিকারের ওড়ার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে মানুষ মাত্র সেদিন। বেলুনে আকাশে ওঠার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত ছিল বাতাসের চেয়ে হালকা গ্যাসের আবিষ্কার। আজকে আকাশযানের অবাধভ্রমণ সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনেক অনেক আবিষ্ক্রিয়া এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রয়োগকৌশলের অগ্রগতির ফলে। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও এইসব শর্তগুলো তৈরি না হলে উড়ে লণ্ডন যেতে পারতে না।

এছাড়া প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের প্রতিভা কেন সমসাময়িক বিশেষ এক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত হ'ল, কিভাবে তাঁরা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হলেন—এ-সব বোঝার জন্য তাঁদের সহযাত্রী ও সমাজ সম্পর্কিত কিছুটা জ্ঞান থাকা বোধহয় অত্যাবশ্যক। তাই বলছিলাম,—ইভান পেত্রভিচ পাভলভের সমকালীন রাশিয়ার সংক্ষিপ্ত সমাজচিত্র ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস কিছুটা

জানা থাকলে পাভলভের মানসিকতা ও তাঁর শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের বিকাশের ধারাবাহিকতা বোঝা সহজ হবে।

পাভলভ জন্মেছিলেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর এক দরিদ্র পাদ্রীর ঘরে। তাঁর পিতার লেখাপড়ায় খুবই আগ্রহ ছিল। সেই সূত্রে পাভলভ ছোটবেলা থেকেই বিদ্যোৎসাহী হয়ে ওঠেন। সংসার খরচা চালাবার জন্য পাভলভের বাবাকে কায়িক পরিশ্রমের কাজও করতে হ'ত। নিজের হাতে বাগানে তিনি ফুলফল তরিতরকারী ফলাতেন। শিশুকাল থেকেই পাভলভ বাগানের কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন। এইভাবে কায়িক পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত হন ; এই অভ্যাস তিনি আজীবন বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে শিশু পাভলভের মধ্যে একই সঙ্গে মগজ ও পেশী পরিচালনার আগ্রহ জন্মায় এবং বোধহয় এই কারণেই পরবর্তী জীবনে বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী হয়েও তিনি শ্রমজীবীদের থেকে আলাদা হয়ে যাননি।

পাভলভের ছাত্রজীবনে, উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে তাঁর দেশে বেশ কিছু বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। ১৮৬১ সালে ভূমিদাসেরা স্বাধীনতা লাভ করে এবং এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিজীবী-মহলে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। আগে থেকেই প্রগতিবাদী চিন্তানায়করা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন ; এখন সেই যুদ্ধে সাধারণ মানুষও যোগদান করেন। এই সময়ে সারা দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং বেলিনস্‌কি, হারজেন, চেনিশেভস্কি, ডবরেলিউবভ, পিসারেভ প্রমুখের বৈপ্লবিক ভাবধারা ছাত্রমহলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের উদারপন্থী মতবাদ ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের দ্বারা কিশোর পাভলভ বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের লেখা ও আলোচনা তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করে। রাশিয়ার নবজাগরণ বা রেনেশাঁসের ঢেউ ছাত্র-যুবাদের মনে জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জাগায়। বিজ্ঞানই মানবমুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম, বিজ্ঞানই সংস্কারের অন্ধকার আচ্ছন্ন দেশকে চলার পথের নিশানা দেখাবে—এই ধারণা ক্রমশ শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সময়ের উল্লেখ করে পরবর্তীকালে পাভলভ লিখেছেন যে, ষাটের দশকে বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে পিসারেভের লেখা তাঁকে একান্তভাবে বিজ্ঞানমুখী করে তোলে।

এই সময় পশ্চিম ইয়োরোপে রেনেশাঁস, রিফর্মেশনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হয়ে গেছে। শারীরবিদ্যার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের গঠনবিন্যাস ও ক্রিয়াবৈশিষ্ট্য নিয়ে জার্মানীতে মুলার, ওয়েবার, হেলমহোলৎজের গবেষণার ফলে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। সংবেদন ও উপলব্ধির শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে। মনোবিদ্যা

দর্শনের থেকে শারীরবৃত্তের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক পাতাতে চলেছে। ইংলণ্ডে ডারুইন তাঁর 'ডিসেণ্ট অফ্ ম্যান' (Descent of man)-এ প্রতিপাদন করেছেন যে মানবমস্তিষ্ক নিম্নপ্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের ক্রম-অভিব্যক্তির ফলে তার জটিল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। মানুষের প্রক্ষোভের এবং আরো নানা ধরনের মানসিক ক্ষমতার আদিম প্রকাশ পশুদের মধ্যেও দেখা যায়—এই ধরনের উক্তি করলেন ডারুইন আর একটি বইতে। বইটির নাম 'Expression of the Emotions in Man and Animals'। এইভাবে তিনি মনস্তত্ত্বকে জীববিদ্যার প্রভাবাধীনে নিয়ে এলেন। এর কিছু পরেই ফেকনার উন্দ প্রমুখ গবেষক পদার্থবিদ্যার গবেষণার অনুকরণে মনোবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে দিলেন। মন নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালানো সেদিনকার পক্ষে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। এই সবই নিঃসন্দেহে পাভলভকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই পাদ্রীর ছেলে হয়েও পৈত্রিক পেশা না গ্রহণ করে তিনি গণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়বার জন্য সেণ্ট-পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন। পাভলভ প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হলেন জীবদেহের ক্রিয়াকলাপের দিকে। শারীরবৃত্ত নিয়ে পড়াশুনা ও কাজকর্ম করতে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ভালোবাসতেন। ছাত্র অবস্থাতেই অধ্যাপক ৎসিওনের তত্ত্বাবধানে অন্য একজনের সঙ্গে অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) স্নায়ুর ক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি মিলিটারী মেডিকাল আকাদেমী থেকে স্নাতক হন এবং এই পরীক্ষাতেও সাফল্যসূচক স্বর্ণপদক ও দু'বছরের জন্য গবেষণাবৃত্তি লাভ করেন। এর ফলে সে-সময়কার খুবই নামকরা চিকিৎসক বট্‌কিনের অধীনে শারীরবৃত্তের পরীক্ষাগারে কাজ করার সুযোগ পেলেন। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজনধর্মী প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। বট্‌কিন তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে তাঁর প্রতিভাবিকাশের অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন। পাভলভ অনেকবার বট্‌কিনের কথা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেছেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ডক্টর অফ মেডিসিন হন। আমেরিকার হর্সলে গ্যাণ্ট বহুদিন তাঁর অধীনে গবেষণা করেন। গ্যাণ্ট পাভলভ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। তার কিছু কিছু অংশ তোমাকে শোনাচ্ছি। পাভলভের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এ-থেকে কিছুটা বুঝতে পারবে। *

বেশির ভাগ ছেলেই পাশ করে কাজে ঢোকার পর 'কেরিয়ার' গড়ার দিকে মনোনিবেশ করে। কি করে বড় হবো, নাম করবো, পয়সা করবো—এই চিন্তাই তাদের পেয়ে বসে। এইসব চিন্তা পাভলভকে কোনোদিন বিব্রত করেনি। তাঁর একমাত্র ভাবনার বিষয় ছিল বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধান। এই কাজে

---

* Gantt ; *Lectures on Conditioned Reflexes* ; International Publishers, New York, 1941.

তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। নতুন তথ্য বা fact-এর সন্ধানে অবিরত কাজ করতেন। এককথায় বলা চলে বিজ্ঞান নিয়ে ছিল তাঁর সাধনা, আরাধনা, তথাকথিত প্রাকৃতিক রহস্যের যবনিকা উন্মোচন ছিল তাঁর সারাজীবনের কামনা, একটি 'ফ্যাক্ট'-এর আবিষ্কার তাঁকে জোগাতো নিত্যনতুন প্রেরণা, আর একটি নতুন 'ফ্যাক্ট'-এর পেছনে ছোটবার উৎসাহ। যাকে করিৎকর্মা বা প্র্যাকৃটিক্যাল মানুষ বলে, পাভলভ তা ছিলেন না। গ্যাণ্ট লিখেছেন, টাকা পয়সার রোজগার, প্রতিপত্তি বা 'কেরিয়ার' গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনীহ।

শুধু এই নয়, সাংসারিক সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন,—যাকে বলে একেবারে অকেজো, অন্যমনস্ক। এ-সম্বন্ধে এক মজার গল্প বলছি, শোনো। সেরাফিয়া নামে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ে একটা ছোট শহরে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর খেয়াল ছিল না যে সেদিন তাঁর পকেটে একটিও পয়সা নেই। নববিবাহিতার বোনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে তিনি সেই শহর থেকে বাইরে আসতে পারেন। তাঁর স্ত্রীর সাহায্য ও সাহচর্য ছাড়া পাভলভের পক্ষে বিজ্ঞান নিয়ে দিনরাত মেতে থাকা হয়তো সম্ভব হ'ত না। সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে তাঁর তিলমাত্র উৎসাহ ছিল না, এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন পরমুখাপেক্ষী। নিজের জামাজুতো কোনো-দিনই নিজে কেনেননি; এমনকি একলা বেড়াতে যাবার মতো উৎসাহও তাঁর ছিল না। এ-হেন আপনভোলা বিজ্ঞান-পাগল মানুষটির কিন্তু শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁর গবেষণাপদ্ধতির অভিনবত্ব, তাঁর বৈপ্লবিক তত্ত্বকথা, নিজের মতামত সম্পর্কে অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সময়বিশেষে মেজাজের রুক্ষতার দরুন তিনি নিজের ছাত্র ও সহকারী ছাড়া আর প্রায় কারুরই প্রীতিভাজন ছিলেন না। একই পেশার লোকদের মধ্যে প্রায়ই প্রীতির চেয়ে ঈর্ষার সম্পর্কটাই বড় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে প্রতিভাশালীদের প্রতি সমকালীন সহকর্মীরা কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর ও বিরূপভাবাপন্ন হয়ে থাকেন। ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান পরিপাকগ্রন্থির ক্রিয়াকলাপের ওপর নতুন গবেষণার জন্য। তাঁর দেশের অনেক পণ্ডিতই এই গবেষণাকে আমল দিতে চাননি। নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁকে তাঁর দেশের বিজ্ঞান আকাদেমীর সভ্য মনোনীত করা হয়; বোধহয় খানিকটা দায়ে পড়েই। এর পরও তাঁর শর্তাধীন প্রত্যাবর্ত সম্পর্কে শ্লেষোক্তি চলতে থাকে। ভারী তো! এ আবার বিজ্ঞান নাকি? সার্কাসে বাঘের খেলা দেখায় যারা, কুকুরকে ট্রেনিং দিচ্ছে যারা—বহুকাল আগে থেকেই 'কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স'-এর কেরামতি তাদের জানা। এই রকম কথা পাভলভের বিজ্ঞানবিবন্ধুরা

---

* Practical questions, such as securing a position, pecuniary difficulties, etc., did not exist for him. *Ibid.*

প্রায়ই বলতেন। কনফারেন্স ইত্যাদিতে তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে প্রকাশিত পেপার পড়ার হুকুম পেতে বেশ বেগ পেতে হ'ত। বহুকাল সহ-সভাপতি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে রাশিয়ান চিকিৎসক সমিতির সভাপতি করা হয়নি। কারণ কি জানো? কারণ তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে বছরে সব থেকে বেশি সংখ্যক মৌলিক গবেষণার পেপার প্রকাশিত হ'ত। অন্যান্য গবেষণাগারের অধ্যক্ষরা স্বভাবতই এতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। অবাক হবার কিছু নেই। পণ্ডিতজন বিদ্বজ্জন সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে পঞ্চম রিপুর আধিক্য থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া, পশ্চাৎপদ দেশে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রেশারেশির ভাব যেন কিছুটা বেশিই থাকে। পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় রুশদেশ তখন বেশ খানিকটা পিছিয়ে ছিল। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথকেও কম ঈর্ষার বিষ হজম করতে হয়নি। নোবেল প্রাইজ পাবার পর বিদ্বজ্জন উঁচুদরের কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের নবজাগরণে রুশদেশে বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল নিঃসন্দেহ; কিন্তু তা বলে প্রগতিবিরোধী সব বাধা-বিপত্তির নিরসন ঘটেছিল ভাবলে ভুল হবে।

খুব কম বিজ্ঞানীই পাভলভের মতো দুঃখ দারিদ্র্য ও অন্যান্য নানারকমের অসুবিধার সঙ্গে লড়াই করে পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছেন। পরীক্ষাগার থেকে অনেকদিন পরীক্ষাধীন কুকুরদের বাড়ি নিয়ে নিজেদের খাবারের ভাগীদার করতে হয়েছে, বিজলীবাতির অভাবে অনেকসময় কেরোসিন বা টর্চের আলোতে কুকুরের ওপর অস্ত্রোপচার করেছেন, হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুন না জ্বালিয়ে বহুদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ চালাতে হয়েছে। তবুও কোনোদিন কোনো কারণে তাঁর পরীক্ষার কাজ ব্যাহত হয়নি। শুধু নিজেই অসুবিধা সহ্য করেছেন তা নয়, সহকর্মীদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাদেরও এইসব অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়েছেন। আর সে-কাজ তারা খুশিমনেই করেছে। অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিনের বিশেষ চেষ্টায় পাভলভ গবেষণার অবাধ সুযোগ ও সরকারী সাহায্য সহযোগিতা পান। তারপর প্রায় কুড়ি বছর একটানা তিনি একদল সুযোগ্য কর্মীর সাহায্যে শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে অজস্র পরীক্ষা চালান। এই সুযোগসুবিধা যদি আগে পেতেন তাহলে হয়তো এই মহান বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে পাওয়া উপাত্তের সাহায্যে মস্তিষ্কের (যাকে এখনও অজ্ঞান-অন্ধকারে ভরা কালো বাক্স বলা হয়) আরো অনেক ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যেত। মনস্তত্ত্বে রহস্য-বাদীদের প্রভাব আরো কিছুটা খর্ব হ'ত।

এইবার পাভলভের কয়েকটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করে এই পর্ব শেষ করবো। এই গুণগুলো প্রথম সারির বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। ১৯০৪ সালে অন্য দেশের একজন শারীরবৃত্তের অধ্যাপক বলেছিলেন যে পাভলভের

জীবনী মাত্র একটি লাইনে লেখা যায় : অক্লান্ত সত্যানুসন্ধিৎসার ফলেই তিনি অমূল্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসম্ভার সংগ্রহ করতে পেরেছেন। নিজের কথা,আত্মকেন্দ্রিক কোনো চিন্তাই তাঁর মনে স্থান পায়নি। এই আত্মভোলা মানুষটিকে তা বলে যেন দিনের বেলা লণ্ঠন নিয়ে পথ খোঁজা দার্শনিকের পর্যায়ে ফেলো না। ল্যাবরেটরির পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারে তিনি আদৌ ঢিলেঢালা ছিলেন না। পরীক্ষাকাজের প্রতিটি খুঁটিনাটির ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর থাকতো। নিজের লাঞ্চ খেতে হয়তো মাঝে মাঝে ভুলে যেতেন কিন্তু কোন কুকুরের কোন দিন কোন পরীক্ষাতে কত ফোঁটা লালা পড়েছে, তা তিনি ভুলতেন না। এ-বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রায় অবিশ্বাস্যরকমের নির্ভরযোগ্য। সংখ্যা মনে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতা বিষয়ে গ্যাণ্ট একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেটা এই প্রসঙ্গে তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাঁর একজন সহযোগী দৌড়ের প্রতিযোগিতায় একটি মেডেল পেয়েছিলেন। সেটা পাভলভ একদিন নেড়েচেড়ে দেখেন। খেলাধূলায় তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। কয়েক মাস পরে খেলাধূলার প্রসঙ্গে সহযোগী দৌড়বীরকে জিজ্ঞসা করেন, ঐ মেডেল পাওয়ার দৌড়ে তাঁর কত সময় লেগেছিল। পনেরো বছর ধরে গলায় মেডেল ঝুলিয়ে রেখেও দৌড়বীর নিজের দৌড়ের সময়টা ঠিকমতো বলতে পারলেন না। পাভলভ একবারই মেডেলটি দেখেছিলেন, তাতে সময়টা খোদাই করা ছিল। তিনি একটুও না ভেবে সঠিক সময় সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সমেত বলে দিলেন। সময় লেগেছিল ১০·১১$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড। মনে রাখবার এই বিশেষ ক্ষমতার কারণ কি? এ-সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেছেন যে, এর কারণ,—তিনি বিশেষ বিশেষ কতকগুলো বিষয়ে শুধু মনঃসংযোগ করতেন। সংবাদপত্র সাময়িকপত্রে প্রকাশিত আজেবাজে খবর দিয়ে মস্তিষ্ক ভরাট করতেন না, এমনকি সব পড়ারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। শুধু বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়েই ছিল তাঁর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ। এইসব বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের অসাধারণ দক্ষতা ছিল পাভলভের। গবেষকের পক্ষে এই গুণ অতি-আবশ্যক।

তোমার আমার চোখে যে-সব ঘটনা সাধারণ মনে হয়, পাভলভ তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে সে-সবের গভীরে যেতেন এবং আপাতদৃষ্টিতে অসংবদ্ধ, নিঃসম্পর্কিত, অতি সামান্য ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পারতেন। নতুন সূত্র বা তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হলে এই গুণ গবেষকের থাকা দরকার।

"সব্যসাচীর মতো দুই হাতে কাজ করতে পারতেন পাভলভ। অস্ত্রোপচারে দুই হাতে সমান দক্ষতা ছিল। এত দ্রুত তিনি কাজ করতেন যে আমরা যখন মনে করছি অপারেশন সবে শুরু, তখন দেখি অপারেশন শেষ হয়ে গেছে।"

কথাগুলো বলেছেন তাঁর এক সহযোগী বিজ্ঞানী। গ্যাণ্ট লিখেছেন, কুকুরের মস্তিষ্ক থেকে তার মেরুমজ্জা অস্ত্রোপচার করে আলাদা করতে তাঁর সময় লাগতো ৩০ সেকেণ্ড, এবং চামড়া কেটে পেশী সরিয়ে ভেগাস বা সায়াটিক নার্ভ বের করে বেঁধে ফেলতে তিনি সময় নিতেন ৩ থেকে ৫ সেকেণ্ড। অন্যদের কত সময় লাগতো জানলে বুঝতে পারবে পাভলভের দক্ষতা ও দ্রুততার বহর। তাঁর একজন সহকারীর এই অপারেশনে লাগতো ৯০ সেকেণ্ড। গ্যাণ্টের মতে এই অপারেশনে ৯০ সেকেণ্ড লাগলে খুব বেশি সময় লেগেছে বলা চলে না।

এইবার এমন একটি গুণের কথা বলবো, যা গবেষক ও বিশেষজ্ঞের মধ্যে খুবই দুর্লভ। নিজের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না। পক্ষপাতিত্ব তো দূরের কথা, তিনি বরং খানিকটা সন্দেহের চোখেই দেখতেন। তিনি নিজের তত্ত্বের সমর্থক তথ্যগুলোকে রেখে বাদবাকিগুলোকে অগ্রাহ্য করতেন না। বরং নতুন তথ্য বা 'ফ্যাক্ট'-এর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য যখন প্রচলিত তত্ত্বে (সে তত্ত্ব যতই না কেন তার মনোমতো হোক) পাওয়া যেত না, তিনি তত্ত্বকে অকুণ্ঠচিত্তে বিসর্জন দিয়ে নতুন পাওয়া 'ফ্যাক্ট' ভিত্তিক নতুন তত্ত্ব বা সূত্র তৈরি করার চেষ্টা করতেন। পরীক্ষালব্ধ 'ফ্যাক্ট' ছিল তাঁর কাছে সত্য, সেই সত্যের বাহন তত্ত্ব। তত্ত্বকে দাঁড় করাবার জন্য মনোমতো 'ফ্যাক্ট' খুঁজতে ব্যস্ত বিজ্ঞানীদের তিনি ভণ্ড বা 'ডগম্যাটিক' মনে করতেন। আর একজন শারীরবৃত্তবিদ স্যার উইলিয়ম বেইলিস পাভলভের মতো মনে করতেন যে কখনও ভুল না করার চেয়ে ভুল স্বীকার করাই মহত্ত্বের নিদর্শন।*

তাঁর কাজ চালাবার পদ্ধতির মধ্যেই ছিল তথ্য যাচাই করার চেষ্টা। একই ধরনের কাজ দু'তিন জনকে দিয়ে না করিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন না। তাদের পাওয়া তথ্যের মধ্যে যতক্ষণ না পুরোপুরি সঙ্গতি পাওয়া যেতো, ততক্ষণ তিনি নতুন কাজে হাত দিতেন না। সহযোগীদের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ খুঁটিয়ে দেখতেন, এমন কি প্রায়ই তাদের টিউবে লালার পরিমাণ নিজে মিলিমিটার চিহ্ন গুণে নির্ধারণ করতেন। তাঁর সম্বন্ধে একজন রুশ সহকর্মী লিখেছেন যে, কোনো পরীক্ষায় নতুন কোনো 'ফ্যাক্ট' পাওয়া গেলে, সেই পরীক্ষাটি তিনি আবার করতেন; একই ফল পাওয়া গেলে শুরু হ'ত আলোচনা, তর্কবিতর্ক, নতুন তত্ত্ব প্রণয়ন, পুনরালোচনা, বিশ্লেষণ, বিবেচনা, তারপর তত্ত্বটিকে গ্রহণ অথবা

---

* "It is not going too far to say that the greatness of a scientific investigator does not rest on the fact of his having never made a mistake but rather on his readiness to admit that he has done so, whenever the contrary evidence is cogent enough." *Ibid.*

বর্জন। তা বলে ভেবো না যে, পাভলভের চরিত্রে কোনো দোষ বা দুর্বলতা ছিল না। আবেগ-প্রবণতার আধিক্যের জন্য আলোচনার সময় প্রায়ই তিনি বিস্ফোরিত হতেন, সামান্য ব্যাপারে রাগারাগি চ্যাঁচামেচি করতেন। সত্য বা 'ফাক্ট' বিরোধীকে সব সময়ে চ্যালেঞ্জ জানাতেন। গবেষণার ব্যাপারে ও অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি অতিমাত্রায় সময়নিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন, গৃহস্থালীর কাজকর্মে ছিলেন ঢিলেঢালা, অগোছাল। তাঁর গবেষণার সবদিক বিচার করে তাঁর সহযোগী আমেরিকান কর্মী গ্যাণ্ট ১৯২৮ সালেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত মানবমন সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দিতে চলেছে, খুব শীঘ্রই এই ধারণা এক নতুন দর্শনের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠবে। *

এবার পাভলভের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। প্রথম দিকে (১৮৭৮-১৮৮৮) দিতে রক্তসঞ্চালকতন্ত্র (circulatory system) নিয়ে কাজ করেন। এর পর তাঁর (১৮৮৮-১৯০২) গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল পরিপাকগ্রন্থি (digestive glands)। এই কাজের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ১৯০২ থেকে তাঁর সব চিন্তা ভাবনা পরীক্ষানিরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex)। আমরা কেবলমাত্র শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু তোমার জানা দরকার যে পরিপাক-গ্রন্থি নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তিনি 'ক্রনিক' বা দীর্ঘস্থায়ী পরীক্ষার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং শর্তাধীন পরাবর্তের মৌলিক সূত্রের সন্ধান পান। 'ক্রনিক' পদ্ধতি আবিষ্কারের মূলে ছিল অগ্ন্যাশয় (pancreas) নিয়ে পরীক্ষাকারীদের ফলাফলের পার্থক্য। এর সঠিক কারণ নির্ণয় করলেন পাভলভ। তিনি বললেন : কোনো আন্তরযন্ত্রকে অপারেশন করে বাইরে আনার ফলে গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপ মন্দীভূত ও অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। স্বল্পস্থায়ী (acute) পদ্ধতিতে এতদিন সব কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে। যন্ত্রকে স্বস্থানে রেখে তার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য না করতে পারলে দেহের মধ্যে ঠিক কিভাবে তারা কাজ করে থাকে, সেটা ঠিক বোঝা যাবে না। অনেক চিন্তা ভাবনা করে পাভলভ 'ক্রনিক' পদ্ধতি আবিষ্কারের সূত্র খুঁজে পেলেন। যে গ্রন্থিটি নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে, তার রস যদি বাইরে এনে কোনো পাত্রে সংগ্রহ করা যায়, তবে গ্রন্থিটি ও অন্যান্য আন্তর-যন্ত্রের সম্পর্ক অটুট রেখে গ্রন্থিটির ক্রিয়াকলাপের হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

---

* His (conditioned reflex) teaching is creating a novel conception of the psychical life of man, and it will sooner or later be the foundation of a new philosophy.—*Ibid.*

একটা ছোট্ট অপারেশন করে তিনি লালাগ্রন্থি (salivary glands), পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়ের রস বাইরে রাখা পাত্রে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করলেন। এমনভাবে অপারেশন করা হ'ল যাতে কোনো নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গ্রন্থির নল বা পাকস্থলীর ছিদ্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আন্তরযন্ত্রের কাটা অংশকে বাইরের চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে আটকে দেওয়া হ'ল। এইভাবে এমন পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা গেল যে কুকুরের অস্ত্রোপ্রচার-ক্ষত শুকিয়ে গেলে পরীক্ষার জন্য আর কোনো কিছু করার দরকার রইলো না। এইভাবে সুস্থ প্রাণীকে অতি সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় পরীক্ষাধীন করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হ'ল। তাদের স্নায়ু-নিয়ন্ত্রণ, রক্ত চলাচল এবং দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতির পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট থাকলো।

এই 'ক্রনিক' পদ্ধতির আবিষ্কার শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। আগেকার স্বল্পস্থায়ী বা এ্যাকিউট (acute) পদ্ধতি গবেষকদের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন। এঁরা ভাবতেন প্রাণী যেন বিভিন্ন অংশের জোড়া দেওয়া এক যন্ত্র, যে-কোনো অংশ আলাদাভাবে বাইরে এনে তার ক্রিয়াকলাপ দেখা চলে; প্রয়োজন হলে মেরামত করে আবার দেহের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া চলে। এখন আমরা জানি উচ্চ প্রাণী শুধু কতকগুলো দেহাংশের সমষ্টি নয়, তার জৈবিক প্রক্রিয়া সরল ও যান্ত্রিক নয়। এ-ছাড়া, পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ও পরীক্ষাপদ্ধতি প্রাণীকে পরিবেশ থেকে আলাদা করে তার শারীরবৃত্ত বুঝতে চায়। সেটা অসম্ভব। পুরনো পদ্ধতিতে সংশ্লেষণ দূরের কথা যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণও সঠিকভাবে করা যায় না। জটিল জৈব পদার্থের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ জানতে হলে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। আর স্নায়ুসংস্থার কার্যকলাপ অনুসন্ধানে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। কেননা, আমরা জানি সব স্নায়ুই কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থার মাধ্যমে পরস্পর-সমন্বিত। বিচ্ছিন্ন করে পরীক্ষা চালালে তাদের জটিল সম্পর্ক ও সমন্বয়ের কোনো সূত্র পাবার সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে অনেক জটিল ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা ছাড়া বিভিন্ন অংশ, যন্ত্র ও সংস্থা-সমন্বিত গোটা প্রাণীর জৈবিক বা মানসিক ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। পাভলভ প্রবর্তিত 'ক্রনিক' পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা ও সংশ্লেষণমূলক পরীক্ষা একসঙ্গে চালানো যায়। প্রাণীর বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রের শারীরবৃত্ত জানা যায়, আবার তার পরিবেশ-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাণীটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করা চলে। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আবিষ্কার শর্তাধীন পরাবর্তের গবেষণাকে সম্ভব এবং বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তনে সাহায্য করেছে।

পরিপাকগ্রন্থি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পাভলভ লক্ষ্য করলেন যে খাদ্য

কাছে আসার অনেক আগে থেকেই পরীক্ষাধীন কুকুরের লালা নিঃসরণ হতে থাকে। খাদ্য সরবরাহকারীর পায়ের শব্দ শুনলেই লালা পড়ছে। খাদ্য দেখলো না, গন্ধ পেলো না, তবু কেন কুকুরের লালা পড়ে? পাভলভের অনুসন্ধিৎসু মন এর কারণ নির্ধারণে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। খাদ্য মুখে পড়লে লালা ঝরাটা একটা স্বভাবগত ক্রিয়া, কিন্তু খাদ্য সরবরাহকের পায়ের শব্দে লালা ঝরাকে কোন ধরনের ক্রিয়া বলা যাবে? এই চিন্তা থেকে শর্তাধীন পরাবর্তের উৎপত্তি। এই সম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয় এই প্রশ্নের মীমাংসা-কল্পে। বোঝা গেল যে, খাদ্যের রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি তার নিজস্ব গুণ ছাড়াও খাদ্যসরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নানা প্রকার উদ্দীপক,—যেমন ঐ পায়ের শব্দ, খাবারের পাত্র লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করতে পারে। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে বলা চলে মানসিক বা আত্মিক প্রক্রিয়া, ইংরিজিতে psychic reaction। পাভলভই প্রথম এইসব প্রতিক্রিয়াকে শারীরবৃত্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টা থেকে গড়ে উঠেছে শর্তাধীন পরাবর্ত-ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হলে, শর্তাধীন পরাবর্তের বহুমুখিন গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে, তোমাকে স্নায়ুতন্ত্রের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে অন্তত কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যতদূর সম্ভব সহজ করে এ-বিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছি। শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্ব,—বিজ্ঞানের এই দুই শাখাই পাভলভের বিশেষ অবদানের দৌলতে নতুন মোড় নিয়েছে। প্রাক-পাভলভ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরীক্ষাপদ্ধতিতে পাভলভের আবিষ্ক্রিয়ার ফলে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে—এই কথা জানিয়ে গোড়ার কথা শেষ করছি।

স্নায়ু ও স্নায়ুতন্ত্র

জীবদেহ অনেকগুলো কোষের বা cell-এর সমষ্টি। অবশ্য এককোষী প্রাণী বা উদ্ভিদও আছে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহের গোড়াপত্তন হয় কিন্তু একটি কোষ থেকে। স্ত্রীদেহের একটি বিশেষ ধরনের কোষ, যাকে বলা হয় ডিম্বকোষ (ovum) ও পুরুষদেহের ঐ ধরনের বিশেষ কোষ, বীজকোষের (sperm cell) মিলনের ফলে এই বিশেষ কোষটি সৃষ্ট হয়। জরায়ুতে এই কোষটি জ্যামিতিক প্রোগ্রেসনের হারে বাড়তে থাকে। ক্রমে সৃষ্ট হয় পেশী স্নায়ু মেদ মজ্জা ইত্যাদি সমন্বিত চোখ কান নাক মুখওয়ালা সমশ্রেণীর বহুকোষী দেহ। সব কোষের মধ্যে থাকে জেলীর মতো একটা জিনিস, প্রোটোপ্ল্যাজম, মাঝখানে থাকে ঘনীভূত অংশ নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার ক্রোমোসোম বংশগতি (heredity) সংরক্ষণের উপাদান দিয়ে তৈরি। ক্রোমোসোমের সংখ্যা প্রজাতি-

ভেদে বিভিন্ন ; এক প্রজাতির প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে ক্রোমোসোমসংখ্যা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। মানুষের কোষকেন্দ্রে সব সময়ই পাওয়া যাবে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম। এর অর্ধেক আসে মায়ের সূত্রে, অর্ধেক বাপের সূত্রে। কোষ বিভাজনের আগে ক্রোমোসোমগুলো লম্বালম্বি ভাগ হয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায় ; প্রতিটি নতুন কোষে ঠিক ঐ আগের মতো পাওয়া যায় ৪৬টি ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমের মধ্যে ছোট ছোট যেসব বিন্দু দেখা যায়, তাদের বলা হয় জিন বা জেনি (gene)। জিন এবং বংশগতির গুণাবলীর ধারক DNA, অনেকের মতে একই পদার্থ। DNA-এর পুরো নাম ডি-অক্সি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। বংশগতি বহমান রাখতে অন্য একটি পদার্থের প্রয়োজন হয়। তার নাম RNA বা রিবোনিউক্লিড অ্যাসিড। জীবদেহের বিভিন্ন জায়গায় কোষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে RNA। DNA থাকে কোষের মধ্যমণি বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর RNA থাকে নিউক্লিয়াসের বাইরে। DNA-এর পরিমাণ সবকোষে সব সময়েই এক রকম কিন্তু RNA-এর পরিমাণ কলা (tissue) ভেদে বিভিন্ন। DNA-এর গঠন ও প্রকৃতি সব সময়েই এক ধরনের। কিন্তু এ-যাবত অন্তত তিন ধরনের RNA-এর সাক্ষাৎ মিলেছে। বাহক RNA ও দূত RNA-এর কাজ DNA-এর সংকেত ঠিক জায়গায় পৌছে দেওয়া ও প্রোটিনকে প্রয়োজন মতো সংশ্লেষিত করা। প্রজনিক সংকেত সরবরাহে অনুঘটকের (enzyme) ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা বর্তমানে সম্ভব নয়।

কোষ প্রসঙ্গে যতটুকু অত্যাবশ্যক এখানে ততটুকুই শুধু জানাচ্ছি। স্নায়ুকোষ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু জানাবো। মানুষের শরীরে প্রধানত চার রকমের কোষ আছে। এদের চেহারা আলাদা, কাজও আলাদা। এক জাতের কোষ দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগের কাজ করে ; তাদের নাম সংযোজক (connective) কোষ। হাড় আর রক্ত সংযোজক কোষ দিয়ে তৈরি। দ্বিতীয় জাতের কোষ দিয়ে পেশী তৈরি হয়, এদের নাম পেশী (muscle) কোষ। আমাদের আলোচ্য স্নায়ুকোষ (nerve cell), যার অন্য নাম নিউরন (neuron)। স্নায়ুকোষের বিশেষত্ব কি ? এই প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। এই কোষ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে না হলেও মোটামুটি কিছু তথ্য জানাতেই হবে। কেননা স্নায়ুতন্ত্র এই স্নায়ুকোষ দিয়েই গঠিত।

আমাদের স্নায়ুতন্ত্র লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় পৌছেচে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে কয়েকটি প্রধান বিভাগ আছে। প্রধান বিভাগটি মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা বা সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) দিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ককোষ দেহের অন্যকোষের মতো নয়। একবার ধ্বংস হলে তার বদলে নতুন কোষ তৈরি হয় না। যতগুলো কোষ নিয়ে (অবশ্য তার সংখ্যা বেশ কয়েক কোটি) জন্মেছি, তার থেকে একটিও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে না।

বরং পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর থেকে কিছু কিছু কোষ অকেজো হয়ে পড়তে থাকবে, তার বদলে নতুন কোষ তৈরি হবে না। সুরক্ষিত করার জন্য তাই করোটির মতো শক্ত আবরণী দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা। অবশ্য এ-ব্যবস্থা ক্রম-অভিব্যক্তির ফল; বিধিদত্ত নয়, প্রকৃতি দত্ত। এই প্রধান বিভাগটির নাম কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা (central nervous system)। মেরুমজ্জা কোথায় থাকে জানো তো? মেরুদণ্ডের (spinal column) মধ্যে এর অবস্থান। এই মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া অনেক টুকরো হাড় দিয়ে তৈরি। এই হাড়গুলো অনেকটা বর্তুলাকার, মাঝখানটা ফাঁকা। মোট ৩১টি হাড়খণ্ড জোড়া মেরুদণ্ডের মাঝখানটায় আছে একটা লম্বা নালি, যার মধ্যে মেরুমজ্জার অবস্থিতি। মেরুমজ্জা ওপর দিকে যেখানে শেষ, মস্তিষ্ক সেখান থেকে সুরু। মস্তিষ্কেরও আবার কয়েকটি বিভাগ আছে: (১) সুষুম্নাশীর্ষক বা নিম্ন মস্তিষ্ক কাণ্ড (medulla) (২) এর ঠিক ওপরে থাকে অণুমস্তিষ্ক বা উর্ধ্বমস্তিষ্ককাণ্ড (pons) (৩) অণুমস্তিষ্কের উল্টো দিকে রয়েছে লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) (৪) মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain) (৫) গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum)।

এ-ছাড়া মধ্যমস্তিষ্ক আর গুরুমস্তিষ্কের মধ্যে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। এদের একটির নাম হাইপো-থ্যালামাস, আর-একটির থ্যালামাস। এরা আবেগ বা প্রক্ষোভের কেন্দ্র বলে পরিচিত। এর ওপরকার বেসাল গ্যাংলিয়া বা সঞ্চালক স্নায়ুগ্রন্থি গুরুমস্তিষ্কেরই অন্তর্গত।

গুরুমস্তিষ্কে দুটি গোলার্ধ আছে—বাম ও দক্ষিণ (Left and Right Hemispheres)। গোটা গুরুমস্তিষ্কের প্রায় সবটাই একটা ধূসর বর্ণের পাতলা পরদা দিয়ে ঢাকা। এই আবরণীকে বলা হয় মস্তিষ্কবল্কল (cerebral cortex)। মস্তিষ্কের দিকে তাকালে মনে হবে যেন কেউ ছুরি চালিয়ে এর চারপাশে কতকগুলো খাঁজ কেটে রেখেছে। আর তার ফলে আশেপাশের অংশগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। খাঁজ বা ফাটলগুলো (sulci) গুরুমস্তিষ্ককে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছে। সব থেকে বড় খাঁজটি মস্তিষ্ককে দুটি সমান অর্ধে ভাগ করেছে;—এর নাম মধ্যবর্তী খাঁজ (median fissure)। আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাঁজের নাম ও অবস্থিতি তোমার জানা দরকার। একটির নাম রোলাণ্ডের খাঁজ, অপরটির নাম সিলভিয়াসের খাঁজ। রোলাণ্ডের খাঁজটি গুরুমস্তিষ্কের এক একটি অর্ধকে আড়াআড়িভাবে প্রায় সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে। মধ্যবর্তী খাঁজের মাঝামাঝি জায়গায় গুরুমস্তিষ্কের ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে এই রোলাণ্ডের খাঁজ। গুরুমস্তিষ্কের দুটি খণ্ডের পাশের অংশের সামনে থেকে যে খাঁজটি পেছনের দিকে ঢুকে গেছে, তার নাম সিলভিয়াসের খাঁজ। এ-কয়টির পরিচয় জানলে তুমি গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অবস্থান খানিকটা অন্তত বুঝতে পারবে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে

ব্যাপারটা খুব বেশি গোলমাল ঠেকবে না।

এখানে আরো দু'একটা তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো। খাঁজগুলো আর লোবগুলো কি করে তৈরি হয়েছে, সে-সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। বিবর্তনের পথে মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজন ক্রমশ এতটা বাড়লো যে করোটির মধ্যে আর স্থান সংকুলান হ'ল না। চাপের চোটে সংকুচিত হবার ফলে খাঁজ আর লোবের সৃষ্টি। মস্তিষ্কবল্কলের মোট আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গ সেন্টিমিটার। তার দুই তৃতীয়াংশ আছে খাঁজের মধ্যে। মস্তিষ্কের ঘনমান মানুষের বেলায় গড়ে প্রায় ১৫০০ সি সি। এ-যাবত মানুষের খুব কাছাকাছি যে প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, তার ঘনমান ৬০০ সি সি।

এইবার গুরুমস্তিষ্কের আচ্ছাদনীকে (cerebral cortex) খাঁজগুলো যে কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে তাদের পরিচয় দিচ্ছি। কপালের দিকে রোলাণ্ডের খাঁজের সামনের অংশকে বলা হয় ফ্রন্টাল লোব (frontal lobe) বা সামনের অংশ। রোলাণ্ডের খাঁজের পেছন দিকে মাঝামাঝি অংশ, যেটা কানের দিকে আছে, তাকে বলে মধ্যাংশ বা প্যারাইটাল লোব (parietal lobe)। সিলভিয়াসের খাঁজের নিচে যে অংশটা ঝুলে পড়ছে বলে মনে হয়, তাকে বলে টেমপোরাল লোব (temporal lobe) বা পাশের অংশ। একেবারে পেছনের অংশটির নাম অক্সিপিটাল লোব (occipital lobe) বা পশ্চাদংশ। গুরুমস্তিষ্কের দুটি অর্ধেই ঠিক একইরকম ব্যবস্থা। যে চারটি অংশের নাম করলাম, এগুলো বাইরে থেকেই দেখতে পাবে। এরা বিবর্তনের ফলে শুধু উচ্চপ্রাণীদের মধ্যে বিশেষ পরিণত ও স্পষ্ট ; তাই এদের নাম নিও-কর্টেক্স (Neo-cortex) বা নতুন আবরণী। তুমি আগেই জেনেছো, খাঁজই হোক আর লোবই হোক, সবই কিন্তু ক্রম-অভিব্যক্তির দরুন ঐ ধূসর রং-এর আবরণীর,—কর্টেক্স যাকে বলে, তার বর্ধিত ও নতুন রূপ। নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে লোবগুলোর প্রাধান্য ছিল, যেমন অলফ্যাক্টরী (olfactory), লিম্বিক (limbic), ইনসুলার (insular),—তারা মানুষের মতো উচ্চপ্রাণীর বেলায় অপ্রধান ও প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের এই পুরনো অংশগুলোকে বলা হ'ল অ্যালোকর্টেক্স (allocortex)। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য ঘ্রাণশক্তির সাহায্য অতি প্রয়োজনীয়, মানুষের মতো উন্নত প্রাণীর পক্ষে এর গুরুত্ব কমে গেছে ; দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন তার স্থান নিয়েছে। তাই অলফ্যাক্টরী, লিমবিক, ইনসুলার, লোবের বদলে উচ্চজীবের মধ্যে ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিটাল লোবের প্রাধান্য ঘটেছে। এইসব লোবেই শ্রবণ দর্শন স্পর্শন, ও একান্তভাবে মানবিক—বাকশক্তি ও চিন্তাশক্তির কেন্দ্রের অবস্থিতি। মস্তিষ্ক থেকে বারো জোড়া নার্ভ ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া নার্ভ বেরিয়ে দেহের বাইরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত।

গত কুড়ি বছরে মস্তিষ্কের একটি ক্ষুদ্র অংশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের কথা জানা গেছে। মস্তিষ্কের ভেতর দিকের গর্তের (ventricle) চারপাশে জালের মতো দেখতে একটা জায়গায় খুব ছোট ছোট কিছু স্নায়ুকোষের সমাবেশ আছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে সূক্ষ্মজালতন্ত্র (Recticular formation)। এই সূক্ষ্মজালতন্ত্র মস্তিষ্কবল্কল এবং নিম্নমস্তিষ্কের গ্যাংলিয়নের (এই গ্যাংলিয়নের কথায় আমরা একটু পরেই আসছি) মধ্যেকার প্রধান যোগসূত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় মাধ্যমে আসা উদ্দীপনার শক্তি প্রয়োজনমতো কমিয়ে বাড়িয়ে তাদের মস্তিষ্কবল্কলের বিশ্লেষণী অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া এই তন্ত্রের কাজ। এরা যেন মস্তিষ্কের power system, বল্কলের টোন (tone) বজায় রাখার কাজে নিযুক্ত। এরা মস্তিষ্কবল্কলের কাজকে অনেকখানি সাহায্য করে এবং চেতনা বজায় রাখার কাজে এদের বিশেষ ভূমিকা আছে।* তুমি যখন আনমনে আরামকেদারায় শুয়ে ঝিমুতে থাকো, তখন হঠাৎ যদি কোথাও একটা জোরালো শব্দ হয়, তুমি ঝিমুনি ছেড়ে শব্দের উৎস খুঁজতে উন্মুখ হয়ে উঠবে। তোমার সূক্ষ্মজালতন্ত্রের মারফত ঐ শব্দ তোমার আধা-নিস্তেজিত মস্তিষ্কবল্কলের কোষগুলোর টোন বাড়িয়ে তাদের সজাগ করে দিয়েছে, যাতে তুমি অন্য সংকেত ঠিকমতো বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারো। প্রসংগত বলে রাখি, এই সজাগ হওয়া ব্যাপারটা অনুসন্ধানী (Investigating Reflex) পরাবর্তের নিদর্শন।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা ছাড়া আরো একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা সিসটেম স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আছে। এটিকে বলা হয় স্বশাসিত বা অটোনমাস (autonomous) ব্যবস্থা। নিম্নমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে (মেরুমজ্জা) দু'পাশে সারিবদ্ধ খুব ছোট স্নায়ুকোষগুচ্ছ আছে। এদের নাম গ্যাংলিয়ন বা নার্ভগ্রন্থি (ganglion)। এই গ্যাংলিয়নগুলো থেকে বেরিয়ে আসা খুব সরু সরু নার্ভ বা স্নায়ুতন্ত্র দেহের আন্তরযন্ত্র ও গ্রন্থির (viscera and gland) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাদের চালু রাখে। আবার গ্যাংলিয়নগুলো আর-এক প্রস্থ স্নায়ুতন্তুর দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। আন্তরযন্ত্র ও আন্তরগ্রন্থিগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করে এই গ্যাংলিয়ন সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু। এই ব্যবস্থারই নাম অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম

---

* Destruction of the recticulo hypothalamic system does not interfere with the action of the sensory impulses on a specific projection area, but it eliminates the tonic impulses from the hypothalamic recticular system to the cortex as a whole. Under these conditions no conscious processes are elicited (Brain, Diseases of the Nervous system, Oxford Medical Publication, p. 966).

বা স্বশাসিত স্নায়ুব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থার সঙ্গে এই স্বশাসিত স্নায়ুব্যবস্থার কাজকর্মের তফাতটা একটু সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা প্রধানত মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসা বারো জোড়া নার্ভ এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা একত্রিশ জোড়া নার্ভ-এর সাহায্যে তোমার হাঁটা চলা, কথা বলা, ইত্যাদি সবরকম বাইরের কাজকর্ম চালায়। এছাড়া, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগৎ থেকে আসা উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যথাযথ পরাবর্ত তৈরি করে তোমাকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে বা খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, বাইরের জগতের পরিবর্তনে আন্তরযন্ত্রের কাজ-কর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা কাজ চালায় ঐ স্বশাসিত বা অটোনমাস স্নায়ুব্যবস্থার সাহায্যে। মনে করা যাক যে, গিরিডির বাড়িতে বাইরের বাগানে আরামকেদারায় দেহ এলিয়ে তুমি রবিঠাকুরের কবিতা পড়ছো। বাড়িতে কেউ নেই। নির্জন দুপুরে তোমার মন কবিতার ছন্দে সুরে ভেসে অন্য এক লোকে চলে গেছে। এমনি সময় রাস্তার দিকে একটা শোর-গোল উঠলো। তুমি চমকে উঠলে, মন তোমার সুরলোক থেকে বাস্তবলোকে ফিরে এল। তাকিয়ে দেখলে একটা বিরাট আকারের ষাঁড় শিং নিচু করে ঘাড় বেঁকিয়ে তোমাদের গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের রাস্তা দিয়ে সোজা তোমার দিকে ছুটে আসছে। ভয়ে তোমার চোখ দুটো বড় হয়ে গেল, বুক কেঁপে উঠলো। অস্ফুট একটা চিৎকার করে বাড়ির দিকে ছুটলে। পেছনে ষাঁড়ের গর্জন ও খুরের শব্দ। বাড়ির ভেতর ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলে। এই শোরগোল, পাগলা ষাঁড়, প্রথমে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়, পরে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করেছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থার কাছে বিপদের সংকেত পাঠিয়েছে তোমার ইন্দ্রিয়; আর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন নার্ভ মারফত আত্মরক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ পাঠিয়েছে সদাগ পেশীর (striped muscle) কাছে। ফলে তুমি কবিতার বই আরামকেদারায় ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি ঢুকেছ এবং সশব্দে দরজা বন্ধ করেছো। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আরো অনেক ব্যাপার ঘটেছে; তোমার দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতি ও গ্রন্থিগুলোর কাছেও এই বিপদের সংকেত পৌছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা স্বয়ংশাসিত স্নায়ুব্যবস্থার মাধ্যমে। আগেই বলেছি, এই স্বয়ংশাসিত স্নায়ুব্যবস্থার গ্যাংলিয়নগুলো থেকে খুব সরু স্নায়ুতন্ত্র খবর পাঠায় হৃৎপিণ্ড, পাকাশয় ইত্যাদি আন্তরযন্ত্র এবং অ্যাড্রিনাল, পিটুইটারী ইত্যাদি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (internal secretary glands) কাছে। তারা তখুনি রক্তে ঢেলে দিয়েছে তাদের তেজরস বা হর্মোন। তার ফলে এবং স্বশাসিত স্নায়ুব্যবস্থার দ্বারা উদ্দীপ্ত হবার দরুন তোমার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়েছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়েছে, শিরাউপশিরা দিয়ে রক্তসঞ্চালনের গতি বেড়েছে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব শারীরবৃত্তিক

প্রক্রিয়া, দেহের ভিতরকার এইসব পরিবর্তন, তোমার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ঐ দরজা বন্ধ করার পক্ষে ছিল অত্যাবশ্যক। আক্রমণমুখী ষণ্ড সন্দর্শন তোমার মনে ভয় নামক প্রক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। পরিবেশের পরিবর্তনে এমনি করে দেহের ভেতরে বাইরে পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রাণীকে খাপ খাইয়ে নিয়ে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থা। এই রকম জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা স্বশাসিত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিয়ে থাকে। এরপর যখন পাভলভের পরীক্ষাশালার কিছু গবেষণার ফলাফল জানাবো, তখন বুঝতে পারবে স্বয়ংশাসিত ব্যবস্থার 'অটোনমি' আসলে খুবই সীমিত। এই স্বশাসিত ব্যবস্থার আবার দুটো বিভাগ আছে। বিভাগ দু'টি ঠিক বিপরীত ধরনের কাজ করে। যখন তুমি ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুটছিলে, তখন যে বিভাগটি কাজ করছিলো তার নাম সিমপ্যাথেটিক বিভাগ। আর যখন কবিতা পাঠ করে দেহমনের শ্রান্তি অপনোদনে নিযুক্ত ছিলে তখন অন্য অর্থাৎ প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগ সক্রিয় ছিল।

মস্তিষ্কবল্কল সম্বন্ধে আরো দু'একটা তথ্য জানাচ্ছি। রোলাণ্ডের ও সিলভিয়াসের ফাটল দিয়ে যে কয়েকটি লোব বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে মস্তিষ্ককে, তাদের ওপর ন্যস্ত আছে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার। ফ্রণ্টাল লোবের (সম্মুখভাগ) সম্পর্কে আমাদের সীমিত জ্ঞান ক্রমশ বাড়ছে। আগেই জানা ছিল, রোলাণ্ডের ফিসারের একেবারে গা ঘেঁসে সামনে আছে প্রধান কর্মকেন্দ্র বা চেষ্টীয় অঞ্চল (motor area), আর ঠিক পিছনে থাকে দৈহিক সংবেদন কেন্দ্র (sensory area)। পা থেকে মুখ পর্যন্ত সমস্ত অংশের সংবেদন গ্রহণ ও সঞ্চালন ব্যবস্থা রোলাণ্ডের ফাটলের দুই প্রান্তে। তোমার দেহের সব থেকে নিচু অংশের সংবেদন-পরিচালনের ভার মস্তিষ্কবল্কলের সব থেকে উঁচু অংশের ওপর, বলা যায় ফাটলের একেবারে শীর্ষবিন্দুতে। আর সব থেকে উঁচু অংশের পরিচালনার ভার ফাটলের একেবারে নিচুতলায়। আমাদের শরীরের সংবেদন পরিচালনকেন্দ্রগুলো মস্তিষ্কবল্কলে ঠিক যেন উল্টো করে সাজানো। তোমার পায়ে মশা কামড়ালে তার জ্বালা সেই জায়গাটায় অনুভব করবে, কিন্তু মস্তিষ্কবল্কলের সংবেদন অঞ্চলের সব থেকে উঁচুতলায় সাড়া জাগবে আর মস্তিষ্কবল্কলের কর্মকেন্দ্রের অনেক নিচুতলা থেকে তোমার হাতের কাছে নির্দেশ আসবে মশাটাকে চাপড় মেরে তাড়িয়ে দেবার। বেদনার সংবেদন বয়ে নিয়ে মস্তিষ্কে পৌছে দেবে অন্তর্বাহী (afferent) নার্ভ, আর কর্মকেন্দ্র (motor area) থেকে তোমার হাতের পেশী সঞ্চালনের নির্দেশ নিয়ে আসবে বহির্বাহী (efferent) নার্ভ। ফ্রণ্টাল লোবের আরো সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে, এই জায়গাটাকে বলা হয় সংযোগাঞ্চল (association area)। আরো একটু সামনের দিকের জায়গাটিকে বলা হয় চিন্তাভাবনা-সমন্বয়

ও সম্প্রসারণের অঞ্চল। যুক্তি বুদ্ধি বিচার খাটিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার পক্ষে এই অঞ্চলটির বিশেষ ভূমিকা আছে।

রোলাণ্ডের ফাটলের পেছনের দিকের অংশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে,—যার কাজ বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ও প্রয়োজনমতো তাদের সমন্বিত করা। একেবারে পেছনের অংশটিতে (যাকে আমরা বলি occipital lobe) আছে দর্শনকেন্দ্র। আর কানের পিঠের তলায় যে অংশটির অবস্থিতি—(temporal lobe) সেই অংশটি শ্রবণ-সংক্রান্ত কেন্দ্র। এ-ছাড়া তোমার গায়ে কিছু লাগলে সেই সংবেদন যেখানে গিয়ে পৌছোয়, তার নাম স্পর্শকেন্দ্র। ঘ্রাণ ও স্বাদকেন্দ্র (আগেই বলেছি, মানুষের পক্ষে তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়) মস্তিষ্কবল্কলের সম্মুখ ভাগের নিচের দিকে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। আজকাল এইসব অঞ্চলগুলিকে বিশ্লেষক (analyser) বলা হয়ে থাকে। এইসব কেন্দ্র বা অঞ্চলগুলি স্নায়বিক উত্তেজনাকে বিশ্লেষণ করে আমাদের মধ্যে বিশেষ চেতনা উৎপাদন করে; তাই এই নাম। পাভলভ সব সময়েই 'অ্যানালাইজার' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

এইবার সংযোজক অঞ্চলগুলির বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলে এই অধ্যায় শেষ করবো। এইসব সংযোজক অঞ্চলগুলি আকারে অন্য যে কোনো প্রাণীর ঐ সব অঞ্চলের তুলনায় অনেক বড় এবং আমাদের উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার সহায়ক। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দুটির একটির অবস্থিতি পেছনের এবং মাঝের ও পাশের অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে (parietal-occipital-temporal area), আর একটি আছে সামনের অংশের ঠিক পেছনে (pre-frontal area)। প্রথম অঞ্চলটি দর্শন ও স্পর্শ সংবেদনের সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের মনে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা ঘটায়—যার নাম প্রত্যক্ষণ (perception)। টেম্পোরাল লোব সম্পর্কে পেনফিল্ড-এর ধারণা অন্যত্র 'স্বপ্ন স্মৃতি' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে—মনে আছে নিশ্চয়ই। প্রি-ফ্রণ্টাল অংশ সম্পর্কে এইটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে এই অংশ বুদ্ধিযুক্তির ধারক। মস্তিষ্কবল্কলের কেন্দ্রগুলি এক এক বিশেষ ধরনের কাজ করবার বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে, এ-কথাটি ঠিক। কিন্তু একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেলে বা কেটে বাদ দিলে, অন্য অঞ্চল সেই অংশটির বিশেষ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। যুদ্ধের সময় মস্তিষ্কের ক্ষত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে চিকিৎসকদের এই ধারণা জন্মেছে। এ-ছাড়া ইঁদুরের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দু'একজন পরীক্ষক এই অভিমত সমর্থন করেছেন। কিছু পরে এ সম্বন্ধে আর দু'একটি কথা বলবো।

হ্যাঁ, একটা খুব দরকারী তথ্য সব শেষে জানাচ্ছি। মস্তিষ্কের দক্ষিণ ও বাম অর্ধ যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ অর্থাৎ বিপরীত দেহার্ধকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। তুমি যখন ডান হাত তুলছো তখন মস্তিষ্কের বামার্ধের মোটর এরিয়া

থেকে বহির্বাহী নার্ভের মাধ্যমে উত্তেজনা তরঙ্গ নেমে আসছে। তোমার বাঁ গালে মশা বসলে ডানদিকের মস্তিষ্কের সেন্সরী বা সংবেদন কেন্দ্রে সাড়া পৌছুচ্ছে অন্তর্বাহী নার্ভের মারফত। কারণ কি ? নার্ভগুলো সুষুম্নাকাণ্ড, নিম্নমস্তিষ্ক ও অন্যান্য জায়গায় আড়াআড়িভাবে বাঁ থেকে ডাইনে ও ডান থেকে বাঁয়ে চলে গেছে।

পরাবর্ত ও সংকেত

পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের অপর নাম শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিদ্যা, একথা তুমি জানো। শর্তাধীন পরাবর্ত স্নায়ুসংস্থার এক বিশেষ ধর্ম। এই ধর্মের আবিষ্কর্তা ইভান পেত্রভিচ পাভলভ। পাভলভের আগে হয়তো কিছু বিজ্ঞানী মস্তিষ্ককে মানসিক ক্রিয়ার অধঃস্তর বা ভিত্তি (substratum) বলে মনে করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রুশবিজ্ঞানী সেচেনফের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা মননক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক নির্ণয়ের উপায় বা পদ্ধতি পাভলভের আগে কারুরই জানা ছিল না। তাই পাভলভকে বস্তুবাদী বা মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিদ্যার জনক বলা হয়। এই মনোবিজ্ঞানের পরিচিতি প্রসঙ্গে মস্তিষ্ক ও পরাবর্তক্রিয়ার আলোচনা মুখ্য স্থান গ্রহণ করবেই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্নায়ুব্যবস্থা ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি তা একেবারে গোড়ার কথা, স্কুলপাঠ্য কেতাবেই পাওয়া যায়। তুমি না জানলেও হয়তো অনেক পাঠকেরই জানা। পরাবর্ত সম্পর্কে সামান্য প্রাথমিক আলোচনা এই খণ্ডের মুখবন্ধে আছে। এবার এ-সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করছি। বাজার চলতি পুঁথিপুস্তকে এসব হয়তো পাবে না।

অভিযোজন প্রচেষ্টায় ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রাণীর দেহে স্নায়ুসংস্থার উদ্ভব ও পরিণতি ঘটেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে প্রধান তফাৎ কি জানো ? শুধু বাইরের উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্ভিদ সাড়া দিয়ে থাকে, সেই সাড়ায় তার মধ্যে কেবলমাত্র জৈবিক পরিবর্তন ঘটে ; আর প্রাণী উদ্দীপকের সংকেত বুঝতে পারে। সরাসরি তার দেহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না ঘটলেও উদ্দীপকের আবির্ভাবের তাৎপর্য—বিশেষ করে যদি সেই উদ্দীপক তার জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, অনুধাবন করতে পারে ও সেই অনুযায়ী আত্মরক্ষা বা আত্মোন্নতির ব্যবস্থা নিতে পারে।

এই সংকেত প্রাণীর কাছে কি ভাবে আসে ? সংকেত সৃষ্টির জন্য দরকার স্নায়ুসংস্থার তিনটি মৌলিক উপাদান। পরাবর্তক্রিয়া বুঝতে হলে এই তিনটি উপাদানের পরিচয় জানা দরকার ; কেননা পরাবর্তের মাধ্যমেই তৈরি হয় ও

পরাবর্তই প্রাণীকে প্রভাবিত করে। এবার তিনটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শোনো।

(১) গ্রাহক প্রান্ত (Receptors) : জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ (sense organs) ও অন্তর্মুখী সংবেদক নার্ভ-এর প্রান্তগুলি (nerve-endings) গ্রাহক যন্ত্ররূপে কাজ করে। এরা উদ্দীপক উপলব্ধি করে তাকে স্নায়ু তরঙ্গে রূপায়িত করে।

(২) স্নায়ুকোষ (Neuron) : স্নায়ুকোষের কিছু বিশেষত্ব আছে। এদের গায়ে সরু সুতোর মতো ছোটবড় তন্তু (fibre) আছে। এই তন্তু দু'ধরনের। মূলতন্তু (axon) সাধারণত স্নায়বিক উত্তেজনা কোষ থেকে বাইরের দিকে বহন করে। এগুলো প্রায়ই বেশ বড় সাইজের, দু'ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আর অন্য দিকে থাকে এক গোছা ছোট ছোট তন্তু (dendrites)। এদের কাজ অন্য স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়বিক উত্তেজনাকে গ্রহণ করে নিজ দেহে পৌঁছে দেওয়া। একটি স্নায়ুকোষের মূলতন্তু বা অ্যাক্সনপ্রান্ত অন্য তন্তুর ডেনড্রাইটগুচ্ছের কাছে গিয়ে শেষ হয়। নিউরণরা—তা সে যত ছোটই হোক না কেন, স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একক থাকে। কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজনা অ্যাক্সন থেকে ডেনড্রাইট মারফত কোষ থেকে কোষান্তরে বয়ে চলে। এই উত্তেজনা আদানপ্রদানের জায়গাটিকে বলা হয় স্নায়ুসন্ধি (synapse)। এই স্নায়ুসন্ধি পেরিয়ে স্নায়বিক উত্তেজনা সেকেণ্ডে সাধারণত প্রায় ১ থেকে ৩ মিটার বেগে মস্তিষ্কের এক কোষ থেকে অন্য কোষে চলে যায়। এইভাবে পরাবর্ত বৃত্তাংশের প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত উত্তেজনা গ্রহণ-পরিবহনের কাজ চালায় স্নায়ুকোষ। স্নায়ুকোষের তন্তুসংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুকোষের (sensory neuron) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি তন্তু আর চেষ্টীয় (motor) স্নায়ুকোষের থাকে অনেক তন্তু। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুকোষের কাজ উত্তেজনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ু-ব্যবস্থার দিকে পরিবাহিত করা আর চেষ্টীয় স্নায়ুকোষের কাজ কেন্দ্র থেকে উত্তেজনাকে পেশী বা গ্রন্থির দিকে বহন করা। এই দু'রকমের স্নায়ুকোষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে অন্য এক ধরনের স্নায়ুকোষ, যাদের বলা হয় সংযোজক (association neuron)। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুকোষকে আবার অ্যাফেরেণ্ট (afferent) ও চেষ্টীয় স্নায়ুকোষকে এফেরেণ্ট (efferent) নামেও অভিহিত করা হয়। বেশির ভাগ স্নায়ুতন্তুর ওপর পরপর দুটো আবরণী থাকে। এদের যথাক্রমে মাইলিন ও নিউরিলিমা সীদ (myelin and neurilemma) বলা হয়। এইসব স্নায়ুতন্তুর ইংরিজি নাম মেডুলেটেড্ (medulated) নার্ভ ফাইবার। আবার কিছু তন্তুর কোনো আবরণী থাকে না। আবরণ দেওয়া তন্তু সাধারণত দেখা যায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুব্যবস্থায় আর আবরণহীন তন্তু পাওয়া যায় স্বশাসিত স্নায়ুব্যবস্থায়। আবরণহীন তন্তুগুলোর কর্মক্ষমতা আবরণ দেওয়া তন্তুদের থেকে প্রায়শই কম হয়ে থাকে।

(৩) উৎপাদক প্রান্ত (effectors) : পেশী ও গ্রন্থির কোষসমূহ,—যাদের সাহায্যে উদ্দীপনার ফলে পরাবর্ত প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে।

নিচুর তলায় প্রাণীদের বেলায় রিফ্লেক্স গড়ার এই উপাদানগুলো অজটিল, সাদাসিধে ধরনের। প্রাণীদের উঁচুতলার জীবদের বেলায় এই পরাবর্তক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাণী কেবল মাত্র কয়েকটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংকেতে (যা তাদের আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত) সাড়া দিতে পারে। কাজেই পরিবেশ জটিল বা প্রতিকূল হলে এদের সীমাবদ্ধ সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এইসব পরাবর্ত প্রায় সহজাত পরাবর্তের পর্যায়ে পড়ে। বিবর্তনের ধাপে প্রাণী যত উঁচুতে উঠতে থাকে ততই তাকে অনেক বেশি উদ্দীপকের মোকাবিলা করতে হয়। নানারকমের উদ্দীপনার মধ্যে কোনটাতে সাড়া দেবে; কোনটাতে দেবে না; কোনটা হিতকর, কোনটা অহিতকর; কোনটাতে সাড়া দেবার ফলে সঠিক অভিযোজন হবে বা হবে না—এই জটিল নির্বাচনের কাজ করবার প্রচেষ্টায় ক্রমশ তার স্নায়ুসংস্থা জটিলতর ও বেশি শক্তিশালী হতে থাকে। কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার কর্তৃত্বভার ক্রমশ বাড়তে থাকে। মস্তিষ্কবল্কলের (cerebral-cortex) বিস্তার ঘটে, মস্তিষ্কের আকার ও ওজন বাড়ে। প্রাণী যত অভিযোজন সাফল্য লাভ করে, বিবর্তনের ফলে তার মস্তিষ্কবল্কলের পরিধি ও বিস্তার ততই বাড়ে। ক্রমশ মস্তিষ্কে খাঁজের সৃষ্টি হয়, বল্কল সেই খাঁজের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করার সুযোগ পায়। লক্ষ লক্ষ কোষের নানা ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত প্রাণীর পক্ষে বিশেষ বিশেষ প্রত্যঙ্গের স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গোটা প্রাণীর বেঁচে থাকার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। প্রয়োজন হয় কেন্দ্রকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা। সেই প্রয়োজনের তাগিদে বিবর্তিত হয় স্নায়ু সংস্থা। মস্তিষ্ক পরিণত হয় এক জটিলতম যন্ত্রে। বিস্তারিত বিবর্তিত মস্তিষ্কবল্কল বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কেন্দ্রে বা বিশ্লেষণী অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অঞ্চলগুলি বিশেষজ্ঞর ভূমিকা পালন করে। আবার সংযোজক অঞ্চলের আকার পরিধিও বাড়ে, ফলে সংশ্লেষণ ও সমন্বয়ের কাজও সমান গুরুত্ব সহকারে করা চলে। জটিলতম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুব্যবস্থা বিশিষ্ট, প্রাণীজগতের সব থেকে উঁচু ধাপে ওঠা মানুষের পক্ষে অগুনতি উদ্দীপকের ভেতর থেকে তার পক্ষে দরকারীগুলো বেছে নিয়ে সাড়া দেওয়া সম্ভব। এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে গিয়ে তার মস্তিষ্কে ও কিছু কিছু আন্তরযন্ত্রে বেশ বড় রকমের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। সে পশুর অলভ্য বাঙময় জগতের অধিকারী হয়েছে। তার মস্তিষ্কবল্কলে এমন কিছু কেন্দ্র বা বিশ্লেষণী অঞ্চল বিবর্তিত হয়েছে, যা নিম্ন প্রাণীদের নেই। বিশেষ ধরনের স্বরযন্ত্রের অধিকারী হয়ে বাক্‌শক্তি লাভ করেছে।

চিন্তা ভাবনা যুক্তি বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। উদ্দীপক জটিল হলে পরাবর্তের চরিত্রও জটিল হওয়া স্বাভাবিক। শর্তহীন পরাবর্তের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত নতুন আচরণ ব্যবহারের জন্ম দিয়েছে।

এই ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রাণীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে তার কিছু কিছু তথ্য আগেই জানিয়েছি। তার মধ্যে বিশ্লেষণী কেন্দ্রের উদ্ভব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাভলভই প্রথম বিশ্লেষণী কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্যের কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, বিশ্লেষক বা অ্যানালাইজার-এর সাহায্যে মানুষ উদ্দীপককে শুধু যে বিশ্লেষণ করতে পারে তাই নয়, বিভিন্ন উদ্দীপকের সংশ্লেষণও ঘটাতে সক্ষম। অভিযোজনের ব্যাপারে এই ক্ষমতা বিশেষ সাহায্য করে। সংকেতকে বুঝে যথাযথ ব্যবহার করার ফলে অভিযোজন সম্ভব হয়। সুসমন্বিত আচরণ ও ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক এই বিশ্লেষণী ব্যবস্থা মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

পাভলভ এই বিশ্লেষণী ব্যবস্থাকে প্রান্তিক ও কেন্দ্রীয় এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। সব উদ্দীপকই প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত প্রান্তিক অ্যানা-লাইজারকে উত্তেজিত করে স্নায়ুতন্তুর পথ ধরে মস্তিষ্কত্বকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারে গিয়ে শেষ হয়। প্রান্তিক ও কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রান্তিক অ্যানালাইজার উদ্দীপকের স্থূল এবং প্রকৃতিগত গুণগুলোই শুধু বিশ্লেষণ করতে পারে। উদ্দীপকের সংখ্যা, শক্তি ও স্থিতিকাল ছাড়া আর বেশি কিছু বোঝবার ক্ষমতা প্রান্তিক অ্যানালাইজারের নেই। ক্ষমতাটা অনেকটা যান্ত্রিক ও নিচুদরের। কিন্তু কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারের কাজকর্ম অনেক উঁচুদরের। সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ধরে কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজার। উদ্দীপকের সংকেতের আসল তাৎপর্য কি? প্রাণীর বেঁচে থাকা, বংশবৃদ্ধির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? এইসব নিগূঢ় তথ্য নিরূপণ কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারের ধর্ম। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহীপ্রান্ত থেকে সংবেদন মস্তিষ্কবল্কলের যে অংশে এসে শেষ হয়, সেইখানকার স্নায়ুকোষগুলো এই বিশেষ ধর্ম লাভ করে। উদ্দীপকের ফলে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া বা পরাবর্ত গঠনের আগে মস্তিষ্কের সংযোজক স্নায়ুকোষের সাহায্যে অন্যান্য অংশে আসা সংবাদ মস্তিষ্কের বিশেষ অ্যানালাইজারের কাছেও পৌছে যায়। তার ফলে পরাবর্তটি এমনভাবে তৈরি হয় যে প্রাণীর বিভিন্ন দেহাংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটে। সমন্বয় সাধনক্ষমতার জন্যই কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারের বিশেষ গুরুত্ব। কেন্দ্রীয় অ্যানালাইজারের বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে জটিল পরাবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সম্ভব হ'ত না। গোড়ায় তিনটি উপাদানের কথা বলেছিলাম (গ্রাহক প্রান্ত বা receptors, স্নায়ুকোষ বা neurons এবং উৎপাদকপ্রান্ত বা effectors)। অভিযোজন সংকেত প্রদানের উদ্দেশ্যে পরাবর্ত গঠিত হয়;

পরাবর্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় এই তিন মৌল উপাদানের। এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা দরকার। সূক্ষ্মজালতন্ত্রের (reticular formatiou) কথা আগেই বলা হয়েছে ; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তুমি জানো যে পাভলভ সমস্ত পরাবর্তকে প্রজাতি-পরাবর্ত আর ব্যক্তি-পরাবর্ত ; এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি এদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে শর্তহীন ও শর্তাধীন পরাবর্ত। এক একটি প্রজাতি (species) কতকগুলো সংকেতে সাড়া দেবার প্রায় অপরিবর্তনীয় পরাবর্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। বিবর্তনের পথে প্রজাতির অভিযোজন অভিজ্ঞতা তাকে এইসব পরাবর্তক্রিয়ার অধিকারী করেছে। চলতি কথায় আমরা এগুলোকে বলি সহজাত ক্ষমতা বা প্রজাতি ধর্ম (instinct)। তোমার অজান্তে হাতে পিন ফোটালে আপনা থেকেই হাতটা টেনে নেবে, গোবৎস ভূমিষ্ঠ হবার কিছুক্ষণ বাদেই চারপায়ে দাঁড়িয়ে প্রসূতির বাঁটে জিভ ঠেকাবে, কুকুরের মুখে খাদ্য গেলেই লালা পড়ে খাদ্যদ্রব্য ভিজে যাবে। এসব হ'ল মৌলিক ও সরল শর্তহীন পরাবর্তের দৃষ্টান্ত। প্রাথমিক অভিযোজন ক্ষমতার নিদর্শন। এই ক্ষমতা নিয়ে না জন্মালে প্রজাতির পক্ষে টিঁকে থাকা সম্ভব হ'ত না। ঘটছে কিভাবে ? খাদ্যের সঙ্গে মুখের সংস্পর্শ ঘটলো, গ্রাহক প্রান্ত (স্বাদ এখানে উদ্দীপক) উদ্দীপ্ত হ'ল। অ্যাফেরেণ্ট-নার্ভ বেয়ে সংবেদক উদ্দীপক পৌছুলো কেন্দ্রীয় তন্ত্রে। সেখান থেকে চেষ্টীয় উদ্দীপনায় রূপান্তরিত হয়ে অ্যাফেরেণ্ট নার্ভ মারফত লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করলো, লালা নিঃসরিত হ'ল। সোজা এবং জানা কথা। জানা আছে যে প্রজাতির বিবর্তনভিত্তিক অভিজ্ঞতা জমা থাকে সুষুম্নাকাণ্ডে (spinal cord) এবং মস্তিষ্কের নিচুর দিকে—যে অংশ বির্বতনের ফলে প্রথম দিকে গঠিত হয়েছে। আরো জানা আছে যে এইসব শর্তহীন পরাবর্ত প্রায়শ অনড় ও ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ফলে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। আরো জেনেছি, বিবর্তনের শেষের দিকে যে-সব পরিবর্তন, সংযোজন ঘটেছে, (বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অ্যানা-লাইজার বা বিশ্লেষণী কেন্দ্র গড়ে উঠেছে) এইসব প্রজাতিরক্ষক পরাবর্তক্রিয়ায় তাদের কোনো ভূমিকা নেই। প্রাথমিক পর্যায়ের যেসব শর্তহীন পরাবর্তের দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সব শর্তহীন পরাবর্ত ও রকম নয়। মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখির বাসা বাঁধা প্রজাতিরক্ষক ক্রিয়া নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেকগুলো শর্তহীন পরাবর্তের জটিল সমষ্টি। উদ্ভিদরা শুধু অতি সরল স্ব-উপযোজন (auto-regulation) ক্ষমতার অধিকারী। শর্তহীন পরাবর্তের সাহায্যে প্রাণী আরো দুটি বিশেষ ক্ষমতা : যথা, স্বশাসন ও স্ব-পরিচালনার (auto-control and auto-direction) ক্ষমতা লাভ করেছে। এককোষী অ্যামিবার মতো খুব নিচুতলার প্রাণীদেরও অবশ্য স্ব-উপযোজনের ক্ষমতা ছাড়া অন্য ক্ষমতা নেই। বিবর্তনের ধাপে প্রাণী যত উঁচুতলায় উঠেছে তত তার জটিলতর ও যৌগিক শর্তহীন

পরাবর্তের সাহায্যে আত্মরক্ষা-বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা বেড়েছে। এর কারণ কি জানো? কারণ আর কিছুই নয়—স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন। স্নায়ুতন্ত্র যতই জটিল ও পরিণত, স্বশাসন, স্ব-পরিচালনা শক্তি তত বেশি উন্নত। নিম্নতম বহুকোষী প্রাণীর মধ্যে—তার মেরুদণ্ড থাক আর নাই থাক; (মেরুদণ্ডী বিবর্তনের ধাপে উঁচুতলার প্রাণী একথা নিশ্চয়ই জানো) পরাবর্তক্রিয়া ঘটাবার মতো বিশেষ ধরনের স্নায়ুকোষ থাকবেই। নীচুজাতের পোকামাকড়ের মধ্যে এই স্নায়ুকোষ-গুলো একজায়গায় সন্নিবিষ্ট হয়ে সরু সুতোর মতো লম্বালম্বিভাবে থাকে। দুই পাশ বিশিষ্ট বহু খণ্ডে বিভক্ত পোকাদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র অনেকগুলো গ্যাংলিয়নের সমষ্টি, একটা শেকলের মতো দেখতে,—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুমজ্জা বা সুষুম্না-কাণ্ডের পূর্বাভাস। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে উঁচু পর্যায়ে অবস্থিত যারা, তাদের মধ্যে বিবর্তনের ফলে গঠিত হয়েছে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড, বিশিষ্ট সমুন্নত ধরনের স্নায়ুতন্ত্র। আর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে মস্তিষ্ক হয়ে উঠেছে আরো জটিলতর, জ্ঞানেন্দ্রিয় হয়েছে বিস্তারিত এবং অ্যানালাইজার বা বিশ্লেষণী কেন্দ্রে বিবর্তিত।

এতক্ষণ অনেক খটমট কথা শোনালাম। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা, অ্যানালাইজার, আরো অনেক কিছু। এবার সরল ভাষায় পরাবর্ত-পর্ব বিবৃত করছি।

পরাবর্ত কি? এবং প্রাণীর পক্ষে পরাবর্তের গুরুত্ব কতখানি? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্র মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে গঠিত জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বলে। 'নির্দিষ্ট' কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহির্বাস্তবের বিশেষ উদ্দীপকটি যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ততবারই একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে; অন্য কোনো উদ্দীপকে সেই নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে না। এই প্রতিক্রিয়া বা সাড়া স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফল। অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্ক সব সময়েই নির্দিষ্ট।

রিফ্লেক্স দু'ধরনের: বললেন পাভলভ। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া—প্রাণীর সব রকমের ক্রিয়াকলাপই পরাবর্তক্রিয়া বা রিফ্লেক্স। পাভলভ-পূর্ব যুগের প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল যে মননক্রিয়া, বিশেষ করে মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জটিল রহস্যে ভরা। শেরিংটনের মতো বিশ্বখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী মনে করতেন —নিচুর ধাপের প্রাণীদের কার্যকলাপ পরাবর্ত-তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে, কিন্তু মানবমনের ব্যাপারে পরাবর্ত বা স্নায়ুতন্ত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা অচল। মানবমনের কোনো বাস্তব অধঃস্তর বা ভিত্তি আছে (material substratum), একথা পণ্ডিতরাই মানতে চাইতেন না। কজেই সাধারণ সব মানুষই মানসিকতার ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিতেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিজ্ঞানীরা মনে করতেন শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া যেন দুটি সামান্তরাল রেখা, তারা পরস্পরকে হয়তো প্রভাবিত করে, কিন্তু তাদের সঠিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব নয়। পাভলভ মননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন, শারীর-ক্রিয়া মননক্রিয়ার পার্থক্য ও সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। এইভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন ঘটলো। পাভলভ তাঁর ক্রণিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যার গবেষণায় একেবারে নতুন যুগের সূচনা করলেন।

শারীরক্রিয়া সংগঠিত হয় কিভাবে? বলা হয়েছে, তবু আর একবার একটু সহজ করে বলি। কোনো উদ্দীপক প্রথমে স্নায়ুবিশেষকে উত্তেজিত করে স্নায়ু প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। তারপর সেই উত্তেজনা কেন্দ্রাভিগামী নার্ভ মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌছয়। সেখান থেকে কেন্দ্রাতিগ বা বহির্মুখী নার্ভ বেয়ে উত্তেজনা কোনো পেশী, গ্রন্থি বা দেহযন্ত্রে গিয়ে সাড়া জাগায়। এই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট। একই জাতীয় প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দীপক প্রতিবারই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এখানে আমি সেই সব শারীর-ক্রিয়ার কথা বলছি, যেগুলো প্রাণী জন্মমুহূর্ত থেকেই সম্পাদনে সক্ষম। মননক্রিয়া কিন্তু অস্থায়ী এবং বহু শর্তের উপর নির্ভরশীল। কোনো মননক্রিয়াই জাতির সব প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে পরিদৃষ্ট নয়। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের মননক্রিয়া ঘটে বলেই পাভলভ এর নাম দিলেন, 'শর্তাধীন পরাবর্ত'। আর জাতি বৈশিষ্ট্যসূচক স্থায়ী শারীরবৃত্ত-মূলক প্রতিক্রিয়াগুলোর নাম দিলেন শর্তহীন পরাবৃত্ত। শর্তাধীন পরাবর্ত প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় আয়ত্ত প্রতিক্রিয়া—ভঙ্গুর ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যসূচক। শর্তহীন পরাবর্ত প্রজাতির জন্মগত স্থায়ী শারীর বৃত্তিক প্রতিক্রিয়া।

দুই ধরনের পরাবর্তের মধ্যে আর-একটি পার্থক্য আছে। শর্তহীন পরাবর্ত উদ্দীপক পদার্থের মৌলিক বা মুখ্য গুণাবলীর ওপর নির্ভরশীল, আর শর্তাধীন পরাবর্ত পদার্থের গৌণ গুণাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। শুকনো খাদ্যকে সিক্ত করা অথবা কঠিন ভোজ্যদ্রব্যকে নরম করার জন্য যে লালা নিঃসরণ, সেটা জীবের শারীরবৃত্তমূলক ধর্ম বা শর্তহীন পরাবর্ত। খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরের সংস্পর্শে এলেই এই লালা ঝরবে। খাদ্যের চেহারা রঙ দেখার অথবা খাদ্যের গন্ধ নাকে যাবার দরুন যে-লালা নিঃসরণ তাকে বলা হয় মননধর্মমূলক প্রতিক্রিয়া বা শর্তাধীন পরাবর্ত। লালানিঃসরণের মতো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মূলত রঙ, গন্ধ বা শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম নিয়ে জীব জন্মায় না। এ-ধর্ম জীবদ্দশায় অর্জিত। উদ্দীপক বস্তু, খাদ্যের মৌলিক গুণগুলোর শারীরবৃত্তমুলক প্রতিক্রিয়ার সংকেত এই গৌণ গুণগুলোতে বর্তেছে। বাইরের পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় প্রাণী নতুন ধর্ম বা শর্তাধীন পরাবর্তের

অধিকারী হতে থাকে। পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে পুরনো পরাবর্তের প্রয়োজন না থাকলে সেটি ভেঙ্গে পড়ে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের তাগিদে নতুন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। এই ভাঙা গড়ার খেলার মধ্য দিয়ে প্রাণী এগিয়ে চলে। শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত এই প্রত্যয় পাভলভের এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মৌলিক বিশিষ্ট অবদানের জন্য কোপারনিকাস, নিউটন, ডারুইনের সমপর্যায়ভুক্ত পাভলভ।

জীবের ওপর পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যায় ডারউইনের অনুবর্তী পণ্ডিতরা অনেক সময় পূর্বনির্ধারণ (pre-determinism) তত্ত্বের আশ্রয় নিতেন। এই প্রভাব সহজাত আদিম প্রবৃত্তি অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত—এই ধরনের কথা তুমি আজও শুনতে পাবে। বলা হয় যে যোগ্যতমের টিঁকে থাকার প্রচেষ্টায় বাছাই করা রীতিতে নতুন ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে; আবার এও বলা হয় যে অভিযোজন প্রয়াসে আকস্মিকভাবে নতুন ধর্মের উদয় ঘটেছে। প্রাণীবিশেষের অভিযোজনের সঠিক হদিশ এঁরা দিতে পারেননি। সর্বসম্মত ব্যাখ্যা না পাবার ফলেই বিবর্তনের ইতিহাস এবং ব্যক্তি অভিযোজনের ব্যাখ্যা বেশ খানিকটা রহস্যাবৃত ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে তাই ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব সহজে গ্রহণীয় মনে হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই একজন কুশলী স্রষ্টার পরিকল্পিত সৃষ্টি: এই ধারণায় মোটামুটি সকলেই প্রভাবিত। শিক্ষাভিমানীরা বাইবেল, পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে বিবর্তনতত্ত্বের পূর্বাভাস খোঁজেন। কূর্ম-বরাহ ইত্যাদি রূপ পরিগ্রহণ করে অবতাররূপে কেশবের আবির্ভাবের বিবরণের মধ্যেই বিবর্তনতত্ত্ব বিধৃত; এই রকম কথা আমি ছোটবেলায় এক মাষ্টারমশায়ের মুখে শুনেছি। আজকাল দেখছি, খোলাখুলি বিবর্তনতত্ত্বকে বরবাদ করে কেউ কিছু বললে তাঁর ভক্তের অভাব ঘটে না। ইংলণ্ডের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনের এক ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট এই ধরনের এক পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন: ধর্মশাস্ত্রে বেশ জোর দিয়ে ঈশ্বরকে পশুপাখি কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গমভরা পৃথিবীর স্রষ্টা বলা হয়েছে; এবং আমি মনে করি এইটেই সত্য, গল্পকথা নয়; বিবর্তনতত্ত্ব সপ্রমাণ করার মতো কোনো বিজ্ঞানসম্মত তথ্য এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।* দানিকেন তো পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজের অনেককেই তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর উদ্ভট তত্ত্ব প্রচার করে। তুমি বলবে, 'মিসিং লিংক' খুঁজে না পাওয়ার জন্যই দানিকেনের বক্তব্য এত জোরালো হয়েছে, তাঁর বইয়ের এত কাটতি হচ্ছে। আমি বলবো, অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বসৃষ্টি ও মননক্রিয়া সম্পর্কে বস্তুবাদী তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ

---

* H. Enoch, *Evolution or Creation*; Foreword by Sir Cecil Wakeley; Union of Evangelical Students in India, Madras, India, 1966.

ও প্রচার করতে বিমুখ বলেই উদ্ভটত্ব ও রহস্যময়তার প্রভাব কাটিয়ে আমরা এগুতে পারছি না।

পাভলভের শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া গঠনের বস্তুবাদভিত্তিক ব্যাখ্যা এই রহস্যময়তা দূর করতে অনেকটা সাহায্য করেছে বলে মনে হয়। ব্যক্তি-অভিযোজনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর পাভলভ যে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ল্যাবরেটরিতে কঠোর পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর তাঁর বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর যুক্তি 'পূর্বনির্ধারণ তত্ত্বকে' সংশোধিত করেছে, কার্যকারণ সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবিতাকে মননক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

পরিবেশকে পাভলভ দু'দিক থেকে বিচার করলেন। একটা দিক মোটামুটি আপেক্ষিকভাবে স্থাণু, আর একটা দিক পরিবর্তনশীল। পরিবেশের এই দুই দিকের সঙ্গে অভিযোজন দুই ধরনের রিফ্লেক্স বা স্নায়ুপ্রক্রিয়ার কাজ। এরা কিন্তু মোটেই নিরপেক্ষ নয়, এরা পরস্পর-সম্পর্কিত।

হাজার হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক পরিবেশ কম-বেশি একই রকম থাকতে পারে। কোনো প্রাণী-জাতির পক্ষে এ-ধরনের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে টিঁকে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই টিঁকে থাকায় প্রধান সহায়ক বংশগত সূত্রে পাওয়া শর্তহীন পরাবর্ত। এইসব পরাবর্তকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু পরাবর্ত প্রজাতি বা বংশধারা রক্ষক, কিছু পরাবর্ত ব্যক্তি-সংরক্ষক বা আত্মরক্ষামূলক। প্রজাতিরক্ষক পরাবর্তের অভিব্যক্তি দেখতে পাই যৌন-পরাবর্তে। বিশেষ বয়সে, বিশেষ ঋতুতে বা সময়ে পুরুষ ও স্ত্রী-প্রাণী মিলনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উপযুক্ত সঙ্গীর অনুসন্ধান করে মিলিত হয়। মিলনের ফলে সন্তান জন্মে, বংশধারা বা প্রজাতিরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ব্যক্তি-সংরক্ষক পরাবর্তের উদাহরণ আগেই দিয়েছি, আরও দু'চারটে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। গলায় কোনো কিছু অবাঞ্ছিত জিনিস ঢুকলে কাশি হয়, ঐ জিনিসটাকে বের করে দেওয়া এই কাশির উদ্দেশ্য। তেমনি হাঁচি হয় নাকের মধ্যে কিছু ঢুকলে। খিদের সময় মুখে খাবার দিলে লালা নিঃসরণ আপনা থেকে হয়, খাদ্যবস্তুটিকে গিলে ফেলার চেষ্টা আত্মসংরক্ষণ পরাবর্তের একটি দৃষ্টান্ত। এগুলো সরল শর্তহীন পরাবর্ত। প্রাণীজগত থেকে অনেক জটিল শর্তহীন পরাবর্তের উদাহরণ দেওয়া যায়। অনেকগুলো সরল শর্তহীন পরাবর্ত একটার পর একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে ঘটতে থাকে; ফলে দেখতে পাই মৌমাছি ও পিঁপড়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, কয়েক জাতীয় পাখির আকাশ পথে ভ্রমণান্তে লক্ষস্থলে অবতরণ। মাকড়সার জাল বোনা, বাবুই পাখির বাসা তৈরি—এগুলোও অনেকগুলি সরল শর্তহীন পরাবর্তের জটিল বিন্যাস।* এখানে একটা পরাবর্তের ফল অন্য একটি পরাবর্তের উদ্দীপক হিসেবে ক্রমান্বয়ে কাজ করে যায়, ফলে সৃষ্টি হয় মাকড়সার

জাল, বাবুই পাখির বাসা, যার অভিনবত্বে আমরা বিস্মিত বোধ করি। এইসব পরাবর্তক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐ প্রাণী সচেতন নয়। তুমি যদি কোনো পাখির বাসা থেকে ডিম সরিয়ে সেখানে প্রায় ঐ রকম দেখতে দুটো কাঠের টুকরো বসিয়ে দাও, ঐ কাঠের টুকরোর ওপর বসে পাখি সময়মতো তাপ দিতে থাকবে।

সাধারণভাবে এই কাজগুলোকে 'ইনস্‌টিন্‌কৃটিভ' বা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক কাজ বলা হয়। পাভলভ এই কাজগুলোর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বোঝাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরাবর্ত কথাটি ব্যবহার করেন। 'পরাবর্ত' বা রিফ্লেক্স তুমি আগেই জেনেছ, স্নায়ুপ্রক্রিয়া এবং এই কথাটির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অনেকগুলো সরল শর্তহীন পরাবর্তের (একের পর এক ঘটতে থাকার ফলে) বিন্যাস থেকে এইসব আপাতদৃষ্টিতে কঠিন ও জটিল কাজ কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে,—'পরাবর্ত' কথাটি ব্যবহার করে পাভলভ সে সম্বন্ধে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। পাভলভের এই বক্তব্যের সঠিক উপলব্ধির পর এই ধরনের অঙ্গাঙ্গীসংযুক্ত অতি সূক্ষ্ম ব্যবহারের ব্যাখ্যা খুঁজতে আমাদের ভাববাদী রহস্য-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। একটি সরল পরাবর্তের শেষ প্রক্রিয়া অপর একটি পরাবর্তের প্রাথমিক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে,— এই পাভলভীয় প্রত্যয় জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত কারণ হিসেবে গৃহীত হবার ফলে আধ্যাত্মিকতাশ্রয়ী ধ্যানধারণার আধিপত্য খানিকটা অন্তত খর্ব হ'ল। প্রাণীর এই প্রাথমিক অভিযোজন ব্যবস্থার (adaptive mechanism) কথা সহজ করে তোমাকে বলতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, তার ফলে আমার বক্তব্য বোধহয় একটু বেশি স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি পরিবর্তনশীল না হ'ত, তাহলে এই শর্তহীন পরাবর্তের সাহায্যেই হয়তো প্রাণী টিঁকে থাকতে পারতো। তবে ক্রমবিবর্তন সম্ভব হ'ত না, উচ্চতর প্রাণীর উদ্ভব ঘটতো না, তোমার আমার মতো লিখতে জানা, পড়তে জানা হোমো-স্যাপিয়েন্সের আধুনিক বংশধর এই গ্রহে বিচরণ করতো না, নিজের মনকে বুঝতে ও বোঝাতে আমাকে শ্রমস্বীকার করতে হ'ত না।

---

* "The chain-like character of the process, the compounding of a complex effect from simple components whereby the end of one action is the 'stimulus for the beginning of another."

—Pavlov-Lectures on Conditioned Reflex

সব প্রাণীর পরিবেশই শুধু আংশিক ও আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী। পরিবেশের বিভিন্নতা তো আছেই, তাছাড়া আবার একই পরিবেশ ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। খাদ্য সব সময় মুখের কাছে পাওয়া যায় না, বেশির ভাগ সময়ই খুঁজে নিতে হয়। 'ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ'। আত্মরক্ষা সব সময় সম্ভব নয়, তাই বিপদের সংকেত জেনে বিপদকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। যৌন সঙ্গীও প্রয়োজনমতো জুটিয়ে নিতে হয়। এইসব ব্যাপারে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে, শুধু শর্তহীন পরাবর্তের সাহায্য যথেষ্ট নয়। বরং শর্তহীন পরাবর্তের স্থায়িত্ব ও অনড়ত্ব অনেক সময় অভিযোজনের সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমরা জানি, অনাদিকাল থেকেই প্রাণীজগতে বিবর্তন ঘটে আসছে। প্রকৃতির সঙ্গে কোনোমতে মানিয়ে নিয়ে শুধু টিঁকে থাকাই প্রাণীজগতের ইতিহাস নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে একক জীবনে টিঁকে থাকার প্রচেষ্টায় সে নতুন গুণের অধিকারী হয়েছে। এই নতুন গুণ আবার সন্তান সন্ততিতে সংক্রমিত করেছে। এর জন্যে তার স্নায়ুতন্ত্রে এমন এক ব্যবস্থার উদ্ভবের প্রয়োজন হয়েছে, যার সাহায্যে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সম্ভব। এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই শর্তহীন পরাবর্তের সমধর্মী হতে পারে না। এই ব্যবস্থায় থাকবে দরকারমতো নতুন ধর্মের উন্মেষ ও বিলোপ। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রয়োজনে প্রাণী নতুন ধর্ম আয়ত্ত করবে, সেই ধর্ম হবে অস্থায়ী ও পরিবেশ-সাপেক্ষ। প্রয়োজন ফুরোলে এই ধর্মের বিলোপ ঘটবে এবং নতুন প্রয়োজনে আবার নতুন ধর্ম গড়ে উঠবে। শর্তাধীন পরাবর্ত ব্যবস্থায় এই ধরনের বন্দোবস্ত রয়েছে। খাদ্য, সঙ্গী বা বিপদের সংকেতে স্নায়ুতন্ত্রে নতুন সাময়িক সংযোজন ঘটে, নতুন প্রতিক্রিয়া, নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়। আবার সংকেত অনেকক্ষণ না থাকলে সাময়িক সংযোজন বিনষ্ট হয়। এই পরাবর্তের গঠন মস্তিষ্কবল্কলের (cerebral cortex) সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের এই দুই প্রায় বিপরীতধর্মী ব্যবস্থার ফলে প্রাণী পরিবেশের-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে নিপুণভাবে মানিয়ে নিতে পারে। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই দুই ব্যবস্থা আদৌ পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। এই দুই ব্যবস্থা নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত ও সেই সম্পর্ক কয়েকটি নির্দিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষানিরীক্ষা-দ্বারা পাভলভ সেটা প্রমাণ করলেন।

কোনো কুকুরের মুখে খানিকটা তরল অ্যাসিড ঢেলে দিলে কুকুরটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে প্রথমে অ্যাসিডটা মুখ থেকে বের করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে লালা আসতে থাকবে। উদ্দেশ্য—অ্যাসিডের যেটুকু মুখের মধ্যে লেগে আছে সেটুকুকে আরো তরলীকৃত করে মুখ ধুয়ে ফেলা ও

পুরোপুরি অ্যাসিডের সবটুকু বের করে দেওয়া। এটা একটা আত্মরক্ষামূলক শর্তহীন পরাবর্ত, কুকুরজাতির বৈশিষ্ট্য ও জন্মলব্ধ স্থায়ী ধর্ম। এর জন্যে নার্ভতন্ত্রে নতুন পথ তৈরির প্রয়োজন নেই। মাত্র দু'ভাবে এই ধর্ম বা ক্ষমতা বিনষ্ট হতে পারে। মুখের পেশীর চেষ্টীয় নার্ভ ও লালানিঃসরক গ্রন্থির বহির্বহা (efferent) নার্ভগুলো কেটে দিলে এই প্রতিক্রিয়া ঘটবে না। অথবা যদি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ বিশেষ—যেখানে অন্তর্বহা নার্ভ থেকে এই উত্তেজনাস্রোত বহির্বহা নার্ভে সঞ্চারিত হয়, নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও এই প্রতিক্রিয়া ঘটবে না।

এখন অ্যাসিড মুখে ঢালবার ঠিক আগে একটা ঘণ্টা বাজানো হ'ল। কয়েকবার এই রকম করার পর দেখা যাবে যে শুধু ঘণ্টা বাজালেই পূর্বে বর্ণিত প্রতিক্রিয়াগুলো ঘটছে—আগের মতন মাথা-মুখের পেশী সংকোচন ও লালা নিঃসরণ। শর্তাধীন পরাবর্ত গঠিত হয়েছে। আগের মতো এবারও যদি মুখের পেশীর ও লালাগ্রন্থির নার্ভগুলো কেটে দেওয়া হয়, তাহলে এই শর্তাধীন পরাবর্তও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এবারের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মস্তিষ্ক-সংযোজক অন্তর্বাহী (afferent) নার্ভগুলো বিচ্ছিন্ন করলেও এই পরাবর্ত আর সক্রিয় থাকবে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উচ্চতম অংশে, মস্তিষ্কবল্কলের এক বিশেষ জায়গায় (অডিটারী অ্যানালাইজারে) এক নতুন জটিল প্রক্রিয়া ঘটেছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অ্যাফারেণ্ট নার্ভপথের সঙ্গে শর্তহীন পরাবর্তের পেশীসঞ্চালন ও লালানিঃসরণ ক্রিয়ার সংযোগ ঘটেছে। অ্যাসিডের সংকেতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘণ্টার সংকেত।

এই উচ্চস্তরের যোগাযোগ, এই নতুন স্নায়ু-প্রক্রিয়া ঘটাবার ক্ষমতা অনঢ় নিম্নমস্তিষ্কের নেই। মস্তিষ্কবল্কলের বিশেষ গুণযুক্ত স্নায়ুকোষের সেই ক্ষমতা আছে। তাই শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরি সম্ভব হয়েছে। মস্তিষ্কবল্কল বিনষ্ট হলে শর্তাধীন পরাবর্ত বিলুপ্ত হয়।

নতুন তৈরি একটি নার্ভপথের মাধ্যমে কুকুর এক নতুন ধর্ম আয়ত্ত করেছে। ঘণ্টা না বাজিয়ে আলো দেখালে নার্ভপথ তৈরি হ'ত দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে। তেমনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গেও নার্ভপথ তৈরি হতে পারে। মোটকথা, দূরের উদ্দীপনা গ্রহণক্ষম যেকোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই এ-সংযোজন সম্ভব। শর্তহীন উদ্দীপকের (অ্যাসিড) সঙ্গে সঙ্গে শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘণ্টাধ্বনি) বা সংকেত কয়েকবার মস্তিষ্কে পৌছুলেই শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত জেনে রাখো যে, পুরনো দৃঢ় কোনো শর্তাধীন পরাবর্তের ভিত্তিকেও নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠতে পারে।

শর্তাধীন পরাবর্ত ব্যবস্থা যদি শর্তহীন ব্যবস্থার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবে গড়ে উঠতে পারতো, তাহলে অপ্রয়োজনীয় হাজার রকমের অর্থহীন মূলহীন উদ্দীপক মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়ে প্রাণীকে অস্থির করে তুলতো। ঘটতো বিশৃঙ্খলা ও অনর্থক

শক্তিক্ষয়। শর্তাধীন পরাবর্ত শর্তহীন পরাবর্তের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, তাই প্রাণীর প্রায় প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই সাধারণত উদ্দেশ্যমূলক ; হয় ব্যক্তিস্বার্থ না হয় প্রজাতিস্বার্থের পরিপোষক। পরিবেশের শুধু সেই সব সংকেতেই প্রাণী সাড়া দিয়ে থাকে, যেগুলো তার পক্ষে বিশেষ অর্থবহ।

শর্তাধীন পরাবর্তের বিশিষ্টতা অভিযোজন ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রাণীর বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধিকে সম্ভব করেছে।

পাভলভের মতে মননক্রিয়ার বাস্তব অধঃস্তর স্নায়ুতন্ত্র এক অতি জটিল সূক্ষ্ম ও কোমল যন্ত্র। একদিকে স্নায়ুতন্ত্র প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করেছে, আবার অন্যদিকে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সমগ্র প্রাণীর সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। এ-ছাড়া বাইরের দুনিয়ার অসংখ্য প্রভাবকারী উপাদান ও প্রাণীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমও এই স্নায়ুতন্ত্র। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুশীমতো সুইচ টিপে আমরা অনায়াসে বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ যন্ত্রকে কাজে লাগাতে পারি। তেমনি এমন দিন হয়তো আসবে যখন এই একই প্রণালীতে আমরা সব থেকে বিস্ময়কর এই মস্তিষ্কযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবো। পাভলভের এই আশা বর্তমানে কতটা এবং কিভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে—সে-আলোচনা করবো আমরা ব্যবহারবাদী ও পাভলভবাদী মনোবিদ্যার তুলনামূলক বিচার প্রসঙ্গে।

শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে পরাবর্ত সম্পর্কিত আলোচনার ছেদ এখানে টানা চলবে না। আরো কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে। শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের পার্থক্য প্রসঙ্গে জেনেছি যে, প্রথমটি প্রত্যক্ষসংস্পর্শ থেকে ঘটে, দ্বিতীয়টি দূর থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু কিছু কিছু সরল পরাবর্তও দূর উত্তেজনার ফলে ঘটতে পারে। নাকের কিছু দূরে নস্যি বা ঐরকমের কিছু ঝাঁঝালো জিনিস ধরলে তোমার নিশ্চয়ই হাঁচি হবে, চোখের কাছে আঙুল নিয়ে গেলে তোমার চোখের পাতা বুঁজে যাবে, হঠাৎ রাস্তায় একটা বোমা ফাটলে তুমি হয়তো লাফিয়ে উঠবে। পাভলভের মতে এগুলো শর্তহীন পরাবর্ত, ঠিক মননক্রিয়া বা শর্তাধীন পরাবর্ত নয়। লালানিঃসরণের ব্যাপারটাকে আরো একটু বিস্তার করলে বোধহয় আমাদের মননক্রিয়ার স্বরূপ বোঝা সহজ হতে পারে। বস্তুর যে সব মৌল উপাদান লালানিঃসরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সেইগুলো যখন উদ্দীপকের কাজ করে, তখনই শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া ঘটে। খাদ্যের ভৌতিক ও রাসায়নিক উপাদান লালানিঃসরণের জন্য দায়ী। লালার পরিমাপ ও রাসায়নিক গঠন খাদ্যের ঐ সব মৌল গুণাবলির ওপর নির্ভর করে। লালানিঃসরণের মতো শারীরক্রিয়ায়, কুকুরের লালাগ্রন্থির উত্তেজনা ঘটায় শর্তহীন এমন সব বস্তুধর্ম যার রূপান্তরণ, এবং যাকে শরীরের পক্ষে গ্রহণীয় করার জন্যে

লালার প্রয়োজন। কুকুরকে শক্ত খাদ্য দিলে যত লালা পড়বে, নরম খাদ্য দিলে ততটা পড়বে না। খাদ্যনালী দিয়ে খাবারটাকে নামিয়ে দেবার মতো করার জন্য লালা পড়ে। অ্যাসিড দেওয়া হলে তার ঘনত্বের ওপর লালানিঃসরণের পরিমাণ নির্ভর করবে। এখানে লালার কাজ এই যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তির বস্তুটিকে তরল করে এর প্রতিক্রিয়া কমানো। খাদ্য ভিজিয়ে খাদ্যনালী দিয়ে নামিয়ে দেবার জন্য যে লালা ঝরে তাতে মিউসিন (অ্যালবিউমিন জাতীয় জিনিস-এর পরিমাণ বেশি থাকে। খাদ্যটাকে শুধু নরম নয়, পিণ্ডাকৃতি করলে তবে গলা দিয়ে সহজে নামবে। এ-ব্যাপারে 'মিউসিন' দরকার। কিন্তু অ্যাসিড মুখে পড়লে শুধু জলীয় অংশের প্রয়োজন, তাই এই সময় লালায় জলীয় ভাগ থাকে বেশি। কুকুরের মুখে কয়েকটুকরো পাথর ঢুকিয়ে দিলে লালার দরকার হবে না, তাই লালা পড়বে না। একটু নাড়া-চাড়া করেই সহজে পাথরগুলো মুখ থেকে ফেলে দেবে। আবার যদি ঐ পাথরগুলোকে বালির মতো গুঁড়ো করে মুখে ঢোকানো হয়, তবে সেগুলো মুখ থেকে বের করে দেবার জন্য পাথরগুলোকে লালা দিয়ে ভিজেয়ে নেওয়া দরকার, তাই অবাধ লালানিঃসরণ হতে থাকবে। এই হচ্ছে সরল শর্তহীন পরাবর্তের শারীরবৃত্ত। এর সাহায্যেই অভিযোজন ঘটে। অভি-যোজন মানে নিজের বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয় রক্ষা এবং বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু (জড়পদার্থ সমেত)—তার স্বকীয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে না পারলে, নিজস্ব ধর্ম হারাতে বাধ্য। পাভলভ বলেছেন, একটা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ততক্ষণই নিজের ধর্ম অর্থাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, যতক্ষণ তার নিজের বিভিন্ন পরমাণু ও গ্রুপগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট থাকে এবং যতক্ষণ বাইরের জগতের সঙ্গে তার ভারসাম্য বজায় থাকে। স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে, আশ্চর্যজনকভাবে জটিল উচ্চপ্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে আদান-প্রদানের, কার্মিক যোগা-যোগের ব্যবস্থা বজায় রাখা দরকার এবং বাইরে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা প্রয়োজন। উচ্চপ্রাণী ক্রমবিবর্তিত হয়েছে—এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস পাভলভকে জড়পদার্থের পরমাণু বিন্যাসের সঙ্গে প্রাণীদেহের কোষ ও অঙ্গ-বিন্যাসের তুলনা করতে উৎসাহিত করেছিলো; এবং এই বিশ্বাসের বলেই তিনি মননক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকৃতিগত ও বিষয়মুখী (naturalistic and objective) পরীক্ষা কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

কিছু দূরে মাংসের টুকরো, পাথরের টুকরো, গুঁড়ো খাদ্য, এবং সেই রকম দেখতে পাথরের গুঁড়ো রেখে দিলে কুকুর এগিয়ে এসে সেগুলো তার চোখ নাক জিভ দিয়ে পরীক্ষা করবে, খাদ্যদ্রব্য মুখে নেবে, পাথরের টুকরো ও গুঁড়ো থেকে মুখ সরিয়ে নেবে। শুকনো খাবার দূর থেকে দেখলেও লালা ঝরবে অথচ পাথরের টুকরো দেখলে ঝরবে না। তোমার মতো অনেকেই বলবে যে, এই লালা

ঝরা শারীরক্রিয়া নয়, এটা মননক্রিয়া ; যদিও খুবই সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের। দুই ক্রিয়ার মধ্যে তফাৎ শুধু উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ও দূরে অবস্থিতি ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। লালা পড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর মৌল উপাদানের ধর্ম ছাড়াই মননক্রিয়া গঠিত হতে পারে,—এই বিশেষ কথাটি মনে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, খাদ্যবস্তুটির সঙ্গে সংযুক্ত পরিবেশের যেকোনো জিনিসই এই মননক্রিয়া ঘটাতে পারে। খাবারের পাত্র, খাবার দেবার লোক, সেই লোকের কথা, এমন কি পরদার আড়াল থেকে তার পায়ের শব্দও লালা পড়ার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। এমনিতে ঘণ্টা বাজালে বা আলো দেখালে লালা পড়বে না, ঘণ্টা বা আলো যদি খাদ্যবস্তুর সঙ্গে প্রায় একই সময় উদ্দীপক হিসেবে কুকুরের কাছে আসে, তাহলে পরে ঘণ্টা বাজালে বা আলো দেখালে—খাদ্য না থাকলেও, লালা ঝরবে।

উত্তেজনা-নিস্তেজনা

প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে মননক্রিয়ার গবেষণা সে সময় খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। আগেই তো পড়েছো সেচেনফের "Reflexes of the Brain" প্রকাশিত হবার পর কি কাণ্ড ঘটেছিল। তখনকার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সবরকম মননক্রিয়া বোঝবার একমাত্র পদ্ধতি ছিল বিষয়ীগত। পাভলভ যখন সহকর্মীদের কাছে মননক্রিয়া নিয়ে গবেষণার প্রসঙ্গ তুললেন, তখন তাঁদের অনেকেই ব্যাপারটাকে অবাস্তব, অসম্ভব মনে করেছিলেন। একজন সহকর্মী তো সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন যে শুধু মানুষ কেন, পশুদের মানসিকতাও শারীরবৃত্তের ল্যাবরেটরির গবেষণার বস্তু নয়, মানসিকতা ব্যক্তি বিশেষে স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, মন ধরাছোঁয়ার বাইরে।* মন নিয়ে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কথা ভাবাও পাগলামি। পাভলভ তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। ভাববাদী দর্শন-প্রভাবিত সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো তিনি অন্তর্দর্শন ও অনুমানভিত্তিক দূরকল্পনার সাহায্যে মননক্রিয়ার গবেষণায় রাজী হলেন না। মননক্রিয়ার গবেষণায় প্রকৃতি-বহির্ভূত উৎস বা শক্তির কল্পনা

---

* "The psychical life of man and that of the higher animals was so individual and exalted that it not only did not lend itself to investigation, but would even be sullied by our rude physiological methods" (Lectures on Conditioned Reflexes, International Publishers, p. 82)

করবার কোনো প্রয়োজন নেই—বললেন পাভলভ। তাঁর পূর্বসূরি ভাববাদী দার্শনিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই, প্রকৃতিকে বুঝতে গিয়ে জড় অজড় সব বস্তুর ওপর নিজেদের ভাবনাচিন্তা, ইচ্ছা অনিচ্ছা চাপিয়ে দিতেন। যেমন, খাবার বাসনের বা খাদ্য সরবরাহকের পায়ের শব্দ শুনে কুকুর বুঝতে পারছে যে খাবার আসছে। কিন্তু পাভলভ বললেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানীর উচিত মাত্র একটি জিনিস নিধারণ করা : বাইরের উদ্দীপক এবং তার ফলে প্রাণীর যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, এ-দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? এই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা। তিনি নিজের সিদ্ধান্তমতো পরীক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হলেন। পাভলভের এই সিদ্ধান্তের দার্শনিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর ফলে, তিনি ভাববাদীদের আত্মাভিত্তিক প্রকল্পকে সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন এবং বস্তুবাদীদের এই মত মেনে নিলেন যে, মননক্রিয়ার মূলে বস্তুভিত্তিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান। উপরন্তু মনে করলেন যে, বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাদ্বারা মানসিকতার স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব। নেপোলিয়ন নাকি একদিন সেই সময়কার ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর সৌরজগতের ধারণার মধ্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন —স্যার, আমার ঐ প্রকল্পটিতে ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। পাভলভও লণ্ডনে বিজ্ঞানী মহলে প্রায় একই রকমের উক্তি করেছিলেন।* তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানসম্মত বিষয়মুখীন অনুসন্ধানের ফলে জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা জন্মাবে। প্রাণীর অভিযোজন ব্যবস্থা পদ্ধতির ও নিয়ম-কানুনের অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত তথ্য আমাদের অন্তরজগত ভাবরাজ্যের সব রহস্যের যবনিকা একদিন তুলবেই। এই বিশ্বাস তাঁর স্বজ্ঞালব্ধ নয়; যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল। বহুদিন ধরে স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বুঝেছিলেন যে, স্নায়ু-শারীরবৃত্ত কানাগলিতে পথ হারিয়েছে, আর দেখেছিলেন যে তখনকার মনস্তত্ত্ব ভুল পথে চলছে। এ-ছাড়া আরো একটি ব্যাপার তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। জারের রাশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে সেই সময়কার আত্মাপ্রকল্প প্রতিক্রিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করছিল। আত্মা অবিনশ্বর, মানব-প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় : ইত্যাদি তত্ত্ব মানুষের উন্নতির পথে মস্তবড় বাধা—এটা তিনি বুঝেছিলেন। সব থেকে বড় কথা পূর্বসূরি ও

* "For the naturalist everything is in the method, in the chances of attaining a steadfast, lasting truth and solely from this point of view (obligatory for him) is the soul as a naturalistic principle, not only unnecessary for him, but even injurious to his work, vainly limiting his courage and the depth of his analysis." (Lectures on Conditioned Reflexes, p. 60)

সমকালীন রুশ প্রগতিবাদীদের রচনা ও অভিমত তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল—এ কথা অগেই বলেছি। প্রভাববাদীদের মধ্যে সেচেনফের অবদান বোধহয়, সব চেয়ে বেশী।* সেচেনফ বলতেন যে আদিম যুগের মানুষ ভূমিকম্প মহামারী ইত্যাদিকে যে চোখে দেখতো, আজকের শিক্ষিত মানুষ উচ্চমার্গের মননক্রিয়াকে প্রায় সেই দৃষ্টিতেই দেখছেন। এইসবের মিলিত প্রভাবে পাভলভ চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে মননক্রিয়ার গবেষণায় নতুন পথ বেছে নিয়েছিলেন।

শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের পদ্ধতি সম্বন্ধে ত্রিশ বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে পাভলভ ও তাঁর সহযোগীরা স্নায়ু-শারীরবৃত্তের বহু নতুন তথ্য জানতে পারেন। উচ্চমস্তিষ্কের বিশ্লেষণী অঞ্চলের উল্লেখ আগেই করেছি। শর্তাধীন পরাবর্তের সৃষ্টি ও বিলোপের ব্যাপারে এই বিশ্লেষণের বিশেষ ভূমিকা আছে। এই বিশ্লেষণে শুধু স্নায়ুর উত্তেজনা নয়, নিস্তেজনাও কাজ করে। আসলে উত্তেজনা (excitation) ও নিস্তেজনা এই দুয়ে মিলেই স্নায়ুপ্রক্রিয়া। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের মতো এরা বিপরীত ধর্মী। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংঘাত ও পরিবর্তন থেকে অভিযোজন সহায়ক জটিল স্নায়ুক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মস্তিষ্ক কোষের উত্তেজনা ও নিস্তেজনার (excitation and inhibition) পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এবার আলোচনা করবো।

আমরা জানি যে, শর্তাধীন পরাবর্ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন বহির্বাস্তবের কোনো উদ্দীপকের সঙ্গে শর্তাহীন পরাবর্তক্রিয়ার কালগত সংযোজন। সব উদ্দীপক সব অবস্থাতেই শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরি করতে পারবে,—একথা কিন্তু বলছি না। তার আবার কতকগুলো শর্ত আছে। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপক শর্তহীন উদ্দীপকের কিছুক্ষণ আগে মস্তিষ্কে না পৌছুলে পরাবর্ত গঠিত হবে না, এ খবর তুমি আগেই জেনেছো। দ্বিতীয়ত, এই উদ্দীপক শর্তহীন উদ্দীপকের চেয়ে বেশি জোরালো হলে, অথবা বেদনাদায়ক হলে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়া খুবই কঠিন হবে। খাবার দেবার অনেক আগে আলো দেখালে বা ঘণ্টা বাজালে আলো বা ঘণ্টার সঙ্গে পরাবর্ত তৈরি হবে না। ঘণ্টার আওয়াজের পরিবর্তে পটকার আওয়াজের সঙ্গে পরাবর্ত তৈরি করার চেষ্টা বিফল হতে পারে। তেমনি, কোনো কাজ হবে না যদি খাবার দেবার পর ঘণ্টা বাজাই বা আলো দেখাই। এছাড়া, পরাবর্ত গড়ার জন্যে চাই প্রাণীর সুস্থতা ও মস্তিষ্ক-কোষের তৎপরতা। কুকুরের যদি পেট ভরতি থাকে তাহলে খাদ্য উদ্দীপকের সঙ্গে কোনো পরাবর্ত তৈরি করা যাবে না। পরাবর্ত গড়া ব্যাপারটা ঠিক যান্ত্রিক নয়। এক পরিবেশে থাকলেই সব প্রাণীর ওপর পরিবেশের সব প্রভাব সমান

---

* 'পাভলভ পরিচিতি' প্রথমখণ্ডে সেচেনফের পরিচয় দেওয়া আছে।

মাত্রায় অনুভূত হবে না। সবার মধ্যে একই ধরনের রিফ্লেক্স গড়ে উঠবে না। পরাবর্ত তৈরির শর্তগুলো যথাযথ প্রতিপালিত না হলে পরাবর্ত গড়ে উঠবে না, প্রাণী নতুন শিক্ষা আয়ত্ত করবে না। শিক্ষার জন্যে, নতুন পরাবর্ত গড়ার জন্যে, চাই ঠিকমতো পূর্ব-প্রস্তুতি।

নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন মানে নতুন নার্ভপথ তৈরি। ব্যাপারটা কি ঘটছে শোনো। শব্দ বা আলোর তরঙ্গ মস্তিষ্কের যেখানে উত্তেজনা জাগাচ্ছে, সেই জায়গার সঙ্গে লালাগ্রন্থির বহির্বাহী বা এফেরেন্ট নার্ভের কোনো যোগাযোগ ছিল না। খাদ্য মুখের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে নিম্নমস্তিষ্কের কেন্দ্রে লালাগ্রন্থির রসক্ষরণের উত্তেজনা জোগাবার আগে থেকে ঘণ্টা বা আলো শ্রবণ অথবা দর্শন কেন্দ্রের কিছু কোষে সাড়া জাগালো, সেখানে উত্তেজনার ঢেউ উঠলো। মস্তিষ্কের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী উচ্চ মস্তিষ্কের (দর্শন বা শ্রবণকেন্দ্র) কেন্দ্র থেকে উত্তেজনার ঢেউ নিম্নমস্তিষ্কের উদ্দীপ্ত কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। উপর্যুপরি কয়েকবার (কুকুর বিশেষে বেশি কম) এই রকম কালগত সংযোজন হবার ফলে, এক সময়ে দুই উত্তেজনা কেন্দ্রের মিলন ঘটলো ; নতুন নার্ভ-পথ হ'ল। এই নতুন নার্ভপথ তৈরি নিম্ন মস্তিষ্কের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে গুরু-মস্তিষ্কের, মস্তিষ্কবল্কলের (cerebral cortex) উঁচু দরের সূক্ষ্ম গুণবিশিষ্ট কোষগুলিই ভূমিকা নিয়েছে। তাদের দৌলতে জন্মগত পরাবর্ত থেকে নতুন অস্থায়ী পরাবর্ত গড়ে উঠেছে। মিস্ত্রী যেন প্রয়োজন মতো বারান্দার স্থায়ী কোনে 'কাট আউট' থেকে বিয়েবাড়ির ছাদের সামিয়ানার তলায় বিদ্যুতের অস্থায়ী লাইন টেনে নিয়ে গেছে।

শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ার কথা শুনলে ; এবার শোনো শর্তাধীন পরাবর্ত কেমন করে ভেঙে যায়। জীবের অভিযোজনের জন্য নতুন পরাবর্ত গড়াও যেমন দরকার, ভাঙাও তেমন দরকার—একথা তোমার জানা। আরও জানা যে, শর্তহীন উদ্দীপক (লালা নিঃসরণের বেলায় যেমন খাদ্য) ছাড়াই যদি বারবার শর্তাধীন উদ্দীপক (ঘণ্টাধ্বনি) প্রয়োগ করা হয়, পরাবর্ত ক্রমশ দুর্বল হয়ে থেমে যায়। সহসা নতুন বা জোরালো কোনো বহিরুদ্দীপক প্রাণীকে উত্তেজিত করলে রিফ্লেক্স ক্রিয়ার অবলোপ ঘটে। সাইরেন শুনতে অনভ্যস্ত কুকুরের কানের কাছে যদি সাইরেন বেজে ওঠে, অথবা অদূরে সে অন্য কোনো বড়সড় কুকুর দেখতে পায়, তবে তার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে গড়ে তোলা রিফ্লেক্স ভেঙে যাবে। তখন রিফ্লেক্স ক্রিয়া বাইরে দেখা যাবে না ; কিন্তু চিরকালের মতো থেমে যাচ্ছে না। মস্তিষ্ক কোষে রেশ (trace) থেকেই যাচ্ছে। পরে আবার শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে শর্তাধীন উদ্দীপক দু'একবার প্রয়োগ করলেই, প্রথম বারের তুলনায় অনেক কম সময়ে পরাবর্তটি গড়ে ওঠে। যখন রিফ্লেক্স ক্রিয়া ঘটছে না, তখন মস্তিষ্কে উত্তেজনার বিপরীতধর্মী ক্রিয়া নিস্তেজনার উত্তেজিত দুটি অঞ্চলের

যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করছে। পাভলভীয় পরিভাষায় নিস্তেজনাকে বলা হয় ইনহিবিশন (inhibition)। অভিযোজনের জন্য, বিশেষ করে, সূক্ষ্ম অভিযোজন ক্রিয়ার উদ্দীপকের বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। শুধু নতুন সংযোজন ঘটলেই প্রাণীর পক্ষে অভিযোজনের সম্ভাবনা বাড়ে না। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে হলে উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, প্রায় একই রকমের উদ্দীপকের সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুযায়ী, সঠিক পরাবর্ত গড়ে ওঠা দরকার। উদ্দীপকটি পরিবেশের যে বিশেষ সংকেতটি প্রাণীর কাছে নিয়ে আসছে, শুধু সেই সংকেতটিতেই সাড়া দেবার অভ্যাস আয়ত্ত না করলে অভিযোজন প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। উদ্দীপকটি যদি পরিবেশের প্রয়োজনীয় সংকেত বহন না করে থাকে তবে তার ডাকে পরাবর্ত গঠন করলে প্রাণীর লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া, প্রাকৃতিক পরিবেশে ল্যাবরেটরির পরিবেশের মতো শুধু একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপক প্রাণীর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশে, এককভাবে কোনো উদ্দীপক প্রাণীর মস্তিষ্কে সংকেত নিয়ে যাচ্ছে না, অনেকগুলো উদ্দীপক প্রায়ই একসঙ্গে প্রাণীকে উত্তেজিত করছে। এই অবস্থায় প্রাণীকে টিঁকে থাকতে হলে উদ্দীপকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লেষণ ক্ষমতাও আয়ত্ত করতে হয়। এই বিশ্লেষণ সংশ্লেষণের কাজ, একদিকে উত্তেজনা ধর্ম, অন্যদিকে নিস্তেজনা ধর্ম—স্নায়ুকোষের এই দুই মৌলিক ধর্মের ওপর নির্ভরশীল।*

নিস্তেজনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজ কি জানো? যখন শর্তাধীন পরাবর্ত বাইরের জগৎকে ঠিকমতো প্রতিফলিত করছে না, তখন তাকে থামিয়ে দেওয়াই নিস্তেজনার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঘণ্টা বাজানো সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার খাবার দেওয়া না হলে, লালাঝরা কমতে কমতে ক্রমশ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে নিস্তেজনা ক্রিয়ার দরুন।

পাভলভের মতে নিস্তেজনা প্রধানত দু'ধরনের। শর্তহীন বা বহির্জাত এবং শর্তাধীন বা অন্তর্জাত।

পরীক্ষানিরীক্ষার সময় যদি প্রাণীর পরিবেশে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন

---

* In order to maintain an equilibrium with the surroundings, it is essential, on the one hand, to analyse as well as to synthesise the external world because not only simple separate agents act on the animal but also their combinations. The basic processes upon which this synthesis and this analysis are founded, are, on the one hand the excitatory, and on the other hand, the inhibitory process ;—*Conditioned Reflexes and Psychiatry* ; Internationa Publishers, New York ; p. 33

ঘটে শর্তাধীন পরাবর্ত সাময়িকভাবে থেমে যায়। জোরালো শব্দ বা তীব্র আলো, নতুন কোনো দৃশ্য বা অচেনা কোনো মানুষ, যদি অকস্মাৎ পরিবেশে আমদানী হয়, তাহলে প্রাণীর রিফ্লেক্স সাময়িকভাবে ভেঙে পড়ে। কুকুর এই অবস্থায়,—শব্দ ও আলোর উৎস, অচেনা দৃশ্য বা লোকটির দিকে তাকায়, গোঁ গোঁ শব্দ করে, লালা নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের বেলাতেও প্রায়ই এই রকমই ঘটে। ট্রাম রাস্তার গায়ে বাড়ির দোতলার ঘরে বসে আমি একমনে লিখছি বা পড়ছি। ট্রাম বাস লরি কর্কশ শব্দ করে বাড়ি কাঁপিয়ে অনবরত যাতায়াত করছে, মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে না। এইভাবে মন বসাতে আমি অভ্যস্ত। হঠাৎ বাইরে "চোর চোর" বলে অনেক লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। এই ধরনের উদ্দীপকে আমি অনভ্যস্ত। নতুন জোরালো উদ্দীপক মগজে ঢুকতেই আমার মনোযোগ ব্যাহত হলো, বই খাতার সঙ্গে গড়ে ওঠা রিফ্লেক্সটি সাময়িকভাবে ভেঙে গেল। আবার কয়েক মিনিট পরে মনঃসংযোগ করতে পারলাম। মস্তিষ্কের নিস্তেজনা প্রক্রিয়া আমার লেখাপড়ার রিফ্লেক্সটিকে থামিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের নিস্তেজনাক্রিয়াকে বলা হয় বহির্জাত বা শর্তহীন নিস্তেজনা। এ-ক্রিয়া প্রজাতির স্বভাবগত বা জন্মগত বৈশিষ্ট্য।

'শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনার' কথাটির উল্লেখ না করেও ব্যাপারটির কথা কয়েকবার বলা হয়েছে। শর্তহীন উদ্দীপক,—মানে খাদ্য না দিয়ে যদি বারবার ঘণ্টা বাজানো হয়, তবে লালা ঝরা বন্ধ হয় শর্তাধীন বা অন্তর্জাত নিস্তেজনার আবির্ভাবের ফলে । যে উদ্দীপক কিছু আগে উত্তেজনা আনছিল, সেই ঘণ্টার শব্দ এখন নিস্তেজনা আনছে।

পরিবেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এই অন্তর্জাত নিস্তেজনার ভূমিকাই প্রধান। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

মিনিটে ১০০ স্পন্দনের একটি মেট্রোনোমের সঙ্গে যদি খাদ্য রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে, তবে প্রথমটায় ৬০।৮০।১২০ ইত্যাদি নানা স্পন্দনের মেট্রোনোমের শব্দেই রিফ্লেক্স ক্রিয়া ঘটতে থাকে। কিন্তু বারবার যদি ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমটি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও শুধু তার সঙ্গেই খাদ্য পরিবেশন করা হয়, আর ৮০ বা ১২০ স্পন্দনের মেট্রোনোমের বেলায় খাদ্য দেওয়া না হয়, তবে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে শুধু ১০০ স্পন্দনেই কুকুরটি সাড়া দিচ্ছে। ৬০।৮০।১২০ স্পন্দনে আর লালা ঝরছে না। পরিবেশের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের, ৮০ ও ১০০ স্পন্দনের তফাৎ, প্রাণী এখন বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। সূক্ষ্ম বাছাই করার এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে অন্তর্জাত নিস্তেজনা ক্রিয়ার উন্মেষে। ১০০ স্পন্দনের কাছাকাছি স্পন্দনের উদ্দীপকগুলো নিস্তেজক-উদ্দীপক হয়ে গেছে। এর প্রমাণ পাভলভের পরীক্ষার মধ্যেই আছে। ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমটির ঠিক আগে

যদি ৯০।৯৫।১০৫ এই রকম স্পন্দনের একটি মেট্রোনোম (যার সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয়নি) উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে লালা পড়বে না। যদি সদর্থক উদ্দীপকটি (১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম) নঙর্থক (৯০।১০৫) উদ্দীপকের ১০।২০ মিনিট পরে ব্যবহৃত হয় তবে কিন্তু লালা পড়বে। ঠিক যতখানি ঐ ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমের উদ্দীপনায় পড়া উচিত, ঠিক ততখানি লালাই পড়বে। নঙর্থক উদ্দীপকের দরুন নিস্তেজনা প্রবাহ প্রথমদিকে সক্রিয় থাকার ফলে সদর্থক উদ্দীপকক্রিয়া অর্থাৎ লালা নিঃসরণ ঘটেনি। ১৫ মিনিট পরে সদর্থক উদ্দীপক (১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম) কার্যকর হয়েছে ; কারণ তখন নিস্তেজনাক্রিয়া থেমে গেছে।

প্রথমদিকে সব শর্তাধীন উদ্দীপক ক্রিয়াই ব্যাপকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। একথা একটু আগেই বলেছি। ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম যদি উদ্দীপক হয় তবে ১০০-র কমবেশি স্পন্দনের মেট্রোনোমের ধ্বনিও একই পরাবর্তক্রিয়া ঘটাবে। ক্রমশ শুধু এইটিকে বারবার শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোজিত করলে, তবেই প্রাণীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির উন্মেষ ঘটবে, কেবলমাত্র এই বিশেষ উদ্দীপকের সংকেত সাড়া দেবে। গুরুমস্তিষ্কের ওপর উদ্দীপকের ক্রিয়া সম্বন্ধে ফ্রিট্স্‌চ ও হিট্‌জিগ (Fritsch and Hitzig—1870)-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আর পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে গুরুমস্তিষ্কের এক বিশেষ ধর্ম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭০ সালে ঐ দুজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন যে, মস্তিষ্কের স্থান বিশেষের উত্তেজনা সব সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে চায়। তুমি যদি পায়ের পেশীগুলোর সংকোচনের কেন্দ্রটিকে বারবার উদ্দীপ্ত করো, দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যে এই উত্তেজনা গোটা 'মোটর এরিয়াতে' ছড়িয়ে পড়েছে, এবং প্রাণীর সারা দেহের পেশীগুলোতে প্রবল আলোড়ন বা আক্ষেপ ঘটেছে (tonic convulsion) ; ধনুষ্টংকার (tetanus) রোগে যে রকম হয়। পাভলভের পরীক্ষাতেও এই রকমটি দেখা গেল। এ-থেকে গুরুমস্তিষ্কের উদ্দীপনার বিষয়ে একটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। এটিকে বলা হয় বিস্তার ও কেন্দ্রীভবনের সূত্র (Law of Irradiation and Concentration)। প্রথমে উদ্দীপনা মস্তিষ্কের সারা অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত অংশে কেন্দ্রীভূত হয়। নিস্তরঙ্গ শান্ত পুকুরের জলে একটা ছোট্ট ঢিল ফেললে তরঙ্গপ্রবাহ যেমন বৃত্তাকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গুরুমস্তিষ্কেও উত্তেজনাপ্রবাহ ঠিক ঐভাবেই ছড়িয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপার নিস্তেজনা, উত্তেজনা দুই ক্ষেত্রে সমানভাবেই ঘটে। বরং অন্তর্জাত নিস্তেজনার ক্ষেত্রে আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করছি। শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি খাদ্য-রিফ্লেক্স তৈরি করে এদের যে কোনো একটিকে যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, (বেশ

পরপর কয়েকবার উদ্দীপকের সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন না করলেই শর্তাধীন পরাবর্ত ভেঙে যায়) তাহলে কিছুক্ষণের মতো অন্য দুটি রিফ্লেক্সও অকেজো হয়ে পড়ে। আবার কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলে অন্য দুটি রিফ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে, ভেঙে দেওয়া রিফ্লেক্সটি হয় না। এ-থেকে বেশ বোঝা যায় অন্তর্জাত নিস্তেজনা এক বিশ্লেষণী অঞ্চল থেকে প্রথমে অন্য বিশ্লেষণী অঞ্চলে অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে; তারপর কয়েক মিনিট বাদে নিজের অঞ্চলে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এ-থেকে প্রমাণিত হয় যে বিস্তার ও কেন্দ্রীভবনের সূত্র অন্তর্জাত নিস্তেজনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি নয়, উত্তেজনার বিপরীত-ধর্মী একটি প্রক্রিয়া। এর প্রমাণে আর একটি প্রায় একই ধরনের পরীক্ষার উল্লেখ করছি। ধরা যাক, আগের পরীক্ষার আলোর সঙ্গে গড়ে তোলা রিফ্লেক্সটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আলো দেখালে আর লালা পড়ছে না। কিন্তু মেট্রোনোমের সঙ্গে গড়া একটি রিফ্লেক্স সক্রিয় রয়েছে। ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমের শব্দে ১০০ ফোঁটা লালা পড়ছে। এখন যদি মেট্রোনোম-উদ্দীপকের কিছু আগে আলো দেখানো হয়, লালা পড়ার পরিমাণ অনেক কম হবে। ১০০ ফোঁটার বদলে হয়তো ৪০ ফোঁটা। সেই কারণে নিস্তেজনাধর্মী উদ্দীপকের আর এক নাম নঙর্থক উদ্দীপক।

মস্তিষ্কে সদর্থক (উত্তেজক) ও নঙর্থক (নিস্তেজক) দুই বিপরতধর্মী স্নায়ু-প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র বিদ্যমান মৌলিক বৈপরীত্যের নিদর্শন। বলা উচিত, উত্তেজনা-নিস্তেজনা একই প্রক্রিয়ার দুই ব্যঞ্জনা, এদের দুয়ের মিলনের মধ্যে স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সার্বিক অভিব্যক্তি। এই দুই প্রক্রিয়াই সর্বদা গতিশীল, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের উদ্ভব, বিস্তার ও ক্রিয়াপদ্ধতি একই নিয়মের অধীন। জটিল ও অজস্র উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া তথা মানসিকতার বহুরূপী প্রকাশের মূলে আছে এই মৌলিক প্রক্রিয়া দুটি। এদের সাহায্যে মস্তিষ্কের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ধর্ম সম্পাদিত হয়। আমরা জানি, সদর্থক ক্রিয়া অর্থাৎ শর্তাধীন উত্তেজনা নিস্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। আরও জেনেছি, নিস্তেজনা উত্তেজনার মতই সাময়িক ও পরিবর্তনশীল। নিস্তেজনার উদ্ভবের ও সংরক্ষণের শর্তগুলির ব্যতিক্রম ঘটলে নিস্তেজনা আর নিস্তেজনা থাকে না, উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে নিস্তেজনার উদ্দীপক কয়েকবার প্রয়োগ করলে নিস্তেজনার রূপ বদলে যায়। আবার লালা ঝরে। উদ্দীপকটি সদর্থক হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণী নানাবিধ শর্তাধীন সদর্থক ও নঙর্থক রিফ্লেক্স গড়তে শেখে। উদ্দীপকের সূক্ষ্ম সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। দুটো প্রায় একই রকমের উদ্দীপকের সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের প্রভেদ

যদি ৯০।৯৫।১০৫ এই রকম স্পন্দনের একটি মেট্রোনোম (যার সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয়নি) উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে লালা পড়বে না। যদি সদর্থক উদ্দীপকটি (১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম) নঙর্থক (৯০।১০৫) উদ্দীপকের ১০।২০ মিনিট পরে ব্যবহৃত হয় তবে কিন্তু লালা পড়বে। ঠিক যতখানি ঐ ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমের উদ্দীপনায় পড়া উচিত, ঠিক ততখানি লালাই পড়বে। নঙর্থক উদ্দীপকের দরুন নিস্তেজনা প্রবাহ প্রথমদিকে সক্রিয় থাকার ফলে সদর্থক উদ্দীপকক্রিয়া অর্থাৎ লালা নিঃসরণ ঘটেনি। ১৫ মিনিট পরে সদর্থক উদ্দীপক (১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম) কার্যকর হয়েছে ; কারণ তখন নিস্তেজনাক্রিয়া থেমে গেছে।

প্রথমদিকে সব শর্তাধীন উদ্দীপক ক্রিয়াই ব্যাপকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। একথা একটু আগেই বলেছি। ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোম যদি উদ্দীপক হয় তবে ১০০-র কমবেশি স্পন্দনের মেট্রোনোমের ধ্বনিও একই পরাবর্তক্রিয়া ঘটাবে। ক্রমশ শুধু এইটিকে বারবার শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে সংযোজিত করলে, তবেই প্রাণীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির উন্মেষ ঘটবে, কেবলমাত্র এই বিশেষ উদ্দীপকের সংকেত সাড়া দেবে। গুরুমস্তিষ্কের ওপর উদ্দীপকের ক্রিয়া সম্বন্ধে ফ্রিট্‌স্‌চ ও হিট্‌জিগ (Fritsch and Hitzig—1870)-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আর পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে গুরুমস্তিষ্কের এক বিশেষ ধর্ম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭০ সালে ঐ দুজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন যে, মস্তিষ্কের স্থান বিশেষের উত্তেজনা সব সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে চায়। তুমি যদি পায়ের পেশীগুলোর সংকোচনের কেন্দ্রটিকে বারবার উদ্দীপ্ত করো, দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যে এই উত্তেজনা গোটা 'মোটর এরিয়াতে' ছড়িয়ে পড়েছে, এবং প্রাণীর সারা দেহের পেশীগুলোতে প্রবল আলোড়ন বা আক্ষেপ ঘটেছে (tonic convulsion) ; ধনুষ্টংকার (tetanus) রোগে যে রকম হয়। পাভলভের পরীক্ষাতেও এই রকমটি দেখা গেল। এ-থেকে গুরুমস্তিষ্কের উদ্দীপনার বিষয়ে একটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। এটিকে বলা হয় বিস্তার ও কেন্দ্রীভবনের সূত্র (Law of Irradiation and Concentration)। প্রথমে উদ্দীপনা মস্তিষ্কের সারা অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত অংশে কেন্দ্রীভূত হয়। নিস্তরঙ্গ শান্ত পুকুরের জলে একটা ছোট্ট ঢিল ফেললে তরঙ্গপ্রবাহ যেমন বৃত্তাকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গুরুমস্তিষ্কেও উত্তেজনাপ্রবাহ ঠিক ঐভাবেই ছড়িয়ে পড়তে চায়। এ-ব্যাপার নিস্তেজনা, উত্তেজনা দুই ক্ষেত্রে সমানভাবেই ঘটে। বরং অন্তর্জাত নিস্তেজনার ক্ষেত্রে আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। একটি পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করছি। শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তিনটি খাদ্য-রিফ্লেক্স তৈরি করে এদের যে কোনো একটিকে যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, (বেশ

পরপর কয়েকবার উদ্দীপকের সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন না করলেই শর্তাধীন পরাবর্ত ভেঙে যায়) তাহলে কিছুক্ষণের মতো অন্য দুটি রিফ্লেক্সও অকেজো হয়ে পড়ে। আবার কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলে অন্য দুটি রিফ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে, ভেঙে দেওয়া রিফ্লেক্সটি হয় না। এ-থেকে বেশ বোঝা যায় অন্তর্জাত নিস্তেজনা এক বিশ্লেষণী অঞ্চল থেকে প্রথমে অন্য বিশ্লেষণী অঞ্চলে অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে; তারপর কয়েক মিনিট বাদে নিজের অঞ্চলে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এ-থেকে প্রমাণিত হয় যে বিস্তার ও কেন্দ্রীভবনের সূত্র অন্তর্জাত নিস্তেজনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

নিস্তেজনা মানে উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি নয়, উত্তেজনার বিপরীত-ধর্মী একটি প্রক্রিয়া। এর প্রমাণে আর একটি প্রায় একই ধরনের পরীক্ষার উল্লেখ করছি। ধরা যাক, আগের পরীক্ষার আলোর সঙ্গে গড়ে তোলা রিফ্লেক্সটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আলো দেখালে আর লালা পড়ছে না। কিন্তু মেট্রোনোমের সঙ্গে গড়া একটি রিফ্লেক্স সক্রিয় রয়েছে। ১০০ স্পন্দনের মেট্রোনোমের শব্দে ১০০ ফোঁটা লালা পড়ছে। এখন যদি মেট্রোনোম-উদ্দী-পকের কিছু আগে আলো দেখানো হয়, লালা পড়ার পরিমাণ অনেক কম হবে। ১০০ ফোঁটার বদলে হয়তো ৪০ ফোঁটা। সেই কারণে নিস্তেজনাধর্মী উদ্দী-পকের আর এক নাম নঙর্থক উদ্দীপক।

মস্তিষ্কে সদর্থক (উত্তেজক) ও নঙর্থক (নিস্তেজক) দুই বিপরতধর্মী স্নায়ু-প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র বিদ্যমান মৌলিক বৈপরীত্যের নিদর্শন। বলা উচিত, উত্তেজনা-নিস্তেজনা একই প্রক্রিয়ার দুই ব্যঞ্জনা, এদের দুয়ের মিলনের মধ্যে স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সার্বিক অভিব্যক্তি। এই দুই প্রক্রিয়াই সর্বদা গতিশীল, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের উদ্ভব, বিস্তার ও ক্রিয়াপদ্ধতি একই নিয়মের অধীন। জটিল ও অজস্র উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়া তথা মানসিকতার বহুরূপী প্রকাশের মূলে আছে এই মৌলিক প্রক্রিয়া দুটি। এদের সাহায্যে মস্তিষ্কের সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ধর্ম সম্পাদিত হয়। আমরা জানি, সদর্থক ক্রিয়া অর্থাৎ শর্তাধীন উত্তেজনা নিস্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। আরও জেনেছি, নিস্তেজনা উত্তেজনার মতই সাময়িক ও পরিবর্তনশীল। নিস্তেজনার উদ্ভবের ও সংরক্ষণের শর্তগুলির ব্যতিক্রম ঘটলে নিস্তেজনা আর নিস্তেজনা থাকে না, উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়। শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে নিস্তেজনার উদ্দীপক কয়েকবার প্রয়োগ করলে নিস্তেজনার রূপ বদলে যায়। আবার লালা ঝরে। উদ্দীপকটি সদর্থক হয়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণী নানাবিধ শর্তাধীন সদর্থক ও নঙর্থক রিফ্লেক্স গড়তে শেখে। উদ্দীপকের সূক্ষ্ম সংকেতে সাড়া দেবার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। দুটো প্রায় একই রকমের উদ্দীপকের সূক্ষ্মতম বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের প্রভেদ

বুঝতে শেখে। এইসব পরাবর্ত গড়ে ওঠে প্রধানত জীবনধারণ, আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণের তাগিদে ও সংশ্লিষ্ট শর্তহীন পরাবর্তকে ভিত্তি করে। ভাববাদী দর্শন-প্রভাবিত মনস্তাত্ত্বিকরা প্রাণীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতার ব্যাখ্যায় প্রকৃতি-বহির্ভূত নানারকমের অলীক কল্পনার আশ্রয় নিতেন। তাঁদের অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে পাভলভ যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। ইয়োরোপের নাম-করা বড় বড় পণ্ডিতদের মতবাদ খণ্ডনে বারবার সুনিপুণ তর্কজাল বিস্তার করে তিনি তাঁর সংগ্রামী ও আপসহীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেসব কথা সময়মতো শোনাবো। বর্তমানে এইটুকু জেনে রাখো যে ছোট প্রাণী থেকে শুরু করে বিবর্তনের উচ্চতম ধাপে অবস্থিত মানুষের সর্বপ্রকার মানসিকতা মস্তিষ্কাশ্রিত। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। প্রায় ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই প্রকৃতির নিয়মে উত্তেজনা নিস্তেজনা-ক্রিয়ার মাধ্যমে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে, পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনক্ষমতা বিকশিত হয়, নতুন মানসিকতার উন্মেষ বিলোপ ঘটে। হ্যাঁ, আর-একটা কথা। মানুষের চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণী-পদ্ধতি পশুদের থেকে উচ্চাঙ্গের ও ভাষাভিত্তিক পরাবর্তের দরুন অনেকদিক থেকে স্বতন্ত্র। মস্তিষ্কের উত্তেজনা-নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান থেকে পশুদের বিশ্লেষণী ও অভিযোজন ক্ষমতার ব্যাখ্যা সম্ভব।

এইবার আর-এক ধরনের নিস্তেজনার কথা বলে এই অধ্যায় শেষ করবো। পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে, পরিবেশের সংকেত ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে নিস্তেজনার ভূমিকা প্রাণীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবার যে নিস্তেজনার কথা বলছি তাকে বলা হয় প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা (protective inhibition)। উচ্চমস্তিষ্কের কোষ অতিশয় কোমল, অল্পেতেই সাড়া দিতে অভ্যস্ত। কাজেই বড় দরের উত্তেজনা ও দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা প্রাণীর পক্ষে অনুকূল হতে পারে না। তাই তো প্রকৃতিতে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা নিরোধের ব্যবস্থা। বিবর্তনের পথে লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় এ ধর্ম আয়ত্ত হয়েছে। আমরা জানি, বাইরের সংকেত যদি খাদ্য বা যৌনসঙ্গী সঠিকভাবে নির্দেশে অক্ষম হয়, তবে প্রাণী সেই সংকেতে আর সাড়া দেয় না। উদ্দীপক তখন উত্তেজনার পরিবর্তে নিস্তেজনা জাগায়। প্রাণী বিশ্রাম পায়। প্রতিরক্ষা-মূলক নিস্তেজনা এই ব্যবস্থারই আর-এক রূপ। এর সব থেকে পরিচিত উদাহরণ ঘুম। ঘুমের সময় নিস্তেজনাতরঙ্গ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, যদি-না বাইরের বা ভেতরের কোনো উত্তেজনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সারাদিনের উত্তেজনার অপনোদন ও ক্ষয়ক্ষতির পূরণ ঘটায় ঘুম। নিস্তেজনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ঘুম নিয়ে আসে। বলা যায় ঘুম মানে নিস্তেজনা—গভীর ব্যাপক নিস্তেজনা। আবার নিস্তেজনা মানে ঘুম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক

যে নিস্তেজনা আর ঘুমের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। অন্তর্জাত নিস্তেজনার ফলে প্রাণী দুটো প্রায় একই ধরনের উদ্দীপকের সূক্ষ্ম পার্থক্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে নিজেকে সঠিকভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখে, এই নিস্তেজনা তাকে আরও সজাগ, আরও সতর্ক করে। তুমি যখন একমনে কোনো কাজ করো, তখন তোমার উত্তেজনাপ্রবাহ কয়েকটি বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, মস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চল নিস্তেজিত। আর ঘুম একটা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় অবস্থা। ঘুমের মধ্যে মস্তিষ্কের কোষগুলো বিশ্রাম পায়। ঘুম আর নিস্তেজনা প্রসঙ্গে পাভলভ এই প্রশ্ন তুলেছেন এবং উত্তরে বলেছেন নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেই ঘুম আসবে, আর নিস্তেজনা কোনো সীমিত জায়গায় কেন্দ্রীভূত হলেই ঘুম চলে যাবে।*

প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনার আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রত্যেকটি প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের টাইপ অনুযায়ী তার সহ্যশক্তির একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। কোনো উদ্দীপক যদি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি জোরালো হয়, তাহলে সেটির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজনা নেমে আসবে। এই নিস্তেজনার উদ্দেশ্য মস্তিষ্ককোষের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা, তার কার্যক্ষমতা অটুট রাখবার জন্য তার পক্ষে ক্ষতিকর উত্তেজনা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া। পরে যখন স্ব-বিরোধী ও অতি স্ব-বিরোধী (paradoxical and ultra-paradoxical) অবস্থার ব্যাখ্যা করবো তখন এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার সুযোগ আসবে।

প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ব্যবস্থা উচ্চমস্তিষ্কের অভিভাবকের কাজ করে। সম্মোহনের আলোচনায় ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থার কথা বলা হবে। এই অবস্থার নাম প্রাক্‌সম্মোহিত অবস্থা। এই অবস্থায় উত্তেজনা-ক্রিয়া নিস্তেজনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু তার ক্ষমতা এত বেশি নয় যে নিস্তেজনাকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সীমিত রাখতে পারে। সীমিত বিন্দুকেন্দ্রিক নিস্তেজনা উত্তেজনার পরিপূরক হিসেবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষকের কাজ করে। উত্তেজনা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নতুন সংযোজন

---

* Inhibition is a partial, fragmentary, narrowly limited, strictly localised sleep, confined within definite boundaries under the influence of the opposing processes, that of excitation ; sleep, on the contrary, is an inhibition which has spread over a great section of the cerebrum, over the entire hemisphere and even into the lower-lying mid-brain ...either the inhibition spreads and sleep sets in, or the inhibition is limited and the sleep disappears. Lectures on Conditioned Reflexes, p. 311.

ঘটায়, কিন্তু এই সংযোজনকে দুটি বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কাজ করে বিপরীতধর্মী অন্তর্জাত নিস্তেজনা। মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা-নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার চলমান ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল প্রাণীর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা। প্রাণীর সমগ্র ব্যবহার উত্তেজনা নিস্তেজনার সমতারক্ষা এবং বহির্বাস্তবের অবস্থা অনুযায়ী সঠিক অভিযোজনের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কিত।

মন ও মস্তিষ্ক

পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের কিছু পণ্ডিত মনে করতেন মস্তিষ্ক মনের আধার। এক গ্রীক দার্শনিক খৃষ্টজন্মের ছশো বছর আগে ভেবেছিলেন যে চেতনা ও আত্মার অধিষ্ঠান মগজে। আমাদের দেশের কিছু দার্শনিকও প্রায় এই ধরনের মতবাদ পোষণ করতেন। কিন্তু এসবই ছিল অনুমানভিত্তিক কল্পনা। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তেই প্রথম নিজের হাতে প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, মস্তিষ্ক থেকে প্রাণশক্তি নার্ভ বেয়ে এসে পেশীগুলোকে চালায়। যদিও তাঁর বক্তব্য আজ হাস্যকর শোনাবে, তবু জেনে রেখো, পরাবর্ত সম্পর্কিত আদিম ধারণার জন্য তাঁর কাছে পাভলভ ঋণী। দেকার্তের পরে জার্মান দার্শনিক ডিয়েট্জগেন (১৮২৮-৮৮) আরো এক ধাপ এগিয়ে এসে বলেন যে, পিত্তের সঙ্গে যকৃতের ও মূত্রের সঙ্গে বৃক্কের (kidney) যে সম্পর্ক, চিন্তার মতো উঁচুস্তরের মননক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের সেই সম্পর্ক। অনেক পরে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'মেটিরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্‌পিরিও ক্রিটিসিজম' বইতে ডিয়েটজগেনের এই যান্ত্রিক জড়বাদী ধারণার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।* চিন্তা ও বস্তু দুইই সত্য, কিন্তু চিন্তা কোনো বস্তু নয়। গবেষণায় পাভলভের ক্রনিক পদ্ধতি প্রয়োগের আগে মনন-ক্রিয়ার ঠিকমত বস্তুবাদসম্মত ধারণা গড়ে তোলার কোনো পন্থা ছিল না। শর্তাধীন পরাবর্তের আবিষ্কার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদদর্শনের ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করলো। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, চিন্তন, প্রক্ষোভ ও ঐচ্ছিক নির্বাচন ইত্যাদি মনন-ক্রিয়ার বস্তুনির্ভর অধঃস্তরের সন্ধান মিললো। যদিও এখনও আমরা মস্তিষ্কের সবকিছু ক্রিয়াকলাপের হদিশ জানি না, যদিও এখনও মানসিকতার অনেকদিক

---

* "This is obviously false. That both thought and matter are 'real', i.e., exist, is true. But to say that thought is material is to make a false step, a step towards confusing materialism and idealism."—Lenin.

রহস্যে ঢাকা, তবু নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ও জৈব-রসায়নের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের দৌলতে তথাকথিত বহু রহস্যের সমাধানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনুমাননির্ভর অন্তর্দর্শনভিত্তিক মনস্তত্ত্বের আয়ু শেষ হয়ে আসছে।

মস্তিষ্কভিত্তিক মানসিক বিজ্ঞানের চর্চায় সোভিয়েত রাশিয়ার বিরাট অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯২৪-২৫ সাল থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মননক্রিয়ার নতুন মার্কসবাদসম্মত তত্ত্ব খুঁজতে থাকেন। ১৯২৯-৩০ সালে লেনিনের 'ফিলজফিক নোটবুক্স' প্রকাশিত হবার পর তত্ত্ব প্রণয়নে উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। লেনিনীয় প্রতিফলনতত্ত্ব অনুধাবন করার আগ্রহে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে তীব্র তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রতিফলনতত্ত্ব (theory of reflection) কি ? মানুষের সব-কিছু ধ্যানধারণার উদ্ভব ঘটে মস্তিষ্কে বাইরের জগতের ঘটনা এবং বস্তুর ধর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন থেকে। এই হচ্ছে প্রতিফলনতত্ত্বের সারমর্ম।* চেতনা অতীব জটিল বস্তু-মস্তিষ্কের বিশেষ প্রক্রিয়া। বাস্তব বহির্জগতের প্রতিফলন বাস্তব মস্তিষ্কে চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ সম্পর্কে পরে আরো কিছু শুনবে।

সোভিয়েট মনস্তাত্ত্বিকরা প্রতিফলনতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি মৌলিক সূত্র উপস্থিত করলেন। সূত্রগুলোর মূল বক্তব্য এই রকম : (ক) মন মস্তিষ্ক নামক বস্তুর ক্রিয়া শুধু নয়, বাইরের বস্তুজগতের প্রতিফলন ; (খ) মানবমন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল মাত্র নয়, সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতারও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। মানুষ যখন প্রথম সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়, তখন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানবমনে আরো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। মস্তিষ্কক্রিয়া ও মননক্রিয়া জটিলভাবে সম্পর্কিত, পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। ব্যক্তিজীবনে আচরণ ও চিন্তা ঐ একইভাবে সম্পর্কিত। আচরণ সব সময়েই সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের শর্তসাপেক্ষ। এই সূত্রটিকে বলা হয় মনের দ্বান্দ্বিক বিকাশ। এছাড়া সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বলেন যে, (গ) মনস্তত্ত্ব শুধু জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, সামাজিক-ঐতিহাসিক

---

* All of man's ideas are reflections of the properties and relations of objects and phenomena by man's consciousness ....The essence of this theory is that consciousness is considered a function of a specially complex piece of matter —the human brain—the sensation, thinking and other mental processes are nothing but a reflection of objectively existing reality.—Platanov K, *Psychology*, Moscow, 1965.

বিদ্যার সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানবমন গুণগতভাবে পশুমন থেকে স্বতন্ত্র। ইতিহাস শুধু মানসিকতার বিবর্তন ঘটায় না, মননক্রিয়ার নিয়মও পরিবর্তিত করে। (ঘ) বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ভাবনাচিন্তার আধেয় বা বিষয় (content) আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতা আবার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। মানবচৈতন্য শর্তাধীন পরাবর্তের ফলে উন্মেষিত হয়, শর্তাধীন পরাবর্ত আবার শর্তহীন-পরাবর্ত বা সহজ-প্রবৃত্তিভিত্তিক : কিন্তু তা বলে মানুষের আচরণ ব্যবহারের মূলে নির্জ্ঞান বা অবদমিত কামনার কোনো ভূমিকা নেই। চেতনা অপরিস্ফুট থাকতে পারে, তার ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সব-কিছু সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে চৈতন্যের সম্যক উন্মেষ ঘটানো সম্ভব।*

সূত্রকার রুবিনস্টাইনের 'ফাণ্ডামেণ্টালস অব সাইকোলজিতে' এই সব সূত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। তার বইটির মধ্যে কিছু আপত্তিকর ও মার্কসবাদ বিরোধী উক্তি ছিল, যা সব বিজ্ঞানী নির্বিচারে মেনে নেননি। ১৯২৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলে তীব্র বাদানুবাদ চলে। এই বাদানুবাদের প্রসঙ্গ হাজির করে তোমাকে বোঝাতে চাই যে, সোভিয়েটে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ওপরতলা থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাফল্য-অসাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে, অনেক বিচার বিতর্কের ফলে তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। অবশ্য তিনটি বিষয়ে এঁরা সবাই অভিন্ন মত ছিলেন : (১) মার্কসবাদী প্রতিফলনতত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না, (২) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করা হবে না, (৩) ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ভাববাদী দর্শনাশ্রিত মনস্তত্ত্বকে বর্জন করতেই হবে। কিন্তু হয়তো এই মার্কসীয় জ্ঞান সকলে সমানভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি, এবং পুরনোদিনের মনোবিদ্যার তত্ত্ব অনেককে বিশেষভাবে অভিভাবিত করেছিল, তাই সকলেই মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও একমত হতে পারেননি। তোমার আগ্রহের সঞ্চার হলে 'Wortis' এর 'Soviet Psychiatry' বইটির 'পরিশিষ্ট' অংশটি পড়ে দেখতে পারো। এর পর (১৯৪৯-৫০) পাভলভের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কর্নিলভ, রুবিনস্টাইন

* The consciousness may be incomplete or not fully comprehended in its implications, but it retains the capacity to extend its scope and comprehension in response to learning and experience. Soviet psychologists thus accord a high dignity to consciousness and oppose the Freudian concept of an unconscious of immanent ideas (Wortis : *Soviet Psychiatry*, Williams & Wilkins, Baltimore, U.S.A., 1950, pp. 23-24).

প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের লেখার স্ব-বিরোধিতা, ভাববাদনির্ভরতা ও যান্ত্রিক মতবাদের তীব্র সমালোচনা ও সঠিক মূল্যায়ন করা হয়, এবং পাভলভের পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাভলভের দেশের বিজ্ঞানীদেরও পুরনো দ্বয়বাদী ভাবধারা কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। অধিবিদ্যার (metaphysics) প্রভাব কাটিয়ে পুরোপুরি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ-আলোচনা আপাতত স্থগিত থাক।

পরাবর্ত নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে গুরুমস্তিষ্কের কয়েকটি স্বভাবধর্ম আবিষ্কৃত হলো। তুমি জানো, উদ্দীপক মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষকে উত্তেজিত করলে, সেই উত্তেজনা প্রথমে বৃত্তাকারে ঢেউ-এর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাকে বলা হয় বিস্তারধর্ম বা ইর‍্যাডিয়েশন (irradiation)। সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে উত্তেজনার বিপরীত ধর্ম নিস্তেজনার প্রকাশ ঘটে এবং উত্তেজনা ক্রমশ সঙ্কোচনের ফলে—প্রথমে যে বিন্দুটি উত্তেজিত হয়েছিল, সেই বিন্দুটিতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই ধর্মের নাম কেন্দ্রীভবন বা কনসেনট্রেশন (concentration)। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের এই বৈপরীত্য—অর্থাৎ এক অঞ্চলে উত্তেজনা বা নিস্তেজনা ঘটলে পাশাপাশি অঞ্চলে ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া নিস্তেজনা বা উত্তেজনার বিকাশ—মস্তিষ্কের আর একটি স্বভাবধর্ম। এই ধর্মকে বলা হয়—পারস্পরিক আবেশন বা রেসিপ্রোকাল ইনডাকশন (reciprocal induction)। এই ধর্মটি না থাকলে কি ব্যাপার ঘটতো জানো? উত্তেজনা তরঙ্গ প্রতিহত না হলে, কেন্দ্রীভূত না হলে, আমরা দুটো প্রায় একই ধরনের উদ্দীপকের সংকেতকে পৃথক করতে পারতাম না, আমাদের অভিযোজনের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেতো। শুধু তাই নয়, উত্তেজনা বা নিস্তেজনা সারা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করলে আমাদের মনঃসংযোগের ক্ষমতাই থাকতো না। এ-ছাড়া বিনাপ্রয়োজনে অনবরত উত্তেজিত বা নিস্তেজিত হবার দরুণ মস্তিষ্ক-কোষের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ঘটতো। উদ্দীপকের শক্তির মাত্রার সঙ্গে এই পারস্পরিক আবেশনের সম্পর্ক আছে। খুব মৃদু ও খুব তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা যতটা বেশি, মাঝামাঝি মাত্রায় ততটা নয়।

এইবার মস্তিষ্কের আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বভাবধর্মের কথা বলছি। উদ্দীপকের মাত্রা অনুযায়ী পরাবর্তক্রিয়ার মাত্রা কমবেশি হবে—এটা আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি। ১০ মাত্রার উদ্দীপকের ক্রিয়ার যদি ১০ ফোঁটা লালা পড়ে, তবে ২০ মাত্রায় ২০ ফোঁটা, ৩০ মাত্রায় ৩০ ফোঁটা, ৪০ মাত্রায় ৪০ ফোঁটা পড়বে—এ আমরা ধরে নিতে পারি। এই সমানুপাতিক হার কিন্তু একটা জায়গায় এসে অচল হয়ে যাবে। ৫০ মাত্রা উদ্দীপক প্রয়োগ করে হয়তো দেখা যাবে লালার পরিমাণ আর বাড়লো না। উদ্দীপক ৬০ মাত্রার করা হলো, লালার পরিমাণ কমে গেল। আরো বাড়ানো হলো উদ্দীপক, লালা পড়া থেমে

গেল। আরো যদি বাড়ানো যায়, দেখা যাবে কুকুরটির খাবার আগ্রহ চলে গেছে, খাবারের জায়গা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সমানুপাতিক হারের এই ব্যতিক্রম, মস্তিষ্কের স্বভাবধর্ম হলেও কুকুর বিশেষে বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান। কোনো কুকুরের হয়তো ৫০ মাত্রার উদ্দীপকে ব্যতিক্রম দেখা যাবে, কোনোটির হয়তো ৬০ মাত্রায়, কোনোটির আবার ৪০ মাত্রাতেও ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে; শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনে যেমন কোনো কুকুরের জন্য দরকার হতে পারে ১০ বার ঘণ্টা বাজানো, কোনোটির বেলায় ২০ কি ২৫ বার। উদ্দীপকের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা যখন আর বাড়ে না, মস্তিষ্কে এক বিশেষ অবস্থার সূচনা হয়,—যার নাম আপাত-স্ববিরোধী অবস্থা বা প্যারাডক্সিক্যাল ফেজ (paradoxical phase)। এর পর যখন উদ্দীপকের মাত্রা আরো বাড়ানো হয় এবং উত্তেজনা নিস্তেজনার সৃষ্টি (লালা পড়া বন্ধ, খাবার দেখে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া) করে, তখনকার অবস্থাকে বলা হয়—অতিস্ববিরোধী অবস্থা (ultra-paradoxical phase)। অন্যত্র সম্মোহন প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা আছে। এই আপাত-স্ববিরোধী অবস্থাকে অস্বাভাবিক বা অসুস্থ অবস্থা মনে করা ভুল হবে। এ-ও একটা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। মাত্রাতিরিক্ত উদ্দীপকের সংকেতে সাড়া না দিয়ে প্রাণী মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখবার প্রয়াস করছে।

পাভলভের প্রকল্প অনুসারে প্রতিটি মননক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কবল্কলের (cerebral cortex) বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট। মস্তিষ্কবল্কলের পরিচয় আগেই দিয়েছি। বর্তমানে আরো দু'একটি তথ্য যোগ করছি। গুরুমস্তিষ্কের এই আচ্ছাদনীটি ২.৫ মিলিমিটার পুরু। এর কোষ সংখ্যা প্রায় ১৫০০ কোটি। তাদের আয়তন ০·০০৫ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আকৃতি অনেক রকমের। বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষের আকার বিভিন্ন। একটি কোষ আশেপাশের কোষের সঙ্গে অনেক সংযোগসেতু দিয়ে সম্পর্কিত। সংযোগ-সেতুর সংখ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় ১০ হাজারের মতো। এই বল্কল ৬টি আলাদা স্তরে বিভক্ত। তার মধ্যে কাজ অনুযায়ী কোষগুলো পৃথক পৃথক গ্রুপে থাকে। মননক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোর নক্‌শা তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই নক্‌শাতে বিভিন্ন সংখ্যা বিভিন্ন মননক্রিয়ার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো সংখ্যা দর্শনেন্দ্রিয়ের চিহ্নক, কোনোটি বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের। নির্দিষ্ট কেন্দ্রের কাজ প্রয়োজনে অন্য অংশ গ্রহণ করতে ও চালাতে সক্ষম। মস্তিষ্ককোষের নমনীয়তা ও অন্যকোষের কার্যভার গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকার ফলে মস্তিষ্কের নতুন কোষ (নবায়নের) তৈরির অক্ষমতা অনেকটা পরিপূরণ হয়েছে। দুটি অর্ধের একটি অনেক সময় অপরটির পরিপূরক হয়ে কাজ করতে পারে। ৪৬ বছর বয়সে পাস্তুরের (লুই পাস্তুর, ফরাসী জীবাণু-বিজ্ঞানী) মস্তিষ্কের দক্ষিণঅর্ধে রক্তক্ষরণ ঘটে। এর পর তিনি ২৭ বছর বেঁচে ছিলেন এবং অনেক

উচুদরের গবেষণার কাজ এই সময়ে করেন। মরার পর পোস্ট মর্টেম পরীক্ষাতে দেখা গেল যে তাঁর মস্তিষ্কে দক্ষিণার্ধ পুরোপুরি অকেজো হয়ে আছে। তিনি শুধু বামার্ধ দিয়েই সব কাজ চালিয়েছেন। আগেকার দিনে মনে করা হতো যে, বল্কলের কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোনো কেন্দ্রের কাজ মস্তিষ্কের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক খুবই জটিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। পাভলভের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রগুলোর পারস্পরিক নির্ভরতা ও সম্পর্কের দরুণ সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্ক চলমান ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। আলাদা আলাদা জায়গায় ক্রিয়া-কেন্দ্রের অবস্থান হলেও গোটা মস্তিষ্ক সামগ্রিকভাবেই কাজ করে।

মস্তিষ্কের অনেক ধর্ম, অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনলে। উত্তেজনা, নিস্তেজনা, পারস্পরিক আবেশন, উত্তেজনার প্রসারণ, কেন্দ্রীভবন ইত্যাদি। এইবার বল তো—যদি করোটিতে একটা ছোট্ট ফোকর থাকে, আর যদি উত্তেজনার জায়গাগুলো আলোকিত থাকে, আর নিস্তেজিত জায়গাগুলো থাকে আঁধারে ঢাকা, তাহলে ফোকর দিয়ে তাকালে সক্রিয় মানুষের মস্তিষ্কের চেহারাটা কেমন দেখতে হবে? মনে হবে একটা গোলকের মধ্যে কালো-শাদা অনেকগুলো বিন্দু চলে বেড়াচ্ছে: কিংবা একটা তাঁবুর মধ্যে কিছু বাল্ব জ্বলছে, কিছু বাল্ব নিভছে। কিছু আবার নিভু নিভু হয়ে রয়েছে। আসলে এক গভীর ঘুমের সময় ছাড়া মস্তিষ্কের চেহারাটা অনেকটা খোপ কাটা শতরঞ্চির মতো 'মোসেইক' (mosaic) প্যাটার্নের।*

মস্তিষ্কবল্কলে দেহের প্রতিটি অংশের ও আন্তরযন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করার কেন্দ্র বা অঞ্চল আছে। প্রাণীর বেঁচে থাকা ও অভিযোজনের ব্যাপারে যে অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের গুরুত্ব যত অধিক, সেই অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি-অঞ্চল ততো বেশী বড়। নিম্নপ্রাণীদের কারো ঘ্রাণেন্দ্রিয়, কারো দর্শনেন্দ্রিয়, কারো বা শ্রবণেন্দ্রিয়, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ব্যাপারে বেশি কাজে লাগে; সেই অনুযায়ী মস্তিষ্কে তাদের অবস্থানের গুরুত্ব। মানুষের বেলায় ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কবল্কলের খুব অল্প জায়গা দখল করে আছে। বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে সংযোজক অঞ্চল—যার কাজ বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। এই বিশেষ অঞ্চলের দৌলতেই

* At any moment the brain is an elaborate changing mosaic of points and areas of inhibition and excitation spreading, converging and interacting rapidly or slowly—Wortis, Soviet Psychiatry, 1950, p. 30.

মানবমস্তিষ্ক সব অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, অখণ্ডতা বজায় রাখে, বাইরের পরিবেশ ও ভেতরের পরিবেশ থেকে আসা সংকেতগুলো সম্যক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে সুষ্ঠুভাবে সাড়া দিতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত পরাবর্তের আলোচনায় আমরা বাইরের শর্ত ও উদ্দীপকের কথাই শুধু বলেছি। আন্তরযন্ত্র ও মস্তিষ্কবল্কলের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। আন্তরযন্ত্র থেকে আসা সংকেতের সঙ্গেও পরাবর্ত গঠিত হয় এবং বাইরের জগতের পরিবর্তন মস্তিষ্কবল্কলের মাধ্যমে আন্তরযন্ত্রের সব রকমের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। পাভলভের সুযোগ্য সহযোগী কে. এম. বিকফ বহু বছর ধরে অজস্র পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে মস্তিষ্কবল্কল ও আন্তরযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের তথ্যাবলী প্রকাশ করে স্বশাসিত স্নায়ুব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তার সীমাবদ্ধতা সপ্রমাণ করেছেন।* চিন্তা, ভাবনা, অভিভাবন, হৃৎপিণ্ড-পাকাশয় থেকে সুরু করে প্রতিটি ছোট বড় আন্তরযন্ত্র ও গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে থাকে। অনেকেই সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রভাবের শারীরবৃত্তের সঠিক অনুধাবন বিকফের আগে কেউই করেননি। ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে আগে বিজ্ঞানীরা রহস্যবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। আজকাল দেহ-মন সমান্তরালবাদের সাহায্য নিচ্ছেন। মন ও দেহ সমান্তরাল থেকে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তাই উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ জাতীয় প্রক্ষোভ হৃৎপিণ্ড পাকাশয় প্রভৃতি আন্তরযন্ত্রকে বিকল করে, রোগগ্রস্ত করে। বলাবাহুল্য, এই ব্যাখ্যা অধিবিদ্যার (metaphysical) আওতায় পড়ে, আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়। অন্ত্রক্ষত, রক্তচাপবৃদ্ধি, হাঁপানি প্রভৃতি বহু রোগের সঠিক শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা আমরা জেনেছি বিকফের গবেষণার দৌলতে।

মানবমস্তিষ্ক ও মন সম্পর্কে সরল জড়বাদী ধারণা আর পাভলভীয় দ্বান্দ্বিক ধারণার পার্থক্য একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। মস্তিষ্কের আঘাতজনিত মানসিক বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং শবব্যবচ্ছেদ ও মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের ফলে বহুবিধ মানসিক অবস্থার সঙ্গে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সম্পর্ক জানা গেছে। স্নায়ুশল্য চিকিৎসা (neurosurgery) ও স্নায়ুবিজ্ঞান (neurology) মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনেক তথ্য ধীরে ধীরে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এ-সবই নিঃসন্দেহে পুরনো ভাববাদী ও অধিবিদ্যামূলক ধারণাকে অনেকাংশে দূর করেছে। কিন্তু এখনও অনেক বিজ্ঞানী মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক বিচারে কিছুদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানাশ্রিত পথে চলার পর শেষপর্যন্ত রহস্যবাদকে আশ্রয় না করে পারেন না। এর একটি কারণ

* Bykov K. M, Cerebral Cortex and Internal Organs- Moscow, 1944.

আগেই উল্লেখ করেছি,—হাজার হাজার বছরের সনাতনী ভাবধারার প্রভাব। অন্য একটি কারণ সম্পর্কে এবার দু'চার কথা বলছি।

একজন সোভিয়েট অধ্যাপক, এ, লুরিয়া কিছুদিন আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মন এবং মস্তিষ্কের গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার সারাংশের কিছুটা এখানে তুলে ধরছি। এ-থেকে বুঝতে পারবে যে, সব দেশেই মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণার ফলে নতুন তথ্য জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন উচ্চতম মননক্রিয়া,—চিন্তা ও চৈতন্যের উন্মেষ ও বিশেষত্বের ব্যাখ্যায় অপার্থিব শক্তির প্রভাবের কথা ভাবতে অভ্যস্ত।* লুরিয়া বলেন :

'শল্যচিকিৎসা ও স্নায়ুবিদ্যার ক্রমোন্নতির ফলে আমরা আজ অনেক কিছু সুনিশ্চিতভাবে জেনেছি। জার্মান স্নায়ুবিদ ফরেস্টার, অস্ট্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক পট্‌জ্‌ল, কানাডার শল্যচিকিৎসক পেনফিল্ড মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সময় মস্তিষ্কবল্কলের বিভিন্ন অংশ উত্তেজিত করে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। এইসব প্রতিক্রিয়ার দু'একটি উল্লেখ করছি। মস্তিষ্কের পেছন দিকের বল্কল (occipital region, ১৭ চিহ্নিত অঞ্চল) উদ্দীপ্ত করলে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, পাশের দিকের রগ-অঞ্চল (temporal lobe—২১-২২-৩৭-৩৮-৩৯ ও ৪১-৪১ চিহ্নিত অঞ্চল) উদ্দীপ্ত হলে শ্রুতিবিভ্রম ঘটে। অক্‌সিপিটাল লোবের আরো কিছুটা পেছনদিকে উত্তেজনা ঘটালে (১৮, ১৯ চিহ্নিত এলাকা) ব্যক্তি ছোট ছোট আলোর ফুটকি অথবা বিলীয়মান আলোর শিখা দেখতে পায়। আবার ঐ অঞ্চলের কিছুটা সামনের দিকে ইলেক্‌ট্রোড প্রবেশ করালে অতীতে দেখা অনেক-কিছুর ছবি চোখের সামনে ভেসে আসে—যেমন অপরিচিত মুখ, বা জন্তু-জানোয়ারের, পশুপাখির চেহারা। ফলে বিজ্ঞানীদের মনে আশা জাগে যে, এবার চিন্তার যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ভূমিকা পুরোপুরি বোঝা যাবে, রহস্য-যবনিকা উন্মোচিত হবে। জটিল মানসিকতার বাস্তবভিত্তি মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে খুঁজে পাওয়া যাবে। উদ্দীপনা ও উৎসাহ সহকারে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, টিউমার ও আঘাত নিয়ে আরো ব্যাপক ও সূক্ষ্ম গবেষণা চালানো হলো। প্যারাইটাল অঞ্চলের নিচুর দিকে আঘাত লাগলে রোগীর স্থান-উপলব্ধিতে বিশৃঙ্খলা ঘটে, ডাইনে বাঁয়ে গোলমাল ঘটে। একটি বিশেষ জায়গায় আঘাত লাগলে কথা বলার বাধা জন্মায় ; অন্য এক জায়গায় আঘাত লাগলে কথা বুঝতে অসুবিধে হয়। এ-থেকে স্নায়ুবিদ্‌দের ধারণা জন্মালো যে মস্তিষ্ক বল্কলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত রয়েছে কথা বলা, কথা বোঝা, লেখা, গণনা করা, জটিল বাক্যের

---

* মানবমন—১৯৬৫ জানুআরি সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৬-৩০

গঠন, বিমূর্ত চিন্তা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ইত্যাদির নির্দিষ্ট কেন্দ্র এবং এদের সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাইষ্ট তাঁর মানচিত্রে 'ঐচ্ছিক কাজ', 'সামাজিক চেতনা', 'ধর্মীয় বিশ্বাস' ইত্যাদিরও বিশেষ কেন্দ্র চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেলেন। কিন্তু জটিল মানসিক প্রক্রিয়া মস্তিষ্কবল্কলের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অংশের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল—এই অনুমান অচিরেই ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো। বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তারা সাময়িক সাফল্যের পর অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বাস্তববর্হিভূত, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসীরা উল্লসিত হলেন।

কিন্তু পাভলভ-শিষ্যরা বিচলিত বা হতাশাগ্রস্ত হননি। আনোখিন, ভাই-গোগটসকী, লুরিয়া প্রমুখ কর্মীরা পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন যে, এই সব উচ্চাঙ্গের মননক্রিয়া কেন্দ্রবিশেষের ধর্ম নয়। এই সব জটিল মানসিক-শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া মস্তিষ্কবল্কলের বিভিন্ন অঞ্চল একই সঙ্গে কাজ করার ফলে সংগঠিত, গোটা মস্তিষ্কের চলমান ক্রিয়াশীলতার নিদর্শন। মানুষের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিকাশের পথে সৃষ্ট হয়েছে মস্তিষ্কের এই বিশেষ জটিল ধর্ম।

শ্রুতিলেখন খুবই সাধারণ এক মননক্রিয়া। সেই অভ্যাস আয়ত্ত করতে মস্তিষ্কবল্কলের অনেকগুলি অঞ্চলের সহযোগিতা ও সংযোজনের প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধে লুরিয়ার বক্তব্য শোনা যাক।

কোনো শব্দ শুনে লেখবার সময় সেই শব্দটির ধ্বনিময় গঠন অনুধাবন করতে হবে। ধ্বনিময় গঠন অনুধাবন মানে—সেই শব্দটি যে-সব ধ্বনির দ্বারা গঠিত, সেই সব ধ্বনি অনুরূপ অন্যান্য ধ্বনি থেকে আলাদা করে শুনতে শেখা। 'Cucumber' শব্দটির ধ্বনিময় গঠন অনুধাবন করতে হলে 'কি' 'এম্' ও 'বি', এই ধ্বনি তিনটিকে 'টি' 'এন' ও 'পি,' এই তিনটি অনুরূপ ধ্বনি থেকে পৃথক করতে শেখা—প্রথমে দরকার। তা না করতে পারলে আমরা 'cucumber'-এর বদলে 'tutunper' লিখে বসবো। মস্তিষ্কবল্কলের শ্রবণকেন্দ্রের বিশ্লেষণী অঙ্গ এই কাজ করে। এই অংশ কোনোভাবে অকেজো হয়ে পড়লে ধ্বনিময় গঠন অনুধাবনে অক্ষম হবো এবং আমাদের শ্রুতিলিপি সঠিক হবে না। অনেক শিশুই গোড়ার দিকে একই রকমের ধ্বনিদ্যোতক শব্দকে পৃথক পৃথক করে লিখতে পারে না। তখন তারা শব্দটি উচ্চারণ করে, উচ্চারণের সাহায্যে ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও সমধ্বনি শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করে। এই সময় উচ্চারণে বাধা দিলে তার শ্রুতিলিপিতে প্রায় ৬ গুণ বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা। শব্দ উচ্চারণ করার প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কবল্কলের অন্যান্য ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ আবশ্যক। এ-ব্যাপারে যে-অঞ্চলটির ভূমিকা প্রধান, তার নাম কাইনেসথেটিক (kinaesthetic analyser) অ্যানালাইজার বা চেষ্টাবেদন কেন্দ্র। এর অবস্থিতি শ্রবণকেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। এই অংশে আঘাত লাগলে উচ্চারণে

বিশৃঙ্খলা ঘটে। ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অনুরূপ ধ্বনিগুলো লেখার সময় গুলিয়ে যায়। কিন্তু এই সব নয়। এছাড়া লেখককে শ্রুত শব্দকে কাগজের ওপর বর্ণে রূপান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ ধ্বনিময় শব্দকে বর্ণে অনুলিখিত করতে হবে। এটা করতে গেলে বর্ণের দৃশ্যরূপকে মনে রাখতে হবে এবং সেই রূপকে প্রয়োজনমতো স্থানীয় ক্ষেত্রের মধ্যে যথাযথ প্রতিবিম্বিত করতে হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, মস্তিষ্কবল্কলের অন্যান্য অংশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ন ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না। মস্তিষ্কবল্কলের পেছনদিকের পিণ্ড (occipital lobe) ও পাশের দিকের অঞ্চল এই কাজ করে। এই অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি বা অসুস্থতা ঘটলে আমরা ধ্বনিময় গঠনের পার্থক্য বুঝলেও, আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে শ্রুতধ্বনিকে ঠিকমতো প্রতিলিখিত করতে পারবো না। এছাড়া বর্ণগুলোর ক্রমানুসারিতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের বোধ ছাড়া লিখনপ্রক্রিয়া সম্ভব নয়। বর্ণমালার এই ক্রমানুসারিতা (sequence) এবং এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে অতিসহজে ক্রমাপসরণ মস্তিষ্কবল্কলের অন্যান্য অঞ্চলের সক্রিয়তার ফলে ঘটে। সেইসব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের চেষ্টিয় দক্ষতা (motor skill) কমে যায়। তখন আমরা বর্ণসমূহের সঠিক ক্রমানুসারকে আয়ত্তে রাখতে পারি না।

মাত্র এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে গুরুমস্তিষ্কের জটিল সংগঠন ও সংযোজনের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে পারছো। অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়ার গুরু-মস্তিষ্কের জটিল কার্যকলাপও এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, উচ্চতম মানসিকতার বাস্তব অধঃস্তর মস্তিষ্কযন্ত্রটি সব সময়েই একটি যুক্ত জটিলভাবে সংগঠিত কার্মিকতন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে এই তত্ত্বই প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কবল্কলের সকল অংশের দ্বন্দ্বমূলক ও সুসমন্বিত কাজের ফলেই বহির্জগতের বিচিত্র রূপের প্রতিফলন ও সংগঠিত আচরণ সম্ভব। এই প্রতিফলন ও আচরণই আমাদের মানসিকতা। মস্তিষ্ক একটি জটিল সামগ্রী (complex whole)।

মানসিক ক্রিয়াকলাপের বাস্তবভিত্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পথে আমাদের এই প্রথম পদক্ষেপ। অবশ্য তা হলেও বলা চলে, আমরা এযাবৎ অনেক মহামূল্য তথ্য ও সূত্র লাভ করেছি এবং আরো মূল্যবান তথ্যের অপেক্ষায় আছি।'

অধ্যাপক লুরিয়ার বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তোমাকে শুধু এই বোঝাতে চেয়েছি যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া অগ্রসর হতে গেলে গবেষকরা কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর কানাগলিতে পথ হারাবেন ও বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে রহস্যবাদ, অধিবিদ্যার পথে মননক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করবেন। অথবা যান্ত্রিক জড়বাদীদের মতো ব্যবহারবাদকেই মনোবিজ্ঞান বলে চালাতে চাইবেন।

চলিত অর্থে বিজ্ঞানী না হয়েও এংগেলস জড়বাদের সীমাবদ্ধতা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাঁর "Dialectics of Nature"এর এক জায়গায় আছে : মানুষের চিন্তা যে মস্তিষ্কের কিছু অণুর বিশেষ ধরনের গতি বা এক ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া—এই সত্য নিশ্চয়ই পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে ; কিন্তু তা দিয়ে কি চিন্তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে ? উত্তাপ কতকগুলো অণুর স্থান পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়, এটুকু বলার চেয়ে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা মনকে শুধু আচরণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন না। ভাবনা-চিন্তা, যুক্তিবুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার জন্তই মানুষ ; মানবধর্ম পশুধর্মে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ ও পশুর মানসিকতার পার্থক্য আলোচনার আগে আমরা মানবচৈতন্ত ও মানুষের জ্ঞানবিচারভিত্তিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে ১৯১৩ সালে পাভলভ যা বলেছিলেন, পাদটীকায় সেই কথাগুলো তুলে ধরে এই অধ্যায় শেষ করছি। মানসিকতার উচ্চতম ও চরম অভিব্যক্তি চেতনা আর মানুষের প্রধান পরিচয় তার সজ্ঞান ক্রিয়াকলাপ।*

---

* I shall try, only presumeably, to answer the question : What physiological phenomena, what nervous processes occur in the cerebral hemispheres when we say that we are conscious of ourselves, when we carry on conscious activity ? From this point of view, I think consciousness is nervous activity of a definite part of the cerebral hemispheres possessing at the given moment and under the given conditions optimum (probably average) excitability. At the same moment the rest of the cerebral hemispheres are in a state of more or less diminished excitability. (Quoted by K. Platanov in *Psychology*. Progress Publishers, Moscow, 1965, p. 64.)

এর সঙ্গে প্লাটানভ নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন : The conditioned reflex method enables our mind's eye increasingly better to see in the brain which cannot be seen through a transparent 'skull'.

দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর, ভাষা ও ভাষাভিত্তিক চিন্তা

পাভলভকে মনস্তাত্ত্বিক বলা চলে কি? তোমার মতো এই প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। প্রচলিত অর্থে পাভলভকে মনস্তাত্ত্বিক বলা হয়তো চলে না। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সময়কার মনস্তত্ত্বের দিকপালদের অভিমত ও তত্ত্বকথার সঙ্গে তার যৎসামান্য পরিচয় ছিলো।* প্রথমদিকে তিনি মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতেন না, কেননা এই বিদ্যাকে তিনি বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দিতে রাজী ছিলেন না। অনেক বছর পরে অবশ্য তিনি নিজেকে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একজন গবেষক বলে স্বীকার করেছিলেন। তখন তাঁর নিজের ও সহকর্মীদের চেষ্টায় মানসিকতার বাস্তব ভিত্তি (material substratum) সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।** আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা পাভলভকে নিশ্চয়ই মনস্তাত্ত্বিক বলতে চাইবেন না, কেননা পাভলভ মনোবিজ্ঞানে ভাববাদী দার্শনিকদের অবাস্তব তত্ত্ব ও ধারণার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। অধিবিদ্যামূলক কল্পনা থেকেই অবশ্য সব বিজ্ঞানেরই সূত্রপাত। 'ফ্যাক্ট' এর, বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি যতদিন আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন মানুষ কতকগুলো মনগড়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, এ-ধরনের সিদ্ধান্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য।* জীববিদ্যায়

* I know psychological literature only through a few leading psychological texts and compared with the available material, through an inadequate number of psychological articles which I have read: Pavlov, *Conditioned Reflex and Psychiastry*, 1941, p. 141.

** Lenin answered this question when he said that it "is exactly as though a metaphysical psychologist, who all his life has been writing enquiries into the nature of the soul (without precisely knowing the explanation of a single psychical phenomenon, even the simplest), were to accuse a scientific psychologist of not having reviewed all the known theories of the soul. He, the scientific psychologist, has discarded all philosophical theories of the soul." (Lenin, *What the Friends of the People Are and How they fight the Social Democrats*, Moscow, 1951, p. 28; quoted.

* *Ibid.*

যেমন আগে প্রাণশক্তির (vital force) কল্পনা করা হতো, তেমনি মনস্তাত্ত্বিকেরা মাথা ঘামাতেন আত্মার রীতিপ্রকৃতি নিয়ে। লেনিন লিখেছেন: এই পদ্ধতি উদ্ভট ও অকেজো। মননক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা না করে মন অথবা আত্মা নিয়ে বিচারবিতর্ক নিরর্থক। অন্য একদিক থেকেও পাভলভের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়ে থাকে। তিনি নাকি শুধু কুকুরের লালা ঝরার পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মানবমনের সূক্ষ্ম, জটিল, বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। আরো বলা হয়, পাভলভ-অনুগামীরা মনের দ্বন্দ্ব সংঘাত, হর্ষবিষাদ, প্রেমঘৃণা ইত্যাদি সব কিছুর ব্যাখ্যা একটি লাইনেই দিয়ে থাকেন। বলে থাকেন—এ-আর কি? এতো একটা কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স। এই ধারণা থেকেই অনেকে পাভলভকে ব্যবহারবাদীদের সমগোত্র মনে করেন। জড়বাদ আর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক পার্থক্য ধরতে না পারার জন্য মনে করা হয়ে থাকে যে, পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের ভাবনা-চিন্তা, আচারব্যবহারকে সরল জৈবিকক্রিয়া কল্পনা করে এবং পশুমন ও মানবমনকে একই পর্যায়ভুক্ত করেন। এঁরা হয়তো জানেন না যে, পাভলভ বহুদিন ধরে মনের রোগ নিয়ে গবেষণা করার পর মানবমন ও পশুমনের গুণগত পার্থক্যের বাস্তবভিত্তির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রকল্প শুধু অনুমান-নির্ভর নয়। মানুষের মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের মূলে তার স্নায়ুতন্ত্রে নতুন ব্যবস্থার সংযোজন। বাক্‌শক্তি লাভ করার ফলেই মানুষ উন্নততর পৃথক সত্তার অধিকারী এবং এই বাক্‌শক্তি লাভের পথেই তার মস্তিষ্কে নতুন স্তর গঠিত হয়েছে। এই স্তরটির তিনি নাম দিয়েছেন—দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র। এই বিশেষ স্তরের আবিষ্কার মানবীয় চিন্তাভাবনা, চেতনা ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পথ খুলে দিয়েছে, মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছে এবং রহস্যবাদের শেষ দুর্গের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই কারণেই বোধহয়, অধিকাংশ বিদেশী লেখক পাভলভের এই আবিষ্কার সম্পর্কে নীরব। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রই আমাদের আলোচ্য।

গোড়াতে এ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। তার আগে মানুষের অন্তরজগৎ সম্পর্কে পাভলভের বক্তব্য তাঁর নিজের কথাতেই শুনিয়ে দিচ্ছি।*

* "I should like to obviate the misunderstanding in regard to me. I am not denying psychology as cognition of man's inner world. The less am I inclined to deny any of the deepest impulses of the human spirit. Here and now I am merely depending and asserting the absolute and incontestable rights of natural-science thought to manifest its power wherever and as long as it can. And who knows

তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করতে চান। একথা সত্যি নয় যে তিনি মানুষের অন্তরজগতের অস্তিত্বে বা মানবমনের গভীরতম সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগ সম্পর্কে অনবহিত। এ-সম্পর্কে প্রকৃতিবিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষামূলক গবেষণা করার অধিকার তিনি দাবি করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল (১৯০৯ সালে) উচ্চস্তরের মানসিকতার অধঃস্তরের ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কারের ক্ষমতা প্রকৃতিবিজ্ঞানের আছে। তাঁর এই ধারণা পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কখনও বলেননি যে মানবীয় চিন্তাভাবনা, চেতনা, কেবলমাত্র স্নায়ুপ্রক্রিয়া। তিনি বলেছিলেন যে, এইসব মানবিকবৃত্তির কার্যপ্রণালী (mechanism) বুঝতে হলে স্নায়ুপ্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বুঝতে হবে। তাঁর পূর্বসূরিরা অন্তরজগতের, মানুষের সাবজেক্টিভ জীবন-ব্যাখ্যায়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকার প্রয়োজনবোধ করেননি, নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে তাঁরা অন্যের মনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে, এই অন্তর্দর্শনপদ্ধতিতে কোনো ব্যবহারিক সূত্র আবিষ্কার সম্ভব নয়, বিজ্ঞান-অনুমোদিত পদ্ধতিও পাওয়া যেতে পারে না : এই ছিল পাভলভের দৃঢ় অভিমত। আমাদের বিষয়ীগত ধ্যানধারণা, ব্যথাবেদনাকে অস্বীকার চলে না। এইসব মানসিক অবস্থা ব্যক্তির কাছে নিঃসন্দেহে বাস্তব, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত। প্রেমভালোবাসা, হিংসাদ্বেষ, আনন্দ উল্লাস অনুভব করা এক জিনিষ আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে এইসব মানসিক অবস্থায় কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করা আর এক জিনিষ।

অধিবিদ্যামূলক মনস্তত্ত্ব মানসিক ক্রিয়াকলাপকে বুঝতে মস্তিষ্কের ওপর বহির্জগতের প্রতিফলনের ফলে যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটছে তার খবর রাখা দরকার মনে করে না। স্থানকাল এখানে গৌণ। অধিবিদ্যা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয় যে, মন বা আত্মা মুক্ত, মস্তিষ্কনিরপেক্ষ, স্বয়ংভূত এক প্রাণশক্তি অথবা মানবদেহে পরমাত্মা বা পরাশক্তির লীলাময় ক্ষণ-অবস্থিতি। পাভলভ পক্ষান্তরে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, মানসিকতা কার্যকরণ-সম্পৃক্ত, স্থানকাল-নির্ভর এবং বস্তুর জটিলতম বিন্যাস মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভরশীল।*

where it no longer can"—এ কথাগুলো পাভলভ বলেছিলেন ১৯০৯ সালে Naturalist and Physiciansদের কংগ্রেসে।

* It was Pavlov's historical task to demonstrate experimentally, once and for all, that the human soul is caused, that mental life is a function of highly organised matter in the form of the brain. This was a revolutionary task, in every sense of the word, scientific, ideological, political and social--Wells, Ivan P. Pavlov, p. 68.

সব দিক থেকেই পাভলভের প্রচেষ্টা বিপ্লবী। শর্তাধীন পরাবর্ত আবিষ্কারের পর পাভলভ এক বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করেছিলেন যে বিজ্ঞানের দৌলতে শীগগিরই আমাদের অন্তরলোকের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বাস্তব (objective) প্রতিক্রিয়া জানা যাবে এবং তার ফলে মানবপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। আত্মার যন্ত্রণা, বিবেকের দংশন এবং ঐরকমের একান্তভাবে অন্তরজগতের অনেক কিছুর গঠন ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা জানা যাবে।* এই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আজীবন পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন পাভলভ। কিন্তু তিনি সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানসেবী, তাই কুকুর ও শিম্পাঞ্জীর উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের তথ্য দিয়ে অনুমানভিত্তিক মনস্তত্ত্বের প্রকল্প গড়ে তুলতে চাননি। এইসব পরীক্ষা তাঁকে নতুন নতুন পরীক্ষা চালাতে উৎসাহ জুগিয়েছিল, কিন্তু কোনো মনগড়া সিদ্ধান্তে পৌছুতে প্ররোচিত করেনি।

শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি মনোরোগ ও মানবমন নিয়ে গবেষণা করেছেন। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী নিয়ে অনেকদিন কাজ করার পর তিনি দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। জানো বোধহয়, এই হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসাসূত্রেই ফ্রয়েড প্রথম নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব অনুমান করেন। সে কথা এখন থাক। পাভলভ ঘোষণা করলেন— বিবর্তনের ফলে মানবমস্তিষ্কে একটি নতুন ব্যবস্থার সংযোজন ঘটেছে।** তার ফলে পশু ও মানবমস্তিষ্কের মধ্যে ঘটেছে দুস্তর সাংগঠনিক ও কার্মিক (structural and functional) পার্থক্য। বেঁচে থাকা ও বংশরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে প্রাণী সেই উদ্দীপকের সংকেতে সাড়া দিতে অভ্যস্ত। পঞ্চেন্দ্রিয়ভিত্তিক এই সাড়া দেবার ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় প্রথম সাংকেতিক তন্ত্র (first signalling system) মানুষের তো আছেই, তাছাড়া সে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সংকেতের নতুন সংকেত,—অর্থবাহী শব্দের সঙ্গেও সাময়িক পরাবর্ত তৈরি করে নিজেকে মানিয়ে নেবার বিশিষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেছে। এর ফলে তার অভিযোজন ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়েছে। কি করে বাড়লো? ভাষার কাজ কি? ভাবের আদানপ্রদান। পশুদেরও, এমনকি কীটপতঙ্গেরও পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময়ের কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে ক্ষমতা খুবই সীমিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে ক্ষমতা জন্মলব্ধ, অনঢ়, সহজাত। ভাষা বিশিষ্ট বস্তু ও ঘটনার সামান্যীকৃত ও বিমূর্ত রূপ বা

---

* Pavlov, *Lectures on Conditioned Reflexes*, p. 59.

** This supplement is speech function the last new principle in the activity of the cerebral hemisphere' —*Ibid.*, p. 93.

প্রতীক। মূর্ত ও বাস্তবের 'generalization and abstraction'। তোমার বসার আরামকেদারাটা এক বিশেষ ধরনের চেয়ার—আর্মচেয়ার। তোমার আদরের কুকুরছানাটি এই আরামকেদারাটি ভালভাবেই চেনে। এইটিকে ভিত্তি করে তার বেশকিছু অভ্যাস বা শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে উঠেছে। রোজ বিকেলে ঐ কেদারায় বসে চা-পানের সময় তুমি কিংবা তোমার বোন ওকে বিস্কুট খাওয়াও। তুমি বোনকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেলে, কয়েকদিন বিকেলে তোমার 'পপি' ঐ কেদারাটির কাছে এসে তোমাকে খুঁজবে, তার লালা ঝরবে, কুঁ-কুঁ শব্দ করে কেদারাটিকে শুঁকবে, বারবার দেখবে। তারপর কিছুদিন পরে তার কেদারাভিত্তিক পরাবর্ত নিজস্ব নিয়মে ভেঙে যাবে। ঐ কেদারাটি ঘরের অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখলেও সে সেই জায়গায় গিয়ে ঐরকমটি করবে, তার কেদারাভিত্তিক পরাবর্তক্রিয়ার প্রভাবে। ঠিক ঐরকম দেখতে অন্য একটি আরামকেদারা ঘরে রাখলেও তার আচরণ প্রায় একই থাকবে। কিন্তু অন্যধরনের কোনো চেয়ার ঐ জায়গায় রাখলে ঐ আরামকেদারাভিত্তিক পরাবর্তটির প্রকাশ দেখতে পাবে না। শুধু কুকুর নয়, মানুষ ছাড়া সব প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই রকম ঘটবে। তাদের পরাবর্ত গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট বস্তু ও ঘটনাকে ভিত্তি করে। মানুষের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে আলাদা। 'চেয়ার' শব্দটি আরামচেয়ার, অফিসচেয়ার, হাতলবিহীন চেয়ার ইত্যাদি সব রকমের চেয়ারের সামান্য ও বিমূর্ত রূপ। চেয়ার বলতে সে কোনো বিশিষ্ট চেয়ার বোঝে না। 'চেয়ার' কথাটির সঙ্গে কোনো পরাবর্ত গড়ে উঠলে, সেটা পৃথিবীর সব চেয়ারের সঙ্গেই সক্রিয় থাকবে। এর ফলে স্বভাবতই তার অভিযোজন ক্ষমতা বাড়বে। ফুল, ফল, কাপড়,—এইসব শব্দ যথাক্রমে হাজার রকমের ফুল ফল কাপড় জাতীয় বস্তুর প্রতীক।

দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর সম্পর্কে পাভলভ এক কংগ্রেসে বলেছিলেন: বাইরের জগতের ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন যদি আমাদের বাস্তবের প্রাথমিক সংকেত, মূর্ত নির্দিষ্ট সংকেত হয়—তাহলে ভাষা, প্রধানত মস্তিষ্কবল্কলে প্রাপ্ত বাক্-যন্ত্রাদির চেষ্টাবেদন (kinaesthetic—পেশী, সন্ধি প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত গ্রাহক স্নায়ু প্রান্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবেদন: এই জাতীয় সংবেদনের সাহায্যেই বিভিন্ন অঞ্চলের সঞ্চালন সংক্রান্ত অবগতি লাভ করা সম্ভব হয়। —লেখক) সংবেদনকে দ্বিতীয় স্তরের সংকেত বলা চলে। এগুলো সংকেতের সংকেত। এই বিশেষ সংকেতের সাহায্যে বাস্তবের বিমূর্তকরণ ও সামান্যীকরণ সম্ভব। মানবমনের বিশিষ্ট অবদান এই নতুন সংকেত, ভাষা। ভাষার দৌলতে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি, অন্যের অভিজ্ঞতা জানতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতা উত্তরপুরুষদের জন্য লিপিবদ্ধ করতে পারি। অভিজ্ঞতার দরুণ বাড়তে থাকে পরিবেশের সঙ্গে

উচ্চস্তরের অভিযোজনের সম্ভাবনা।* পাভলভের মতে এই দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরই আমাদের অন্তরজগতের স্নায়ুতন্ত্র। ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করি, আবার নিজের সঙ্গে অনুচ্চারিত কথার, ভাষাভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে সংযোগ রক্ষা করি। এই বাক্‌তন্ত্র না থাকলে মানবিক কোনো ধর্মের—মননক্রিয়া, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, ইত্যাদির উন্মেষ সম্ভব হতো না। দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের সাহায্যেই সৃষ্ট হয়েছে শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন। ভাষাই মানুষকে পরিবেশের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাষা মানুষকে নিজের প্রয়োজনমত পরিকল্পনানুযায়ী পরিবেশকে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করেছে। ভাষার প্রসাদেই মানুষ বিবর্তনের শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

এই দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের প্রকল্প গ্রহণের ফলে মনোবিদ্যার জগতে এক অভিনব সম্ভাবনা দেখা দিলো। মানুষের অন্তরজগতের অনুভূতি, প্রক্ষোভ, প্রত্যক্ষণ, অভিলাষ ইত্যাদির অভিক্ষেপণের শারীরবৃত্তিক ক্যানভাস খুঁজে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানসম্পর্ক-রহিত অন্তর্দর্শন পদ্ধতিতে উচ্চতর মননক্রিয়া উপলব্ধির আর কোনো অজুহাত রইলো না। পাভলভ মনে করলেন, মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যার মিলনের সেতু এতদিনে খুঁজে পাওয়া গেছে। এই মিলনের ফলে দেহ-মন সম্পর্ক নিয়ে এতদিনকার দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটতে চলেছে। সাবজেকটিভ অবজেকটিভের স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধিতা আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে না।

মানুষের ভাবনা চিন্তা, সুন্দরকে ভালবাসা, অসুন্দরকে ঘৃণা করা, সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়নের ইচ্ছা ও অন্যান্য উচ্চস্তরের মানসিকতা দ্বিতীয় সাংকেতিক-তন্ত্রজাত,—মানুষের অভিযোজন প্রয়াসের ফলে বিবর্তিত মানবিক ধর্ম। আকাশ থেকে বা অপার্থিব কোনো শক্তির কাছ থেকে পাওয়া নয়। মানবিক গুণের

* If our sensations relating to the surrounding world are for us the primary signals of reality, the concrete signals,—then the speech, chiefly the kinaesthetic stimulations flowing into the cortex from the speech organs, are the secondary signals, the signals of signals. They represent in themselves abstractions of reality and permit of generalizations, which indeed make up our added special human mentality, creating first a general human empiricism, finally science—the weapons of the higher orientation of the humans in the surrounding milieu and in himself. Pavlov : Conditioned Reflexes and Psychiatry 1941, p 95

বিকাশ সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব ঘটনা। অন্য গ্রহ থেকে আসা দেবতাদের প্রজননিক কৃৎকৌশল বা এখানকার পশুমানবীদের সঙ্গে দেবতাদের সহবাসের ফলে পৃথিবীতে মানবপ্রজাতির জন্ম হয়েছে—এই অতিকথায় তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করো না। ঈশ্বর নিজের ছাপে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বাইবেলের এই উক্তি দিয়ে আজকের মানুষকে ভোলানো যায় না ; তাই নানা ধরনের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মানুষের মন পশুমন থেকে অনেকখানি উন্নত ও গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তু পশুমন মানবমনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়া ও কুকুর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে—যারা বহুপুরুষ ধরে মানুষের সংস্পর্শে এসেছে,—অনেকসময় আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমত্তার, স্নেহভালবাসার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের প্রভাবে এই সব গৃহপালিত পশুর মানসিক শক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটে। ঘোড়া ও কুকুর নিজেরা কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু কিছু কিছু কথা বুঝতে পারে, অনেকক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক ধর্মের অধিকারী হয়ে উঠে। তোতা পাখীকে গালাগালির অর্থ শেখালে ঠিক সময়মত সে গালিগালাজ দিয়ে থাকে। এঙ্গেলসের এই ধারণার সপক্ষে সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানী প্লাতানভ* প্রাভদায় প্রকাশিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েত-মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে দুজন সীমান্তরক্ষী ও একটি কুকুর সমেত একটি নৌকো নদীতে উল্টে যায়। কুকুরটি সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠে, কিন্তু রক্ষী দুজন তাদের ভারী কোট, বুট, হেলমেট ও রাইফেলের ভারে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। একজন রক্ষী সাহায্যের জন্যে তার কুকুরটিকে ডাকে। কুকুরটি ডুব দিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরে প্রভুকে জলের ওপরে তোলে ও সাঁতরে তাকে তীরে নিয়ে যায়। তারপর আবার ডুব দিয়ে দ্বিতীয়টিকেও ঐভাবে বাঁচায়। অনায়াসেই ভাবা যায় যে, প্রভুর মুখ থেকে উচ্চারিত মানুষের ভাষা কুকুরটি বুঝতে পেরেছিল। এই ধরনের প্রভুভক্তির কথা, প্রভুর জন্য প্রাণ দেবার ঘটনা, সকলেরই দু'একটা জানা আছে। এরপর কুকুরটির আনন্দ প্রকাশ সম্পর্কে একজন রক্ষীর বিবরণ আরো কৌতূহলোদ্দীপক।**

---

* Platanov K. : Psychology As You May Like It, Moscow, 1965, p 81

** But if you could have seen the dog jump between the two of us, licking our hands and faces and manifesting his joy at our safety, you would not have reproached us for the tears we had shed that night on the bank of the river. (Ibid)

শিম্পাঞ্জীদের আচরণ অনেকক্ষেত্রে মানুষের মত, একথা বোধ হয় তোমার অজানা নয়। মানুষের সংস্পর্শে এলে তারা মানুষের অনেক ব্যবহার অবিকল অনুকরণ করতে শেখে। সার্কাসে দেখে থাকবে—শিম্পাঞ্জী সাহেবী পোষাক পরে কাঁটা চামচ দিয়ে খানা খাচ্ছে, পাথরের টুকরো দিয়ে বাদাম ভাঙছে। এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে, মাঝে মাঝে এরা জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারে। পাভলভের কলটুশী ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষাধীন শিম্পাঞ্জী-দম্পতি দাঁত পরিষ্কার করতো, কম্বলের ভাঁজ খুলে গায়ে দিতো, নিজেরাই কাপড়জামা পরতো। এদের মধ্যেকার পুরুষটি ভেলা চালিয়ে পুকুর পার হতো, এক ভেলা থেকে অন্য ভেলায় যেতে হলে একখণ্ড কাঠ দিয়ে দুটো ভেলার মধ্যে পোল তৈরী করে নিতো। আগুনের সহজাত ভয় কাটিয়ে খাবারের চুপড়ির সামনের আগুন জল দিয়ে নেভাতে শিখেছিলো। মনে রাখা দরকার যে, এ-সব ক্ষমতা তাদের মগজে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। হয় ঠেকে শিখেছিলো, কিংবা তাদের শেখানো হয়েছিলো। শেখানোর পদ্ধতি সেই একই। খাবারের মত কোনো শর্তহীন উদ্দীপককে ভিত্তি করে নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলা।

পশুমন নিয়ে এত কথা বলছি কেন? কারণ, অনেকে এখনও স্বীকার করতে চান না যে পশুমনই বিবর্তনের ফলে, অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে, মস্তিষ্কের নতুন সংযোজন দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের দৌলতে মানবমনে রূপান্তরিত হয়েছে। এঙ্গেলসের কথায় বলা চলে যে, এই পূর্বইতিহাস না জানলে, মানবমন রহস্যময় বলেই মনে হবে।*

এঙ্গেলসের বিখ্যাত বই Dialectics of Nature-এর একটি অধ্যায়ে, বনমানুষ কি করে শ্রমের ফলে মানুষ হলো—তাই নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে এঙ্গেলস মানবমনের বিবর্তন নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিলেন এবং লিখেছিলেন। তার থেকে কিছু কিছু আমি তোমাকে শোনাচ্ছি:

কয়েকলক্ষ বছর আগে একসময় একদল নরবানর (anthropoid apes) প্রয়োজনের তাগিদে গাছ ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিলো। চলাফেরার ব্যাপারে সামনের দুটো প্রত্যঙ্গের আর দরকার রইলো না। অনেক পুরুষ ধরে চেষ্টা করে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো, হাত দুটো দেহের ভার বহনের কাজ থেকে অব্যাহতি পেলো। নরবানর থেকে মানুষ হবার পথে এটাই হচ্ছে

---

* They differ only in degrees of development of the method in each case. Without this pre-history the existence of the thinking human brain remains a miracle.—Engels

প্রথম পদক্ষেপ। হাজার হাজার বছর ধরে এই হাত শ্রমের ফলে বিবর্তিত হতে লাগলো। কাজের উপযোগী এই হাত দিয়ে প্রথমে খুব সোজা সোজা কাজ করতে সুরু করলো অতীতের সেই নর-বানরগোষ্ঠী। শ্রমের ফলে গঠিত হয়ে হাত ক্রমশ শ্রমে নিযুক্ত হলো। হাতের বিবর্তনে গোটা দেহটাও বদলাতে লাগলো। হাত যত নানারকমের কাজের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগলো, (প্রথমে বড় পাথর ছুঁড়ে হরিণ শিকার করা, তারপর পাথর ঘষে ধারালো করা, আরো পরে সেই ধারালো অস্ত্রে হাতল লাগিয়ে তাকে আরো উপযোগী করা) আঙ্গুলগুলো যত সূক্ষ্মকাজের ভার নিতে লাগলো, হাত পায়ের আঙ্গুলে, শিরদাঁড়াতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। এরপর দলবেঁধে শিকার ও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে পরস্পরের মধ্যে আগেকার চেয়ে বেশি পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদান দরকার হলো। তারই ফলে প্রথমে কিছু অর্থবহ শব্দ, পরে ভাষার সৃষ্টি হলো। ভাষার উন্মেষ দেহের কতকগুলো বিশেষ পরিবর্তন ঘটালো বা এইসব পরিবর্তনের ফলেই ভাষার উন্মেষ ঘটলো। প্রথমে শ্রম, তারপর ভাষা—এই দুই বিশেষ জরুরী উদ্দীপকের প্রভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বনমানুষের মস্তিষ্ক ক্রমশ মানবমস্তিষ্কে রূপান্তরিত হতে লাগলো। মস্তিষ্কের ক্রমপরিবর্তনের ফলে শ্রম এবং ভাষাও ক্রমোন্নত হতে থাকলো। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তির ক্রমবৃদ্ধির ফলে যূথবদ্ধ মানুষ প্রকৃতিকে, বন্য-পরিবেশকে বশ্যতা মানিয়ে প্রজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করলো। পশু শুধু পরিবেশকে ব্যবহার করে, পরিবর্তিত করে না; মানুষ পরিবেশকে নিজের চাহিদামত পরিবর্তিত করে, পরিবেশকে কাজে লাগায়, তার ওপর প্রভুত্ব করে।

এঙ্গেলস কিন্তু স্বীকার করলেন যে, একান্তভাবে মানবিক ধর্ম কথাবলার, অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের উপযোগী আন্তরযন্ত্র ও মস্তিষ্কের সাংগঠনিক ও কার্মিক (structural & functional) পরিবর্তনের, বিশেষ করে স্নায়ুসংস্থার নতুন সংযোজন লাভের ব্যাপারটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য।* বস্তুবাদীদের ধারণায় এখানে একটা বড় ফাঁক ছিলো। পাভলভের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের প্রকল্প এই ফাঁক পূরণ করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। শ্রবণ, দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণী অঞ্চলে বাইরের উদ্দীপনা সরাসরি পৌঁছে পশুদের কাছে বাস্তবের সংকেত জানায়। এই ভাবে পরিবেশের ধারণা আমরাও লাভ করে থাকি। কিন্তু অর্থবাহী বাক্য বা শব্দ শুনে ও পড়ে আমরা পশুদের অলভ্য

---

* ...this action has as yet been much too little investigated for us to do more than to state the fact in general terms. (Ibid)

বিশেষ সংকেত পাই। প্রাথমিক পর্যায়ের সংকেত এই সব শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে নতুন পর্যায়ের সংকেতে পরিণত হয়েছে। মূর্ত বস্তুর সংকেত হিসেবে এই সব বিমূর্ত শব্দ বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বহন করে মানুষের জন্য এক নতুন জগৎ—বাঙময় জগৎ সৃষ্টি করেছে। আগেই বলেছি, অর্থব্যঞ্জক শব্দ—ভাষা বিমূর্ত ও অতিমাত্রায় নমনীয় হবার দরুণ, সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় অভিযোজনের সহায়ক ও উপযোগী।

ভাষাভিত্তিক পরাবর্তের আর একটি বিশেষ উপযোগিতার কথা এবার বলছি। ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তু বা ঘটনার সংবেদনের প্রতিবিম্ব শব্দ, অন্যান্য অনেক শব্দের সঙ্গে জড়িত, অনুষঙ্গিত। ইন্দ্রিয়বাহী উদ্দীপক তাৎক্ষণিক পরাবর্ত গঠিত করে, পশু অবিলম্বে সংকেতে সাড়া দিতে চায়, পরাবর্তক্রিয়া অচিরেই অনুষ্ঠিত হয়। ভাষাভিত্তিক উদ্দীপনার বেলায় কিন্তু সেরকমটি ঘটে না। অর্থবাহী শব্দ-উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেই প্রতিক্রিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক শব্দ, অনেক বস্তু ও ঘটনার প্রতিবিম্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শব্দগ্রাহী মানুষটি নিজের সঙ্গে, নিজের পুরনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করে, অথবা অপরের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতার অংশগ্রহণ করার পর সংকেতে সাড়া দেবার চেষ্টা করে। ভাষাভিত্তিক শর্তাধীন উদ্দীপক পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তিকে পৃথক করে তাকে চিন্তাভাবনার বা অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের সময় দিয়ে থাকে। বাকৃঅনুষঙ্গের ফলে, অতীতের অভিজ্ঞতার বিচারে, ভবিষ্যতের ফলাফল ভেবে নিয়ে মানুষ কাজে প্রবৃত্ত হয়। শুধু নিজের অভিজ্ঞতা নয়, ভাষার প্রসাদে সমসাময়িক মানুষের ও পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে অভিযোজনের ব্যাপারে মানুষ অনেক বেশি তৎপরতা ও দক্ষতা লাভ করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আরো বেশি বোধগম্য হবে।*

হরিণের দল চলছে বনপথ দিয়ে। দক্ষিণের বাতাসে বাঘের গন্ধ তার নাকে এল। এই গন্ধের সঙ্গে তাদের পালিয়ে যাবার পরাবর্তক্রিয়া গড়ে উঠেছে। তারা তখুনি দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ছুটলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে বেশ কয়েকটা হয়তো ঐ দক্ষিণ দিকে ছুটে গিয়ে সহজেই ব্যাঘ্র মহাশয়ের শিকার হলো। মানুষ হলে কি করবে? তারা প্রথমে দেখবে কোন দিক থেকে বাতাস গন্ধ বয়ে আনছে। এরপর পরস্পরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করবে কোন জাতের বাঘ, তারা একসঙ্গে যদি চীৎকার করে বাঘটা ভয় পাবে কি না, আগুন

---

* Wells: Ivan P. Pavlov, International Publishers, New York, pp 76-77.

জ্বালিয়ে বাঘটাকে ভয় দেখানো চলে কি না। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে 'স্থানত্যাগেন' নীতি গ্রহণ করবে, না বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করবে। পালাতে হলে যেদিক থেকে গন্ধ আসছে, তার বিপরীত দিকেই তারা ছুটবে।*

দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা, আশা করি, হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছো। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণাকে পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ এই প্রকল্প সমৃদ্ধ করেছে। পাভলভ কিন্তু মার্কসবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রাজনীতি বা দর্শন নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না। 'মিঃ ফ্যাক্ট' বা পরীক্ষালব্ধ বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করে মননক্রিয়ার স্বরূপ জানার চেষ্টার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা কার্যকলাপ। কাজেই এঙ্গেলসের 'শ্রম'-এর তাৎপর্য জানার আগ্রহ তিনি দেখাননি। এঙ্গেলসের লেখার সঙ্গে যাঁরা অল্পবিস্তর পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, বনমানুষের মস্তিষ্কে বা স্বরযন্ত্রে কেন কথাবলার উপযোগী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। কারণ তারা হাতিয়ার তৈরী বা ব্যবহার করতে শেখেনি। এই হাতিয়ার তৈরী ও ব্যবহারে শ্রমশক্তি কিভাবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে—এঙ্গেলসের লেখাতে তার বিবরণ পাবে। বনমানুষের যে দলটি প্রাকৃতিক পরিবেশের আনুকূল্যে হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখে এবং যাদের মধ্যে কথাবলার দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র বিবর্তিত হয়ে ওঠে, তাদের বংশধরদের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় কোনো এক সময়ে লোপ পায়। পিথেক্যানথ্রোপাস (Pithecanthropus), এ্যানথ্রোপপিথেকাস (Anthropopithecus)-এর ফসিল পরীক্ষা করে বর্তমানে জানা গেছে যে, বিদ্যমান বনমানুষদের চেয়ে এরা বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা বেশি এগিয়েছিলো। 'ক্রো-ম্যাগনন'-রা নাকি আরো খানিকটা উন্নত। হিমালয়ের তুষার-মানবের এখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি। হয়তো ভারত মহাসাগরে অথবা ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত রয়েছে সেই ভূখণ্ড, যেখানে কয়েকটি অস্ফুট অর্থব্যঞ্জক শব্দের সাহায্যে ভাব আদান-প্রদানে সক্ষম আমাদের পূর্বপুরুষরা আদিম হাতিয়ার হাতে ঘুরে বেড়াতো। পরিবৃত্তিকালীন সেই ইতিহাস হয়তো কোনোদিন সঠিকভাবে জানা যাবে না, কিন্তু অন্যান্য নানাধরনের সূত্র প্রমাণ থেকে ডারুইনের তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে এবং চিরকালই বিজ্ঞানীদের সমর্থন পাবে। প্রথমে এঙ্গেলস ও পরে পাভলভ, এই তত্ত্বের সমর্থনে আরো তথ্য ও যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ করে মানবসমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন।

---

* Finally, after self communication by means of verbal associations, and perhaps, consultation with companions, also by means of words, a course of action is settled upon, and undertaken. (Ibid)

পাভলভের মস্তিষ্কবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে বলেই পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকেই অনীহ। মানবচৈতন্য বস্তুনিরপেক্ষ নয়—এই বস্তুবাদী ধারণা পাভলভের গবেষণার দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে। অজৈব পদার্থ থেকে জৈবপদার্থ, জৈবপদার্থ থেকে কোষহীন বা এককোষী প্রাণী, এককোষী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রে, ক্রমবিবর্তনের লক্ষ লক্ষ সিঁড়ি বেয়ে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে জটিলতম স্নায়ুসংস্থা-বিশিষ্ট মানুষ। তার মস্তিষ্কবল্কলে সংযোজিত হয়েছে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সাংকেতিকতন্ত্রের সঙ্গে বাক্‌ভিত্তিক দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্র। ভাষা তাকে দিয়েছে উচ্চস্তরের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি আর সংকেতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনমত সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা; এই দুই ধরনের সাংকেতিক তন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কে পরিবেশ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বাক্‌শক্তির মূর্তকে বিমূর্ত, বিশেষকে সামান্য করার ক্ষমতা প্রতিপদে আবার ইন্দ্রিয়ভিত্তিক প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। তার ফলে, বাস্তবের প্রতিফলনে ক্রমশ বেশি বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে। চৈতন্য সত্তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

সংবেদন বাস্তবের সঠিক প্রতিরূপ—এই হচ্ছে বস্তুবাদের গোড়ার কথা। বাইরের বস্তু মস্তিষ্ককোষকে উদ্দীপ্ত করার ফলে সংবেদনের সৃষ্টি। সংবেদন মনের সঙ্গে বহির্জগতের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়—বলেছিলেন লেনিন। বাইরের উত্তেজনা কি ভাবে মস্তিষ্ক-বাহিত হয়ে সংবেদন প্রত্যক্ষণ থেকে চেতনার সঞ্চার করে, তার স্নায়ুতন্ত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা দিলেন পাভলভ। গড়ে উঠলো বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞান।

বহুবছর ধরে কুকুর শিম্পাঞ্জী ও মানুষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো তথ্য সংগ্রহ করার পর উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে পাভলভ ১৯৩২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর কাছে তাঁর সামগ্রিক ধারণার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। তাঁর ভাষণের অংবিশেষের ভাবানুবাদ উদ্ধৃত করছি:

উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সামগ্রিক অখণ্ডতাকে আমি এইভাবে প্রকাশ করতে চাই। মানুষ সমেত সমস্ত উচ্চপ্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে জটিল সম্পর্করক্ষার কাজে প্রথম উল্লেখ্য শর্তহীন পরাবর্তসহ নিম্নমস্তিষ্ক। এই জন্মসূত্রে পাওয়া পরাবর্ত বাইরের গুটিকয়েক মাত্র শর্তহীন উদ্দীপকের ডাকে সাড়া দিতে পারে। কাজেই পারিপার্শ্বিককে জানার এবং তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এই ব্যবস্থায় খুবই সীমিত।

সম্পর্করক্ষার দ্বিতীয় ধাপে ফ্রন্টাল লোব বাদে উচ্চমস্তিষ্কের অন্যান্য অঞ্চল অংশগ্রহণ করে। এখানে শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে নতুন সম্পর্ক নতুন অনুষঙ্গ গড়ে ওঠার ফলে নতুন ধরনের ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত হচ্ছে। কয়েকটি মাত্র

শর্তহীন উদ্দীপকের সংকেত এখন অনেক বেশি উদ্দীপক গঠন করতে পারে, পারিপার্শ্বিক সব কিছুর সব সময় বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ সম্ভব, বাইরের জগৎকে বেশি করে জানা যাচ্ছে; অভিযোজন ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুয়ে মিলে প্রাণীদের, এক সংযুক্ত সাংকেতিকতন্ত্র গড়ে উঠেছে। মানুষের আবার, সম্ভবত ফ্রন্টাল লোবে,—প্রাণীর এ অংশ বিশেষ বড় নয়,—আর একটি সাংকেতিকতন্ত্র, বাক্‌তন্ত্র গড়ে উঠেছে। এই তন্ত্র প্রথম তন্ত্রটির সংকেতবহ। এই সাংকেতিক তন্ত্রের মৌল উৎস বাক্‌যন্ত্রের উত্তেজনা।

এইভাবে উচ্চ স্নায়ুপ্রক্রিয়ার এক নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। আগেকার তন্ত্রের অজস্র পরাবর্তের এখন বিমূর্তায়ণ ও সামান্যীকরণ সম্ভব হয়েছে, তাছাড়া এখন সামান্যীকৃত সংকেতের বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ করা চলে। এই তন্ত্রের সাহায্যে মানবপ্রজাতি পারিপার্শ্বিককে বিশদভাবে জানতে পারে, সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারে এবং এর ফলে অভিযোজন ক্ষমতা শীর্ষ সীমায় পৌঁছেছে।*

দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র মানুষকে যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে, তার নাম বাক্‌ভিত্তিক চিন্তা ও জ্ঞান।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংবেদন

পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ (sensation, perception) ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুবাদীদের অনুমান সমর্থিত হয়েছে। লেনিন অনেকদিন আগেই বলেছিলেন, ইন্দ্রিয়মাধ্যম সংবেদন ছাড়া কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মাতে পারে না। বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী অঞ্চলের (বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বা বিশ্লেষণী অঞ্চল আছে—তুমি জানো।) উত্তেজনার ফলে সংবেদনের জন্ম। তোমার চারপাশে হাজারো রকমের জিনিষ আছে, রকমারি ঘটনা ঘটছে। বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে যখন তাকিয়ে আছো, চোখের সামনে দিয়ে ট্রাম, বাস, প্রাইভেট-গাড়ী, লরি ছুটছে, মানুষ হাঁটছে, গাড়ীর শব্দ, মানুষের গুঞ্জন কানে আসছে; শীতের রোদ এসে তোমার মুখে পড়েছে। একটা ছোট ছেলে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে মাঝখানে পড়ে গেল, চলন্ত গাড়ী বিশ্রী শব্দ করে ব্রেক কষলো, মানুষজন হৈচৈ করে উঠলো। তুমি অনেক কিছু দেখলে ও শুনলে। মবিলের কটু গন্ধ তোমার নাকে ঢুকলো। এই সব বস্তু, ঐ ছেলেটির পড়ে যাওয়ার ঘটনা, গাড়ীর ব্রেক কষার শব্দ, মবিলের গন্ধ, রোদের তাপ—তোমার দর্শন, শ্রবণ

* Pavlov : Conditioned Reflexes & Psychiatry, pp 113-14.

ঘ্রাণ ও স্পর্শ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে, তোমার মস্তিষ্কে ঐসব বস্তুর ও ঘটনার সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ তৈরী করেছে। কিন্তু চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী শক্তির একটা সীমা আছে এবং অনেক শর্তের ওপর গ্রাহীশক্তি নির্ভর করে। সেই শক্তির এলাকার মধ্যে ঘটনা ঘটলে, শর্তগুলো বজায় থাকলে, তবেই সংবেদন জাগবে। দেওয়ালের ওপাশে, পাঁচ ফুট দূরে যে-সব জিনিষ রয়েছে, সেগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ না। অথচ রাত্রে আকাশে তাকিয়ে যে-সব তারা দেখতে পাও, তাদের দূরত্ব অনেক অনেক গুণ বেশি। তোমার দৃষ্টি-পথে বাধা না থাকলে অনেক দূরের জিনিষ দেখতে পাবে। কিন্তু অন্ধকারে হাতের কাছের জিনিষও দেখতে পাবে না। ঐ বস্তু থেকে আলোর তরঙ্গ এসে তোমার চোখের নার্ভগুলোকে উত্তেজিত করবে, সেই উত্তেজনার ঢেউ মস্তিষ্কবল্কলের পেছনের বিশ্লেষণী অংশে (অক্‌সিপিটাল লোব) পৌছুবে, তবে দেখতে পাবে। এগুলো হল সংবেদন তৈরীর শর্ত। আলোর তরঙ্গ যেমন দর্শন-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহক-প্রান্তকে (receptors) উত্তেজিত করে, শব্দের তরঙ্গ তেমনি শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের প্রান্তকে। গন্ধের বেলায় তার রাসায়নিক কণা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই সব থেকে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তুমি প্রায় পাঁচ লক্ষ রকমের রঙের পার্থক্য ধরতে পারো, বাতাসে ধুলো ময়লা না থাকলে ২৭ কিলোমিটার দূরের মোমবাতির আলো দেখতে পারো। মাত্র ০'০০০৩ সেকেণ্ড স্থায়ী বিজলীচমক তোমার চোখে ধরা পড়বে। তবে ধুলোবালি ও জলীয় বাষ্প দৃষ্টিপথকে অস্পষ্ট করে দৃষ্টিকে ঝাপসা করবে। এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও হেলমহোলৎজ কিন্তু বলতেন যে ভগবান তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে চোখ তৈরী করলে, যন্ত্রটি সত্যিকারের উঁচুদরের হতো।* আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এমন অনেক আলোক তরঙ্গ আছে। 'ভিবজিও'র (vibgyor) এর দুধারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ তরঙ্গ চোখে ধরা পড়ে না, তুমি জানো। শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ মাপের তরঙ্গই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করতে পারে। এক মিলিমিটারের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগকে বলা হয় মাইক্রোমিলি-মিটার ($\mu\mu$)। ৭৬০ থেকে ৩৯০ $\mu\mu$ পর্যন্ত মাপের তরঙ্গ আমাদের রঙের অনুভূতি জাগায়। ৭৬০ $\mu\mu$-র বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বর্ণ-অনুভূতি না জাগিয়ে তাপের অনুভূতি জাগায়। এদের বলে লোহিতাতীত বা ইনফ্রা রেড তরঙ্গ। আর ৩৯০ $\mu\mu$-র কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দর্শন-অনুভূতি না জাগিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়। এদের নাম বেগুনীপারের বা আলট্রাভায়োলেট তরঙ্গ। আর, এও নিশ্চয়ই জানো যে, আগেকার দিনের নাবিকদের অনেকেরই দূরের জিনিষ দেখার

* Platanov : I. P. Pavlov, p 84

ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। ডেকে দাঁড়িয়ে তারা চারপাশে লক্ষ্য রাখতো এবং চালককে বিপদের সংকেত জানাতো। এ থেকে বলা চলে যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি চেষ্টার ফলে প্রয়োজন মত বাড়ানো কমানো যায় ; অবশ্য তারও একটা সীমা আছে।

চোখের পরই কানের গুরুত্ব। শ্রবণেন্দ্রিয় অনেক প্রাণীর তুলনায় কম শক্তিশালী বটে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় কম নয়। অর্থপূর্ণ শব্দ বা ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূমিকাই প্রধান। পড়তে লিখতে শিখেছে মানুষ ভাষাসৃষ্টির অনেক পরে। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ই ভাষার বিবর্তনে, মানুষকে আরো মানবিক করার ব্যাপারে, প্রধান ও প্রাথমিক কাজ করেছে। শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে বাতাসে বয়ে-আসা শব্দতরঙ্গ। শব্দতরঙ্গ কানের পরদায় ধাক্কা মেরে সেটার মধ্যে কাঁপন জাগায়। এই কাঁপনে কানের ভেতরকার ছোট হাড়গুলো উদ্দীপ্ত হয়। তারপর ডিমের মত দেখতে একটা ছোট্ট ছিদ্রপথ দিয়ে সেই উত্তেজনার ঢেউ কানের ভেতরকার তরল পদার্থ ও ঝিল্লীর মাধ্যমে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের প্রধান নার্ভটিকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা মস্তিষ্ক-বল্কলের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণী অঞ্চলে পৌছে সংবেদন সৃষ্টি করে। শব্দ বাতাসে কাঁপন জাগায়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০০০০ কাঁপনেই শুধু তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় সাড়া দিতে পারে। সেকেণ্ডে কুড়ির কম কিংবা কুড়িহাজারের বেশি কম্পনে সাড়া দেবার ক্ষমতা তোমার শ্রবণযন্ত্রের নেই। প্রতিনিয়ত শব্দ আমাদের কানে আসছে। কিছু শব্দ শুনতে বেশ ভালো লাগে, কিছু আবার এমন শব্দ আছে যা বিরক্তি জাগায়। শব্দতরঙ্গ যদি সমান সময়ের ব্যবধানে এসে কর্ণপটাহে নিয়মিত ধাক্কা দেয়, তবে সুরেলা ও মিষ্টি শোনায়, আর যদি সময়ের ব্যবধানের কোনো ঠিক মাপজোপ না রেখে কানে ঢোকে, তবে বিরক্তি উৎপাদন করে। আমরা বলি গোলমাল হচ্ছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৌলতে আমরা শব্দ শুনতে পাই, শব্দটা কোন দিক এবং কতদূর থেকে আসছে তাও অনেকটা বুঝতে পারি।

এছাড়া, কানের ভেতর এমন কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, (semi-circular canal ও vestibules) যার সাহায্যে আমরা ঘাড়মাথা দোলানো ও দেহের ভারসাম্য সম্বন্ধে জানতে ও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি। হাঁটা চলা, সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের সব সময় গতিবেগ ও দিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। কানের ভেতরকার 'ভেষ্টিবিউলের' বিশেষ ক্ষমতাবলে দিক ও গতি পরিবর্তনের খবর তোমার গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছুচ্ছে, তাই তুমি সহজে ঐ কাজগুলো করতে পারছো।

স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি প্রধানত ত্বক বা চামড়ার দুটি স্তরের মধ্যে। স্পর্শেন্দ্রিয় বলতে আমি এখানে গরম , ঠাণ্ডা, বেদনার গ্রাহক-প্রান্ত বোঝাতে চাইছি। শারীরবিদরা ত্বকের নীচে চার রকমের সংবেদন বিন্দুর কথা বলেছেন :

যথা—গরম, ঠাণ্ডা, স্পর্শ ও বেদন অনুভূতির বিন্দু। এই সব বিন্দুগুলো চামড়ার নীচে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কোনো জায়গায় হয়তো শৈত্য অনুভূতির বিন্দুর আধিক্য, কোথাও বা উষ্ণতার ; কোথাও বা আবার বেদনা অনুভূতি বিন্দুগুলো বেশি পরিমাণে আছে। ত্বক থেকে উৎপন্ন সংবেদনে সাধারণত একটার সঙ্গে অন্য অনুভূতি মেশানো থাকে। ব্যথার সঙ্গে চাপ বা স্পর্শ অনুভূতি, বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরমের সঙ্গে যন্ত্রণার অনুভূতিও তুমি টের পাবে। এই সব সংবেদন উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফল। দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে যন্ত্রণা-বিন্দুগুলো উত্তেজিত হবার ফলে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ত্বকের ওপরের স্তরের ও গভীর স্তরের অনুভূতির মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। গভীর স্তরের অনুভূতি অনেকটা স্থূল ও আদিম, ওপরের স্তরের অনুভূতি সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী। বিবর্তনের পথে ওপরতলার বিচারবিশ্লেষণ-ধর্মী অনুভূতি আগন্তুক। আর গভীর স্তরের অনুভূতি অনেক প্রাচীন ; প্রাণীদেহের অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় বিবর্তিত হবার অনেক আগে থেকে ত্বকই বোধ হয়, বাইরের আলো বাতাস শব্দ ইত্যাদি সব রকম উদ্দীপকের গ্রাহক-প্রান্ত ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি মেয়ের কথা বলছি। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখতে পারে, পড়তে পারে। মানবমন পত্রিকায় কয়েক বছর আগে রাশিয়ার এই মেয়েটির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। মেয়েটির নাম রোজা কুলেশোভা। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগিয়ে গড় গড় করে বই পড়তে পারে, সেই অবস্থায় ছবি বা আলোকচিত্রের ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে চিত্রের বিশদ বিবরণ দিতে পারে। ডাকটিকিট ছুঁয়ে বলে দিচ্ছিল টিকিটে কার ছবি আছে। একটা আলোকচিত্রে আঙ্গুল দিয়ে পরিচিত একটি মেয়ের কানের দুল দেখে, সে মেয়েটির নাম পর্যন্ত বলে দিলো। ১৯৬২ সালে এ-নিয়ে দস্তুরমত হৈ চৈ পড়ে গেল। শুধু রাশিয়াতে নয়, সারা পৃথিবীতে। মস্কোর সেরা সেরা বিজ্ঞানীদের সামনে মেয়েটিকে এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে হলো। বলা বাহুল্য, পরীক্ষাতে সে সসম্মানে পাশ করলো। তার এই ক্ষমতার উৎস অনুসন্ধানের জন্য নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হলো। আঙ্গুলগুলোর স্পর্শানুভূতির ক্ষমতা বেড়েছে ? না। অভিভাবন ? টেলিপ্যাথি ? না ! পরীক্ষায় দেখা গেল সত্যিই রোজার আঙ্গুলের ছোঁয়াতে আলো আর রঙের প্রত্যক্ষণ (perception) ঘটছে। এই স্পর্শের সাহায্যে দেখার ক্ষমতা কিছুটা অন্তত অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। এক সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, শতকরা প্রায় ১৬ জন অল্পায়াসেই এই বিদ্যা শিখতে পারে। আঘাতের দরুন যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে, তাদের ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে একজন নামকরা স্নায়ু বিশেষজ্ঞ দেখলেন যে, চোখে আঘাত লাগায় যারা দৃষ্টিক্ষমতা হারিয়েছে, তারা আঙ্গুলের সাহায্যে রঙ চিনতে পারে ; কিন্তু যাদের মস্তিষ্কের

দর্শনকেন্দ্র নষ্ট হয়েছে, তারা পারে না।

কি করে সম্ভব হলো! এ-নিয়ে এখনও কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। কেউ বলছেন আদিম পূর্বপুরুষদের ত্বকের এই ধরনের ক্ষমতা কিছু লোকের মধ্যে পুনরাবর্তিত হয়েছে, আবার কেউ বলছেন এ-একটা নতুন ক্ষমতা, যা সকলেই চেষ্টা করলে আয়ত্ত করতে পারে। অবশ্য এটাকে অপার্থিব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে কেউ মনে করছেন না।

স্বাদের ইন্দ্রিয় প্রধানত জিভে। জিভের ওপরভাগে ঈষৎ উঁচু উঁচু জায়গাগুলোতে স্বাদকোষ বা test papilla-র অবস্থান। খাদ্য তরল হলে স্বাদকোষগুলো উত্তেজিত হয়। বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ স্বাদের উত্তেজনা গুরুমস্তিষ্কের বিশেষ বিশ্লেষণী অঞ্চলে বয়ে নিয়ে যায়। মানুষের জিভ সাধারণত মিষ্টি, নোনতা তেতো আর টক, এই চার রকমের মৌলিক স্বাদের পার্থক্য বুঝতে পারে। অবশ্য, আরো অনেক স্বাদ চারটির সংমিশ্রণ থেকে পাওয়া যেতে পারে। ঝাল মৌলিক স্বাদ নয়। লঙ্কা এবং ঐ জাতীয় কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক খাদ্যবস্তু স্বাদেন্দ্রিয়ের রক্ষামূলক কোষগুলোকে উত্তেজিত করলে ঝালের অনুভূতি ঘটে। স্বাদকোষের পাশে থাকে ঠাণ্ডা, গরম, নরম, শক্ত অনুভব করার কোষ। ঝাল গরম-অনুভূতির কোষকে উত্তেজিত করে। জিভের ডগায় পাবে মিষ্টি স্বাদ, গোড়ায় বা পেছনের দিকে তেতো স্বাদ, আর জিভের দুধারে আছে নোন্‌তা ও টক্ স্বাদ পাবার ব্যবস্থা। মাঝখানের অংশে স্বাদগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ-ছাড়া, গলার ভেতরকার তালু (soft plate), গলনালী, আলজিভ ইত্যাদিতেও স্বাদের কোষ আছে। স্বাদ ও গন্ধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক। সর্দি হলে কোনো জিনিষেই স্বাদ পাওয়া যায় না। গন্ধ পাওনা বলে স্বাদ পাওনা।

নাকের মধ্যে আছে গন্ধ অনুভবের ব্যবস্থা। ঘ্রাণ কোষগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলে উদ্দীপক কোষগুলোকে উত্তেজিত করতে পারে না। ঘ্রাণ-উদ্দীপক সূক্ষ্ম কণা অনেক দূর থেকে ভেসে এসেও নাকের মধ্যে ঢুকে উত্তেজনা জাগাতে পারে। স্বাদ-ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও উদ্দীপকের সংস্পর্শ ছাড়া উত্তেজনা জাগে না। নাক থেকে মস্তিষ্কে গন্ধ বয়ে নিয়ে যায় অলফ্যাক্‌টার নার্ভ।

এতক্ষণ বাইরের পরিবেশ থেকে আসা উদ্দীপকের কথা বললাম। এবার বলছি ভেতরের উদ্দীপকের কথা। দেহের ভেতর থেকে উদ্দীপনা এসে প্রায় সব সময় মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত করছে। হাঁটা চলা, হাত-পা নাড়া, ঘাড় ফেরানো এই সব ব্যাপারেই তোমার সজাগ পেশীর সংকোচন সম্প্রসারণ ঘটছে। পেশী, পেশীর সঙ্গে হাড়ের জোড়া লাগার জায়গা, দুটি হাড়ের জোড়, পেশীর বন্ধনী (tendon) ইত্যাদিতে ছোট ছোট গ্রাহক-প্রান্ত বা receptors আছে।

নড়া চড়া করলেই সেই সব ছোট ছোট জ্ঞানেন্দ্রিয় বা receptorsগুলো উত্তেজিত হয়, সংকেত নার্ভ বেয়ে মস্তিষ্কবল্কলের সেই দৈহিক সংবেদনের বিশ্লেষণী অঞ্চলে খবর পাঠায়। এইভাবে আমরা আমাদের হাত-পা নাড়া, নড়াচড়া সম্বন্ধে সচেতন হই। এই খবর আবার ঐ অঞ্চল থেকে রোলাণ্ডের খাঁজের উল্টোদিকে অবস্থিত চেষ্টিয় বিশ্লেষণী অঞ্চলে গিয়ে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র উত্তেজিত করে পেশী, হাড়, বন্ধনী ও জোড়গুলোকে পরবর্তী কাজগুলোর জন্য তৈরী করে। এইভাবে ঐচ্ছিক সুসমন্বিত কাজ সম্পন্ন হয়। অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতিটি সংবাদ সংবেদন অঞ্চলে না পৌছুলে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। স্থূল বা সূক্ষ্ম সব রকম কাজের জন্যই এই সচেতনতা দরকার হয়। যে কোনো জটিল কাজ করতে গিয়ে পর পর অনেকগুলো পেশী হাড় বন্ধনী জোড় ইত্যাদিকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত করতে হয়। এর জন্যে অনেকগুলো আলাদা আলাদা পরাবর্তক্রিয়ার সমন্বয় দরকার। একটা পরাবর্তের ফল অন্য পরাবর্তের উদ্দীপক হয়ে পরবর্তী পরাবর্তক্রিয়াটি ঘটায়। অভ্যাসের ফলে এটা সম্ভব হয়। এই ফিড্‌ব্যাক্ বা প্রতিবহনক্রিয়া (প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের খবর মস্তিষ্কের সংবেদন অঞ্চলে পাঠানো) বিচ্ছিন্ন পরাবর্তক্রিয়াগুলোকে অবিচ্ছিন্ন, সমন্বিত, সূক্ষ্ম বা জটিল ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। বেহালা এসরাজের ছড় চালানো, ক্রিকেটে দৌড়ে এসে বল ছোঁড়া, ট্রাপিজের খেলা দেখানো, সব ব্যাপারেই এই ফিড্‌ব্যাক্ সিসটেম কাজ করে। যখন গান গাও অথবা কথার পর কথা সাজিয়ে কলেজ ইউনিয়নে বক্তৃতা দাও, তখন বাক্‌যন্ত্রের ক্ষুদ্র পেশীগুলোর সঞ্চালন ঐ নিয়ম অনুসারেই মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণী অঞ্চলে পৌছে সংবেদন সৃষ্টি করে, এবং পেশী সঞ্চালন সম্বন্ধে তুমি অবহিত হয়ে একটির পর একটি সুরেলা বা ঝাঁঝালো শব্দ উচ্চারণ করতে থাক।

দেহের আন্তর-যন্ত্র (পাকাশয়, বৃক্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, লিভার ইত্যাদি) থেকেও সংবেদন-উদ্দীপনা মস্তিষ্কবল্কলে পৌছে থাকে। আগেই বলেছি, বিকফ আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপকের সঙ্গে শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন করে সুনির্দিষ্টভাবে সপ্রমাণ করেছেন যে, বল্কল-আন্তরযান্ত্রিক পরাবর্ত বহুলাংশে আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বশাসিত স্নায়ু ব্যবস্থার স্বাধীনতা খুবই সীমিত।

এবার আর একবার চেষ্টাবেদন (kinaesthetic) সংবেদনের উল্লেখ করে এ-আলোচনার ছেদ টানছি।

প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা যখন জটিল কাজ করা হয়, তখন একটু আগে যে 'ফিড্‌ব্যাক ব্যবস্থার' কথা বলেছি, তাছাড়াও আর এক ধরনের সংবেদন মস্তিষ্কে পৌছে নাচা, সাঁতার কাটার মত কাজে, আমাদের সাহায্য করে। একে ভারসাম্যের সংবেদনও বলা চলে। এ-ব্যাপারে, পূর্বে বিবৃত কানের ভেতরকার কয়েকটি যন্ত্রাংশের ভূমিকাই প্রধান। মাথা নাড়লে বা ঘোরালে

ভেষ্টিবিউল ও সেমিসারকিউলার ক্যানেলের মধ্যকার তরলপদার্থ আন্দোলিত হবে। এই আন্দোলনের বিশেষ প্রকৃতি মস্তিষ্কবল্কলকে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক সংকেত সরবরাহ করে। সেই সংকেত অনুযায়ী চেষ্টিয় অঞ্চল পরবর্তী ক্রিয়ার উত্তেজনা পেশী, হাড় ইত্যাদির কাছে পৌঁছে দেয়; তার ফলে আমরা ভারসাম্য বজায় রেখে জটিল কাজটি করতে পারি।

প্রত্যক্ষণ-ধারণা-চেতনা

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংবেদন বিষয়ে যা শুনলে, তারপর প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সংবেদন থেকেই প্রত্যক্ষণ জন্মায়। প্রত্যক্ষণের মৌল উপাদান সংবেদন—সে সংবেদন যে-কোনো ইন্দ্রিয়ভিত্তিক হতে পারে। বাইরের বস্তু-জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান না জন্মালে বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চলে না। প্রত্যক্ষণ বিশেষ এক মননক্রিয়া—যার দ্বারা বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণশক্তির তারতম্যের সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। যে প্রজাতির প্রত্যক্ষণ শক্তি বেশি, সেই প্রজাতির পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও বেশি। এদিক থেকে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সাধারণত দুধরনের মতবাদ প্রচলিত। একটিকে বলা হয় পরমাণুবাদ (Atomism), অপরটিকে বলা হয় সমগ্রতাবাদ (Gestalt)। প্রথম মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই বস্তুর পৃথক পৃথক গুণের যোগফল। তুমি একটা কমলালেবু দেখলে প্রথমে তার আকার, রঙ, আয়তনের সংবেদন তোমার গড়ে উঠবে। এই পৃথক সংবেদনগুলো একত্র হয়ে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তোমার মনে বস্তুটি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণার জন্ম দেবে। এই ধারণাই ঐ বস্তুটি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষণ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান। দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, আমাদের মস্তিষ্কে বস্তুর পৃথক পৃথক গুণের অনুভূতি বা সংবেদন জন্মায় না। যে-কোনো বস্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। বস্তুটির সব কটি গুণের সংবেদন একই সঙ্গে আমাদের মনে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। সংবেদন প্রত্যক্ষণের মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। আমরা বস্তু বা ঘটনাকে সামগ্রিকভাবেই উপলব্ধি করি: এরই নাম প্রত্যক্ষণ। এঁরা মননক্রিয়াকে একটি সম্পূর্ণভাবে আলাদা ক্রিয়া মনে করেন।

বলা বাহুল্য, এই দুই মতবাদের কোনোটাই বস্তুবাদসম্মত নয়। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান লেনিনের প্রতিফলনতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিফলনতত্ত্ব

নড়া চড়া করলেই সেই সব ছোট ছোট জ্ঞানেন্দ্রিয় বা receptorsগুলো উত্তেজিত হয়, সংকেত নার্ভ বেয়ে মস্তিষ্কবল্কলের সেই দৈহিক সংবেদনের বিশ্লেষণী অঞ্চলে খবর পাঠায়। এইভাবে আমরা আমাদের হাত-পা নাড়া, নড়াচড়া সম্বন্ধে সচেতন হই। এই খবর আবার ঐ অঞ্চল থেকে রোলাণ্ডের খাঁজের উল্টোদিকে অবস্থিত চেষ্টিয় বিশ্লেষণী অঞ্চলে গিয়ে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র উত্তেজিত করে পেশী, হাড়, বন্ধনী ও জোড়গুলোকে পরবর্তী কাজগুলোর জন্য তৈরী করে। এইভাবে ঐচ্ছিক সুসমন্বিত কাজ সম্পন্ন হয়। অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতিটি সংবাদ সংবেদন অঞ্চলে না পৌছুলে সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। স্থূল বা সূক্ষ্ম সব রকম কাজের জন্যই এই সচেতনতা দরকার হয়। যে কোনো জটিল কাজ করতে গিয়ে পর পর অনেকগুলো পেশী হাড় বন্ধনী জোড় ইত্যাদিকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত করতে হয়। এর জন্যে অনেকগুলো আলাদা আলাদা পরাবর্তক্রিয়ার সমন্বয় দরকার। একটা পরাবর্তের ফল অন্য পরাবর্তের উদ্দীপক হয়ে পরবর্তী পরাবর্তক্রিয়াটি ঘটায়। অভ্যাসের ফলে এটা সম্ভব হয়। এই ফিড্ব্যাক্ বা প্রতিবহনক্রিয়া (প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের খবর মস্তিষ্কের সংবেদন অঞ্চলে পাঠানো) বিচ্ছিন্ন পরাবর্তক্রিয়াগুলোকে অবিচ্ছিন্ন, সমন্বিত, সূক্ষ্ম বা জটিল ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে। বেহালা এসরাজের ছড় চালানো, ক্রিকেটে দৌড়ে এসে বল ছোঁড়া, ট্রাপিজের খেলা দেখানো, সব ব্যাপারেই এই ফিড্ব্যাক্ সিসটেম কাজ করে। যখন গান গাও অথবা কথার পর কথা সাজিয়ে কলেজ ইউনিয়নে বক্তৃতা দাও, তখন বাক্‌যন্ত্রের ক্ষুদ্র পেশীগুলোর সঞ্চালন ঐ নিয়ম অনুসারেই মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট বিশ্লেষণী অঞ্চলে পৌছে সংবেদন সৃষ্টি করে, এবং পেশী সঞ্চালন সম্বন্ধে তুমি অবহিত হয়ে একটির পর একটি সুরেলা বা ঝাঁঝালো শব্দ উচ্চারণ করতে থাক।

দেহের আন্তর-যন্ত্র (পাকাশয়, বৃক্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, লিভার ইত্যাদি) থেকেও সংবেদন-উদ্দীপনা মস্তিষ্কবল্কলে পৌছে থাকে। আগেই বলেছি, বিকফ আন্তরযন্ত্রের উদ্দীপকের সঙ্গে শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন করে সুনির্দিষ্টভাবে সপ্রমাণ করেছেন যে, বল্কল-আন্তরযান্ত্রিক পরাবর্ত বহুলাংশে আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বশাসিত স্নায়ু ব্যবস্থার স্বাধীনতা খুবই সীমিত।

এবার আর একবার চেষ্টাবেদন (kinaesthetic) সংবেদনের উল্লেখ করে এ-আলোচনার ছেদ টানছি।

প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা যখন জটিল কাজ করা হয়, তখন একটু আগে যে 'ফিড্ব্যাক ব্যবস্থার' কথা বলেছি, তাছাড়াও আর এক ধরনের সংবেদন মস্তিষ্কে পৌছে নাচা, সাঁতার কাটার মত কাজে, আমাদের সাহায্য করে। একে ভারসাম্যের সংবেদনও বলা চলে। এ-ব্যাপারে, পূর্বে বিবৃত কানের ভেতরকার কয়েকটি যন্ত্রাংশের ভূমিকাই প্রধান। মাথা নাড়লে বা ঘোরালে

ভেষ্টিবিউল ও সেমিসারকিউলার ক্যানেলের মধ্যকার তরলপদার্থ আন্দোলিত হবে। এই আন্দোলনের বিশেষ প্রকৃতি মস্তিষ্কবল্কলকে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক সংকেত সরবরাহ করে। সেই সংকেত অনুযায়ী চেষ্টিয় অঞ্চল পরবর্তী ক্রিয়ার উত্তেজনা পেশী, হাড় ইত্যাদির কাছে পৌঁছে দেয়; তার ফলে আমরা ভারসাম্য বজায় রেখে জটিল কাজটি করতে পারি।

প্রত্যক্ষণ-ধারণা-চেতনা

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংবেদন বিষয়ে যা শুনলে, তারপর প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সংবেদন থেকেই প্রত্যক্ষণ জন্মায়। প্রত্যক্ষণের মৌল উপাদান সংবেদন—সে সংবেদন যে-কোনো ইন্দ্রিয়ভিত্তিক হতে পারে। বাইরের বস্তু-জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান না জন্মালে বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চলে না। প্রত্যক্ষণ বিশেষ এক মননক্রিয়া—যার দ্বারা বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণশক্তির তারতম্যের সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। যে প্রজাতির প্রত্যক্ষণ শক্তি বেশি, সেই প্রজাতির পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও বেশি। এদিক থেকে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সাধারণত দুধরনের মতবাদ প্রচলিত। একটিকে বলা হয় পরমাণুবাদ (Atomism), অপরটিকে বলা হয় সমগ্রতাবাদ (Gestalt)। প্রথম মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই বস্তুর পৃথক পৃথক গুণের যোগফল। তুমি একটা কমলালেবু দেখলে প্রথমে তার আকার, রঙ, আয়তনের সংবেদন তোমার গড়ে উঠবে। এই পৃথক সংবেদনগুলো একত্র হয়ে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তোমার মনে বস্তুটি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণার জন্ম দেবে। এই ধারণাই ঐ বস্তুটি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষণ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান। দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, আমাদের মস্তিষ্কে বস্তুর পৃথক পৃথক গুণের অনুভূতি বা সংবেদন জন্মায় না। যে-কোনো বস্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। বস্তুটির সব কটি গুণের সংবেদন একই সঙ্গে আমাদের মনে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। সংবেদন প্রত্যক্ষণের মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। আমরা বস্তু বা ঘটনাকে সামগ্রিকভাবেই উপলব্ধি করি: এরই নাম প্রত্যক্ষণ। এঁরা মননক্রিয়াকে একটি সম্পূর্ণভাবে আলাদা ক্রিয়া মনে করেন।

বলা বাহুল্য, এই দুই মতবাদের কোনোটাই বস্তুবাদসম্মত নয়। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান লেনিনের প্রতিফলনতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিফলনতত্ত্ব

অনুযায়ী প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞার্থ ও ব্যাখ্যা শুনলে বুঝতে পারবে ভাববাদী ও বস্তুবাদী মনোবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুজগতের সংস্পর্শে চেতনায় বস্তুর যে প্রতিফল ঘটে, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে দর্শন-ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সংবেদন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আগে প্রতিফলন সম্বন্ধে গোড়ার কথা বলা যাক। প্রতিফলন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীতত্ত্বের এক মৌলিক ধারণা। মানসিক প্রতিফলন দ্বারা আমরা সব বস্তুর সাধারণ ধর্ম থেকে বিশেষ একটি বস্তুর বিশিষ্ট ধর্ম অনুধাবন করতে পারি। ব্যক্তির প্রতিফলন যন্ত্রে (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহকপ্রান্ত ও মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী অঞ্চল) বস্তুটি ধরা পড়লে প্রাথমিক মানসিক প্রতিফলন—সংবেদন জাগে। বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর সীমার বাইরে যাবার পরও এই প্রাথমিক প্রতিফলনের কিছু রেশ থেকে যায়। বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের বিশেষ প্রণালীতে এই রেশকে প্রসেসিং (processing) করে গুরুমস্তিষ্ক। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে বহির্বস্তুটির প্রতিনিধি, প্রতিকল্প বা মডেল তৈরী হয়। এই প্রতিকল্পের বা মডেলের এবং এইভাবে জানা বস্তুটির অন্তর্নিহিত ধর্মের সাহায্যে, ব্যক্তির মনে অন্যবস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই বস্তুটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষণ বা জ্ঞান জন্মায়। সেই জ্ঞান ব্যক্তিকে বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। মানসিক প্রতিফলনের দুটি দিক সম্পর্কে তোমার জানা দরকার। (ক) প্রতিফলনের সারমর্ম (content) বা প্রতিবিম্ব এবং (খ) বস্তুটির প্রত্যক্ষণকালীন বাস্তব অবস্থা, অর্থাৎ কিভাবে কোন অবস্থায় ব্যক্তির প্রতিফলন যন্ত্রে প্রসেসিং ঘটছে।*
আমাদের প্রত্যক্ষণ, জ্ঞান, ধারণা, চেতনা কি ভাবে গড়ে ওঠে—তাই নিয়ে ভাববাদী ও বস্তুবাদী মনোবিদ্যার মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। কাজেই প্রতিফলনতত্ত্ব নিয়ে আরো কিছু বলা দরকার। যতদূর সম্ভব সহজ করে বলার চেষ্টা করবো, যাতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভাববাদীরা মনে করেন, মননক্রিয়া মনের ধর্ম। মনের সঙ্গে দেহের বা মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে রাজী নন। আর বস্তুবাদীরা মনে করেন, বস্তুর বিবর্তিত বিশেষ জটিল রূপ মস্তিষ্কে ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়া ছাড়া মননক্রিয়া ঘটতে পারে না। তুমি যে কমলালেবুটির রঙ, আকার, আয়তন

---

* Psychic R (reflection—D. G.) has two sides : (1) content of R or the image and (2) the mode of its material existence, i e., the ways the influence of objects are processed in the reflectory apparatus. (Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1967, p 381)

ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছ সেটা তোমার মনের ধর্ম; বস্তুধর্ম এর মধ্যে প্রতিফলিত কি না—ভাববাদীরা সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন। বস্তুর জ্ঞানলাভের ও চেতনার ব্যাখ্যায় ভাববাদীরা অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সাহায্য নিতে অভ্যস্ত। ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষা এই অন্তর্দর্শন পদ্ধতির এক আধুনিক ও নিয়ন্ত্রিত রূপ। বস্তু-নিরপেক্ষ মনকে তাঁরা সংজ্ঞান, নির্জ্ঞান ইত্যাদি প্রকোষ্ঠে ভাগ করে, অবচেতন স্তরে অবগাহন করে মানসিক অবস্থা জানবার ব্যবস্থা করেছেন। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে এঁদের অনেকে মনে করেছেন যে, বস্তুসম্পর্কে প্রত্যক্ষণ বা জ্ঞান বস্তুধর্মের মধ্যে নিহিত নয়, বস্তু-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমরা বস্তুকে জানতে পারি না (things in themselves), বস্তু সম্পর্কে শুধু ধারণা করতে পারি। লক্ বলেছেন: চিন্তাভাবনা, বিচারবুদ্ধি সমন্বিত মন নিজের কাজ নিজেই করে। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।* অনেকে বহির্বাস্তবের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান, মনে করেন নিজের 'মনের মাধুরী' দিয়ে আমরা বাস্তব তৈরী করি। আমাদের মনের বাইরে কিছুই নেই। বার্কলে লিখেছেন: বাইরের বস্তু যদি থাকেও, তাদের অস্তিত্ব জানবার কোনো উপায় নেই। আর যদি নাও থাকে, আমরা এখন যেমন ভাবি, তেমনি ভাবতেই থাকবো যে, তাদের অস্তিত্ব আছে।**

কিন্তু অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ছাড়াও মন এবং বস্তুকে উপলব্ধি করার অন্য উপায় আছে। বস্তুবাদী দার্শনিকরা তার সন্ধান দিয়েছেন, পাভলভ স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সেই উপায়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা মনে করেন, বস্তুজগতকে জানতে হলে মানুষের সঙ্গে তার চলমান ক্রিয়াশীল সম্পর্কের কথা মনে রাখা দরকার। বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বা চেতনার উপলব্ধি অন্তর্দর্শনভিত্তিক অনুমানের সাহায্যে লাভ করা যায় না। মানুষের সজ্ঞান ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে বস্তু ও চেতনাকে বুঝতে হবে। মস্তিষ্ক বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়ত আমাদের মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে—এরই নাম সজ্ঞানক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ফলে বস্তুজগতের জ্ঞান লাভ করছি, আবার বস্তুজগতের জ্ঞান এই ক্রিয়াকে সাহায্য করছে, উন্নত করছে, সমৃদ্ধ করছে। বহির্বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার কাজই সজ্ঞান

---

* The mind, in all its thoughts and reasonings, hath no other immediate but its own ideas, which it alone does or can contemplate. (Locke : Essay on the Human understanding, 1. 1. 8)

** Berkley : Principles of Human Knowledge

প্রক্রিয়া বা চেতনা।* সংবেদন চেতনা আর বহির্বাস্তবের প্রাথমিক প্রত্যক্ষ সংযোগসূত্র।

ভাববাদীদের মধ্যে সকলেই অবশ্য বার্কলের মত জগৎকে মিথ্যা বা নিছক মায়া মনে করেন না। আমরা যখন চিন্তা করি বা কোনো কিছুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন একই সঙ্গে দুটো প্রক্রিয়া চলতে থাকে—মস্তিষ্কের বাস্তব প্রক্রিয়া আর চেতনার মননক্রিয়া। এই দ্বয়বাদী বিশ্বাস আজকালকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এও এক ধরনের ভাববাদ। বস্তুবাদীরা মনে করেন প্রত্যক্ষণে, চিন্তনে, অনুভবে—একটিই মাত্র প্রক্রিয়া চলে, সেটা হল মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া। মননক্রিয়া ঘটে মস্তিষ্ক প্রক্রিয়ারই ফলে।** এঙ্গেলস লিখেছেন : চিন্তা ও চেতনাকে যতই অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় মনে হোক না কেন, আসলে দুই-ই বাস্তব দেহযন্ত্র মস্তিষ্কপ্রসূত। বস্তু মনের সৃষ্টি নয়, মনই প্রকৃতিজগতের উচ্চতম প্রক্রিয়া।*** বাস্তব জগতের প্রতিফলন ছাড়া বাস্তব জ্ঞান, প্রত্যক্ষণ বা মানবচেতনা জন্মায় না। প্রতিফলন যেখানে ঘটছে, (অর্থাৎ মস্তিষ্ক) সেটা বস্তুসম্ভূত, যার প্রতিফলন ঘটছে সেটাও বস্তু, আর প্রতিফলন প্রক্রিয়াও বাস্তব। কিন্তু প্রতিফলনের দরুণ যে মানসিকতার উন্মেষ হচ্ছে—সেটা কোনো বস্তু নয়, বস্তুর প্রতিবিম্ব।

প্রতিফলন ব্যাপারটা কি? আয়নায় প্রতিবিম্ব পড়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে সুরু করছি। যদিও আয়নার ছবি আর মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিফলনের মধ্যে যথেষ্ট

---

* ...the essence of conscious activity is to build up complicated and variable active relations between the conscious organism and its surroundings, and this function is performed by the brain. Consequently the process of consciousness, are processes whereby we relate ourselves to the external world. Cornforth : The Theory of Knowledge, Calcutta, 1955, pp 32-33

অন্য দুটি উদ্ধৃতিও ঐ বই থেকে নেওয়া।

** Mental processes are simply one aspect of the processes of the functioning of the brain as the organ of most complicated relations with the external world. Ibid p 35

*** Our consciousness and thinking, however suprasensuous they may seem, are the products of a material bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of nature. Engels : Ludwig Feurbach, Ch. 3

তফাৎ আছে, সেটা পরে জানবে। একজন প্রখ্যাত মার্কসবাদী এ সম্বন্ধে কি লিখেছেন শোন :

আয়নার সামনে যে বস্তু থাকবে, তার প্রতিবিম্ব আয়নাতে পড়বে। বস্তুটির আকার-গঠন-বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে প্রতিবিম্বে দেখা যাবে। বস্তু ও প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব কিন্তু তা বলে, এক হয়ে যাবে না। বস্তুটির অস্তিত্ব আয়না-নিরপেক্ষ কিন্তু প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব সবসময়েই বস্তু-সাপেক্ষ। বস্তুর মধ্যে যা নেই তা কিছুতেই প্রতিফলিত হবে না। বস্তু মুখ্য—প্রাথমিক, প্রতিবিম্ব গৌণ, বস্তু-সম্ভূত, আনুষঙ্গিক। বস্তুটির সবকিছুই আয়নাতে প্রতিবিম্বিত না হতে পারে। তুমি যদি আরশিতে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে চাও, তাহলে তোমার পিঠভরা এলোচুল তোমার প্রতিবিম্বে আসবে না। কিন্তু প্রতিবিম্বে এমন কিছু থাকতে পারে না, যা বস্তুর মধ্যে নেই। তেমনি বস্তুর সংবেদনে তার সব কিছু বৈশিষ্ট্যই যে প্রতিফলিত হবে, তা নয়। তবে বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত কোনো কিছু সংবেদনে থাকতে পারে না। আরশি যদি ঝাপসা হয়, ভাঙা হয়, অবতল (concave) বা উত্তল (convex) হয়,—তাহলে প্রতিবিম্ব বিকৃত হবে, অদ্ভুত হবে, কিন্তু বস্তুর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিকই থাকবে।

তুমি বলতে পারো—রামগরুড়ের ছানা তো বাস্তবে নেই, আরো অনেক কিছু নেই। যথা : জীন, পরী, দৈত্য, ড্রাগন। তবু তাদের সম্পর্কে আমাদের মনে ধারণা (concept) এল কোথা থেকে ? উত্তরে বলবো : মনের মধ্যে একবার ধারণা তৈরী হয়ে গেলে, তাদের তুমি খুসী মতো একটার সঙ্গে একটা যোগ করে কিম্ভূতকিমাকার অনেক ধারণা তৈরী করতে পারো। মহিষের সিং, রামছাগলের কান, হায়েনার দাঁত, আর পাখীর ডানা মিশিয়ে অদ্ভুত একটা জানোয়ারের ধারণা গড়ে তোলা যায়। এইভাবে বস্তুবাদীরা আরো বলতে পারেন যে, মানুষের মনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা আছে বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হচ্ছে না। অসীম শক্তিধর খামখেয়ালী দলপতি অথবা রাজার ধারণা থেকে ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি। লেনিনের কথার পুনরুক্তি করে বলা চলে যে, আমাদের চেতনা বহির্বাস্তবের প্রতিফলন। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বস্তু ছাড়া প্রতিফলন অসম্ভব, কিন্তু তা বলে, বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিফলন যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়।

আরশির প্রতিবিম্ব আর মস্তিষ্কে বস্তুর প্রতিফলন কিন্তু হুবহু একরকম নয়। প্রতিফলন প্রক্রিয়া প্রথম ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সক্রিয়। মস্তিষ্কের সেই সময়কার অবস্থার ওপর প্রতিফলন নির্ভর করে। আরশি জড়পদার্থ, মস্তিষ্ক জৈব পদার্থ। আরশির প্রাণ নেই, আরশি নিষ্ক্রিয় ; মস্তিষ্কের প্রাণ আছে, মস্তিষ্ক সক্রিয়। মস্তিষ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের সক্রিয়তাও কার্য-প্রণালীর সঙ্গে বাস্তবের প্রতিফলন বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ঘুমিয়ে থাকলে

তোমার মস্তিষ্কে বাইরের কোনোকিছুই প্রতিফলিত হবে না। অন্যমনস্ক থাকলে অনেক কিছুই দেখতে পাবে না, অনেক কিছুই শুনতে পাবে না। মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থায় বাস্তবে যা নেই, তা দেখা যায়, যে কথা উচ্চারিত হয়নি তা শোনা যায়। এই অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণের (hallucinations) প্রসঙ্গ অন্যত্র আসবে।

মোট কথা, প্রতিফলন নির্ভর করছে প্রতিফলনযন্ত্রের (মস্তিষ্ক) সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সক্রিয় সম্পর্কের ওপর। মস্তিষ্কধারীর সেই সময়কার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও তার সঙ্গে বাইরের জগতের সঙ্গে অন্যান্য সম্পর্ক প্রতিফলন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। কাজেই বস্তু প্রতিফলনের ফলে বদলে যেতে পারে। আরশির প্রতিবিম্ব আর মস্তিষ্কে বাস্তবের প্রতিফলন এক ধরনের ক্রিয়া নয় : বস্তুবাদীদের এই বক্তব্য মনে না রাখলে প্রত্যক্ষণ ধারণা ইত্যাদির তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। একই জিনিষ অবস্থান বিশেষে আলাদা আলাদা আকার বা রূপ নেবে। দূরে রাখলে ছোট দেখাবে, কাছে আনলে বড় দেখাবে, একটা চোখ বন্ধ করে তাকালে একরকম দেখাবে, দুচোখ দিয়ে দেখলে অন্যরকম দেখাবে। অনুবীক্ষণের তলায় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। একটা লাঠির খানিকটা জলে ডোবালে, মনে হবে লাঠিটা যেন জলের ভেতর বেঁকে গেছে। সময় বিশেষে সাদা কাপড় দেখে একটা ভৌতিক মূর্তি মনে হতে পারে। স্বপ্নে যা কিছু দেখছো, বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। সব ব্যাপারেই কিন্তু মস্তিষ্ক কাজ করছে, আর কাজ করছে মস্তিষ্কে পূর্বলব্ধ বস্তুজগতের ধারণা ও চিন্তা। ধারণা-চিন্তা বস্তুজগতের সামান্য ও বিমূর্ত রূপকে তোমার মনে ধরে রাখে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তুর প্রতিফলিত ধারণা নিয়ে তুমি অবাস্তব ধারণা গড়তে পারো, এর ফলে বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ককে, বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে একটা প্রস্তাব বা বিবৃতি (proposition) তৈরী করতে পারো। এই রকম করতে গিয়ে এক বস্তুর ধর্ম তুমি অন্য বস্তুতে আরোপ করতে পারো, দুনিয়ায় অস্তিত্ব নেই এমন জিনিষ কল্পনা করতে পারো। উচ্চমার্গের মননক্রিয়া ধারণা (concept), ও চিন্তা (thought) যেমন ভ্রান্তি দূর করতে পারে, তেমনি আবার ভ্রান্তি তৈরী করতেও পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনে রাখো, প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তা—এ-সবের মূলেই আছে বস্তু। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন মাধ্যমে, তোমার দেহমনের বিভিন্ন অবস্থায় বস্তু ও তোমার মস্তিষ্কের মধ্যেকার ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ফল।

তোমার কাজকর্ম ও পূর্ব অভিজ্ঞতা তোমার প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তোমার এখনকার প্রত্যক্ষণ ও চিন্তা—সমাজের সঙ্গে তোমার বর্তমান সম্পর্ক, সমাজে তোমার ভূমিকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সমাজ-মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতা, তোমার এখনকার দেহমনের অবস্থা ইত্যাদি

শর্তসাপেক্ষ। তোমার আমার চোখ কান দুই-ই সমান সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, মস্তিষ্কের তড়িৎ-লেখন (electro-encephalogram) দেখে তোমার আমার প্রত্যক্ষণ এক ধরনের হবে না। আমি তড়িৎ-লেখনের বিভিন্ন অংশের তাৎপর্য— আমার বিশেষ পূর্বলব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী, বুঝতে পারবো ; আর তোমার কাছে সবটাই হিজিবিজি মনে হবে। ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা রুটির টুকরোর প্রত্যক্ষণ ও ধারণা তোমার এবং একজন রাস্তার উপোসী ভিখিরির আলাদা হবে নিশ্চয়ই। তুমি ওটাকে ভোজ্য মনে করবে না, ভিখিরি দৌড়ে গিয়ে ওটাকে তুলে নিয়ে মুখে পুরবে। মানুষ শুধু প্রত্যক্ষণ করে থেমে থাকে না, দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের সাহায্যে ধারণাও তৈরী করে, এই ধারণা প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে।

প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, ধারণা, চেতনা আমাদের কার্যকলাপ থেকে, বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে জন্মায় ; আবার চিন্তা, ধারণা, চেতনা আমাদের কার্যকলাপ, এবং আমাদের জীবনক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। চেতনা প্রাণীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। বিবর্তনের ফলে মানবচেতনার জন্ম।

তা বলে ভেবো না যেন, শুধু প্রত্যক্ষণ-ধারণা-চিন্তার মাধ্যমেই মানবচেতনা অভিব্যক্ত। মানুষের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে, সমাজ পরিবর্তনে, আর এক ধরনের মননক্রিয়ার—প্রক্ষোভের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। প্রক্ষোভেরও জন্ম বাস্তবের প্রতিফলন থেকে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের আরো বেশি সক্রিয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে প্রক্ষোভের জন্ম। বেশি সক্রিয়তার দরুণ, পরিবেশের বস্তু-ঘটনা ও অন্য মানুষের সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট মনোভাব গড়ে ওঠে—বিশেষ করে তাদের সম্বন্ধে, যারা এই সম্পর্ক বজায় রাখার সহায়ক বা প্রতিবন্ধক। নিজের ও আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তার জন্য তুমি যুদ্ধ চাও না। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য তুমি কোনো শান্তি সংসদের সভ্যা· হয়েছো, কিছু কিছু কাজও করছো। তোমার সেই কাজের সহায়ক শান্তিসংসদের সভ্যদের প্রতি তোমার মনোভাবে স্বভাবতই প্রক্ষোভের মাত্রা হবে বেশি। এই প্রক্ষোভ হবে সদর্থক। আর শান্তিভঙ্গকারী বা যুদ্ধের উসকানীদাতাদের প্রতি মনোভাবে নঙর্থক বিপরীত প্রক্ষোভের আধিক্য থাকবে। একদলকে ভালবাসবে, অন্যদের ঘৃণা করবে। প্রক্ষোভচালিত মানুষের কর্মক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক গঠনের মধ্যে, আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে কিছুটা প্রক্ষোভের অস্তিত্ব প্রায় সর্ব সময়েই থাকে। আবার যুক্তিবুদ্ধি চিন্তাভাবনা প্রক্ষোভকে কমায় বাড়ায়, প্রক্ষোভকে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে।

এই হলো প্রতিফলনতত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যক্ষণ, ধারণা, চিন্তন, প্রক্ষোভ ইত্যাদির জন্মকথা। এইবার শর্তাধীন পরাবর্ত অনুযায়ী এদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

১০০ ওয়াটের আলোর সঙ্গে যখন কুকুরের শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তখন প্রথমদিকে আলোর সংবেদন তার মস্তিষ্কে খাদ্য সংকেত রূপে প্রকাশ পায়। যখন কয়েকবার শুধু ১০০ ওয়াটের আলোর সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হয় এবং কাছাকাছি শক্তির (যথা ৯০, ১১০, ১২০ ওয়াট) আলোর সঙ্গে খাদ্য না দেওয়া হয়, তখন ১০০ ওয়াটের আলো সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষণ বা সঠিক জ্ঞান জন্মে। ধারণা (concept), চিন্তা (veable thought), দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের ক্রিয়া—প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রের সংবেদন-প্রত্যক্ষণের বিমূর্ত ও সামান্য রূপ।

ধারণা ও চিন্তার ব্যাখ্যা শুধু শারীরবৃত্তিক স্নায়ুপ্রক্রিয়ার দ্বারা সম্ভব নয়। বিবর্তনের একটা স্তরে এসে মস্তিষ্কের শারীরস্থানিক (anatomical) পরিবর্তন থেমে গেছে। তখন থেকে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বেড়েছে, তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ঘটেছে পরিবেশকে পরিবর্তন করতে গিয়ে, এই পরিবর্তন ঘটেছে শ্রমের দৌলতে। মানুষের সমাজ বিবর্তিত হয়েছে শ্রমের ফলে, আর নতুন সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন থেকে নতুন ধর্ম আয়ত্ত করেছে মানবমস্তিষ্ক। ধারণা-চিন্তা বিশেষ সামাজিক ধর্ম। অবশ্য সংবেদন প্রত্যক্ষণকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ধারণা, উদ্ভব হয় চিন্তার। শৈশব থেকে গুহায় আটকে রাখা মানুষের ধারণা ও চিন্তাধারা প্রাথমিক পর্যায়ের চেয়ে বেশিদূর এগুবে না। আদিম মানুষের ধারণা-চিন্তা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের তুলনায় খুবই অনুন্নত ছিলো। মানুষ যত সভ্য হয়েছে, তার শ্রম ও কর্মক্ষমতা তত বেড়েছে এবং বহুমাত্রিক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-বস্তুর সংখ্যা পরিধি ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। এই বৈচিত্র্য ও মাত্রাবৃদ্ধি তার মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে তার মধ্যে নতুন গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছে। বাস্তবের মধ্যে সে অনেক নতুন জিনিষের সন্ধান পেয়েছে। বস্তুর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং বস্তুর মধ্যে নতুন নতুন গুণের সন্ধান পাবার ফলে মানুষ তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে; এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে তার মস্তিষ্কের বিবর্তিত নতুন তন্ত্রের বিমূর্তকরণ ও সামান্যীকরণ ক্ষমতা। দলবেঁধে যৌথ শ্রমের সাহায্যে উদর পূরণ এবং আত্মরক্ষার তাগিদে ও কাজে বহির্বাস্তবের জ্ঞান (মূর্ত বস্তুর বিমূর্ত বিষয়ীগত রূপ) বিনিময় করতে হয়েছে পরস্পরের মধ্যে। এই ভাবে গড়ে উঠেছে ধারণা। বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান ও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টায় বাক্‌ভিত্তিক চিন্তনক্রিয়ার উন্মেষ ঘটেছে। চিন্তা করার ক্ষমতা একেবারে এক নতুন রাজ্য খুলে দিয়েছে। বস্তুর নিজস্ব ধর্ম ও অন্য বস্তুর সঙ্গে তার সঠিক সম্পর্ক ছাড়াও মানুষ চিন্তার সাহায্যে বস্তুটিতে নতুন কাল্পনিক ধর্ম আরোপ করতে পারে, এবং অন্য বস্তুর সঙ্গে তার নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে পারে। এইখানেই

চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এই নতুন ক্ষমতা মানুষকে নতুন কাজে,—পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানোর কাজে প্রবৃত্ত করে, এবং নতুন ধরনের শ্রমকৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। প্রথমে মস্তিষ্কে এই পরিবর্তন ঘটানোর ছক তৈরী হয়, তারপর শ্রমের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। চেষ্টার ফল আবার মস্তিষ্কের ছকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অসঙ্গতি ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়। এই-ভাবে চলে অনুশীলন (practice), অনুশীলন ও চিন্তার সাহায্যে বহির্বাস্তবকে পরিবর্তন ও পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে অভিযোজন ক্রিয়া চলতে থাকে। দ্বিতীয় সাংকেতিক-তন্ত্রের এই নতুন ধরনের পরাবর্তগঠনের ক্ষমতা আছে—পাভলভের এই আবিষ্কারের ফলে ঐশ্বরিক ও অপার্থিব শক্তির কল্পনা ছাড়াই উচ্চতম মানসিক বৃত্তির বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

চিন্তা কি শুধু অনুচ্চারিত শব্দসমষ্টি, অথবা নিজের সঙ্গে কথা বলা? একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বলেছেন—না, ঠিক তা নয়। প্রথমত, অর্থহীন বহু শব্দ তুমি উচ্চারণ করতে পারো বা ভাবতে পারো, এবং মানে-হয়-না এমন অনেক আবোল তাবোল ছড়া আউড়ে যেতে পারো বা মনে মনে তৈরী করতে পারো। দ্বিতীয়ত, নিজের সঙ্গে আলাপ না করে, প্রয়োজনীয় অনুচ্চারিত শব্দ সমষ্টির সাহায্য না নিয়েও তুমি অনেক সময় চিন্তা করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত না দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে না। তুমি আমার সঙ্গে সুপ্তি-স্বপ্ন-সম্মোহন নিয়ে অনেক পত্রালাপ করেছো, মুখোমুখি বসে অনেক আলোচনা করেছো। এ-সম্পর্কে দুচারটে কথা দিয়ে তুমি আমার কাছে তোমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারো। অন্য কারুর কাছে সেই মনোভাব প্রকাশ করতে গেলে তোমাকে অনেক বেশি কথা বলতে হবে। তেমনি যে সম্বন্ধে তুমি আগে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছো, সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে হলে খুব অল্প কয়েকটি অনুচ্চারিত কথার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, কোনো সময় হয়তো উচ্চারিত, অনুচ্চারিত কোনো কথারই দরকার হবে না। কিন্তু তা বলে যেন ভেবোনা, তুমি এমন উচ্চমার্গের চিন্তাশক্তির অধিকারী—যা কথার সাহায্যে গঠিত হতে পারে না, কিংবা যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এইরকম দার্শনিক মন্তব্য অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। চিন্তা থেকে ভাষা বা কথার সৃষ্টি হয়নি; ভাষার পুষ্টির পর, কথাবলার শক্তি আয়ত্ত করার পর, দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের সাহায্যে পরাবর্ত গঠনের শক্তি অর্জনের পরে চিন্তা-শক্তির অধিকারী হয়েছে মানুষ। যে-মানুষের মস্তিষ্কের ভাঁড়ারে যত বেশি সক্রিয় শব্দ-সম্ভার, তার চিন্তাশক্তি তত বেশি স্পষ্ট ও পরিণত। 'সক্রিয়' মানে শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্যবোধের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অনুশীলন (practice) সাপেক্ষ।

ভাষা ও চিন্তা যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, শ্রম ও হাতিয়ারের ব্যবহার যে

এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত, এই তত্ত্বের আরো প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে পশুপালিত মানবশিশুদের পর্যবেক্ষণে। ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৩০টি এই ধরনের শিশু পাওয়া গেছে। এদের কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না, চার হাতপায়ে ভর দিয়ে জোরে ছুটতো, তাড়াতাড়ি গাছে উঠতো। শরীরে অসীম শক্তি ছিলো এদের। এদের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি সমাজে প্রতিপালিত শিশুদের তুলনায় ছিলো অনেক বেশি। অনেক চেষ্টা করেও এদের কাউকেই ভাল-ভাবে কথা বলতে শেখানো যায়নি। আমাদের দেশে ১৯২০ সালে একজন বৈজ্ঞানিক নেকড়ে শাবকদের সঙ্গে দুটি মানবশিশুকে দেখতে পান। তাদের একজনের বয়স ২, অন্যজনের ৮। ছোটোটি বেশিদিন বাঁচেনি, বড়টিকে প্রায় ১৯ বছর বাঁচিয়ে রাখা হয়। বৈজ্ঞানিক শিশুটি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দিকে সে হাতে ও পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতো, জলপান করতো চেটে, মেঝেতে ফেলে রাখলে তবে মাংস খেতো। কারুর হাত থেকে খেতে চাইতো না। কেউ খাবার সময় কাছে এলে গোঁ গোঁ শব্দ করতো, রাতে নেকড়ের মতো ডাকতো। আলো দেখে ভয় পেতো, অন্ধকারে দেখতে পেতো। পালকের ৭ বছর পরিশ্রমের পর সে মাত্র ৪৫টি শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছিলো। প্রায় ১৫০ বছর আগে জার্মানীতে একটি শিশুকে একটি নির্জন ঘরে আটকে রাখা হয়। বাইরে থেকে ফোকর দিয়ে ছুঁড়ে তাকে খাদ্য-পানীয় দেওয়া হতো। শারীরিক ক্ষমতার দিক থেকে সে পশুপালিত শিশুদের মত হয়নি, এমনকি সামাজিক বাচ্চাদের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল; কিন্তু মানসিক দিক থেকে প্রায় সর্বাংশে হয়ে উঠেছিল পশুপালিত মানবশিশুর মত।

মানবশিশু সব মানবিক গুণ আয়ত্ত করার মত স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু মানবিক মননক্রিয়া সামাজিক উদ্দীপকের প্রভাবে গঠিত পরাবর্ত ছাড়া বিকাশলাভ করে না। উদ্দীপকের প্রভাব বললে ভুল বলা হবে; বলা উচিত, উদ্দীপকের সক্রিয় প্রভাব। এক কথায়—উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া আমরা মানুষ হতে পারি না। শিক্ষা মানেই নতুন নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন।

চেতনা সম্পর্কে পাভলভীয় ধারণা জানাতে গিয়ে অনেক কথা বলতে হলো। তোমাকে বোঝাতে গিয়ে মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গেরও অবতারণা করতে হয়েছে। তাই সবশেষে সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করে পুনরধ্যয়নের সুযোগ করে দিচ্ছি।

মননক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা বাইরের জগৎ ও নিজেদের অন্তরজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। এই সব মননক্রিয়ার সামগ্রিক যোগফলে চেতনার উৎপত্তি। শ্রম, সামাজিক উৎপাদনের কাজ, হাতিয়ারের ব্যবহার ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে ভাষার সৃষ্টি। এই ভাষা চেতনা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভাষার পর চেতনার উন্মেষ একই কারণে ঘটেছে। যুক্তিপূর্ণ

চিন্তার জনক এই ভাষা। বাক্‌ভিত্তিক চিন্তা শুধু বাইরের জগতের বাহ্যিক রূপের প্রতিফলন নয়; বাইরের জগতের তাৎপর্য, বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার বিশিষ্ট ধর্ম ও পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার জ্ঞান চিন্তার সাহায্যেই লাভ করি। শ্রমপ্রক্রিয়া ও সহযোগিতা-ভিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনুধাবন করি। এই জ্ঞান ও অনুধাবন ছাড়া চৈতন্য লাভ অসম্ভব। বস্তু ও অন্য প্রাণীর সাহায্য-সহযোগিতা পরিবেশের পরিবর্তনে ও পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে অন্য ঘটনা, বস্তু ও প্রাণীর সম্পর্কে আমাদের চেতনায় বিশেষ ধরনের কিছু ভাব বা গুণের বিকাশ ঘটে। এইভাবে অন্য ঘটনা ও মানুষের প্রতি আমাদের প্রীতি রসানুভূতি (sentiment) ইত্যাদির উদ্রেক হয়। আবার অভিযোজনক্রিয়ায় প্রতিবন্ধক-সৃষ্টিকারী বস্তু প্রাণী ও ঘটনার প্রতি চেতনায় বিপরীত ভাবের সৃষ্টি হয়। এই সব মিলে গড়ে ওঠে ব্যক্তি চেতনা। মনে করো না যে মানব-চেতনা শুধুমাত্র বিমূর্ত নীরস যুক্তিবাদী চিন্তার সমষ্টি। ব্যক্তির ভালো লাগা, মন্দ লাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে বিশেষ মনোভাব—এই সব মিলে চেতনা। তার ধারণা কার্যকলাপের সঙ্গে অবিরত সে বাস্তবের সম্পর্ক অনুভব করে, মিলিয়ে দেখে। তা না হলে, বাইরের জগৎ বা নিজের অন্তরজগৎ সম্পর্কে সঠিক চেতনা গড়ে ওঠা সম্ভব হতো না। আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। কোনো এক মুহূর্তে সব মননক্রিয়া (স্মৃতি অভিজ্ঞতা রসানুভূতি) চেতনায় ধরা পড়ে না। কিছু কিছু (বিশেষ করে প্রক্ষোভজাতীয় মননক্রিয়া) চেতনার বাইরে থাকতে পারে। তুমি যখন কোনো একটা বিষয়ে মনঃসংযোগ করো, মস্তিষ্কের অনেকটা অঞ্চল তখন নিস্তেজিত হয়ে যায়, দু'একটি জায়গা উত্তেজিত থাকে। নিস্তেজিত অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ তখন চেতনার বাইরে থাকে। কিন্তু সেইসব ক্রিয়াকলাপ তোমার চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারে, যদিও সেই প্রভাব সম্পর্কে তুমি তখন অবহিত নও। একটু আগেই বলেছি, তোমার চিন্তাবিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু প্রত্যক্ষভাবে চেতনায় না এসেও পরোক্ষভাবে তোমার চিন্তা ও কাজকে প্রভাবিত করতে পারে। তোমার দেহের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় আন্তরযন্ত্র তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে,—হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করছে, ফুসফুস রক্ত পরিষ্কার করছে, পাকযন্ত্র হজমের কাজ চালাচ্ছে। এগুলো সম্পর্কে তুমি বেশির ভাগ সময় সচেতন নও। কিন্তু তোমার চেতনাকে এই সব অচেতন ক্রিয়া খানিকটা প্রভাবিত করছে নিশ্চয়ই। এ সব কিন্তু চেতনারই বর্জিত অংশ (by product), অথবা চেতনা কর্তৃক সাময়িকভাবে স্বাধীনতার লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্নায়ুসংস্থার কিছু অংশের ক্রিয়াকলাপ। তখনকার মত বস্তুজগতের অনুধাবনে এই মননক্রিয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফ্রয়েডীয় অবচেতনের (subconscious) আলোচনা প্রসঙ্গে পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তখন বুঝতে পারবে এর মধ্যে

রহস্যময়তা বা অজ্ঞেয়তা নেই।*

চেতনা গঠনের মূলে থাকে আমাদের সামাজিক ক্রিয়াশীলতা, আবার চেতনাই আমাদের সামাজিক কাজকর্মকে প্রভাবিক ও নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের চেতনায় বহির্বাস্তব প্রতিফলিত হয়, আবার চেতনা বহির্বাস্তব সৃষ্টি করে—কথাগুলো বলেছেন লেনিন।**

প্রক্ষোভ

প্রক্ষোভ সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি, তার সঙ্গে আরো দু'চার কথা যোগ করা দরকার। কেননা, আজকাল প্রক্ষোভ বা ইমোশন (emotion) নিয়ে মনস্তাত্বিকরা আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। মনোরোগের চিকিৎসকরা প্রক্ষোভ তাড়িত রোগীদের নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। প্রক্ষোভ কি ? প্রক্ষোভের সংজ্ঞার্থ নিয়ে নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে।

তিরিশ বছরের মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটেনি বটে, কিন্তু ছোটোখাটো যুদ্ধের বিরাম নেই। হিংসাত্মক কার্যকলাপ তো লেগেই আছে। মানুষে মানুষে, পার্টিতে পার্টিতে, সশস্ত্র সংঘর্ষের খবর প্রতিদিনই কাগজ খুললে পাওয়া যাবে। হিংসা ঘৃণার মত প্রক্ষোভের, এই ব্যাপক ক্রমবিস্তারের কারণ অনুসন্ধানে সকলেই তৎপর ও উৎসুক। সাম্প্রতিককালকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতার যুগ। এ-যুগের মানুষ ভালবাসে না, প্রেম চায় না। ভূতপ্রেত না দেখে যেমন ভূতপ্রেত নিয়ে চিরকাল মানুষ গল্প লিখছে, এ-কালের লেখক তেমনি ভাল না বেসে, ভালবাসাকে না জেনে, ভালবাসার কথা লেখে।*** সব প্রক্ষোভ সম্পর্কে ঐ একই কথা বলা চলে।**** লেখা হয়েছে : মনস্তত্বের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় প্রক্ষোভ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম। মহামহা-পণ্ডিত প্রক্ষোভ বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে একটুও কুণ্ঠিত নন। ১৯২৮ সালে প্রক্ষোভ সম্পর্কে মতবিনিময়ের জন্য এক আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেকেই ঐ একই ধরনের মত প্রকাশ করেছিলেন।

---

* There is nothing mystical or unknowable in the 'subconscious'. Dictionary of Philosophy, Moscow, 1967 p 407

** Lenin's Collected Works, Vol. 38, p 221

***It is with true love as it is with ghosts, one talks of it, but few have seen it. Shibles Waren : Emotion, The Language Press, Wisconsin ; p 1

****এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (১৯৫৫)

প্রক্ষোভ মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে একটা ধাঁধা বিশেষ। প্রক্ষোভের সংজ্ঞার্থ নিয়ে খুব কম সময়েই দুজন মনস্তাত্ত্বিক একই মত পোষণ করে থাকেন। 'ফিজিওলজিক্যাল সাইকলজি'র লেখক মর্গান (১৯৬৫) বলেছেন : প্রক্ষোভ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোনো ধারণা নেই বলেই আমরা প্রক্ষোভ নিয়ে খুব বেশি লেখালিখি করি, খুব বেশি আলোচনা করি।

দেশ বিদেশের প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকদের এই সব অভিমত শুনে অবাক হয়োনা। অনেকবার বলেছি, মানসিক ক্রিয়ার বস্তুভিত্তিক অধঃস্তর (material substratum)—মস্তিষ্ককে বাদ দিয়ে মনকে বুঝতে গেলে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবেই। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'ইমোশন'* শীর্ষক ৫০০ পৃষ্ঠার বইটির বিবলিওগ্রাফিতে প্রায় ৬০০ উৎসের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে তুমি সেচেনফ পাভলভ বা ঐ ধরনের কোনো বিজ্ঞানীর নাম পাবে না। বইটিতে মূল্যবান তথ্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অভাব নেই, অভাব আছে শুধু বস্তুবাদী বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিক 'প্রক্ষোভ'কে অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় মনে করেন না। প্রায় ১০০ বছর আগে সেচেনফ লিখেছিলেন : চিন্তায় পরাবর্তের প্রথম পর্যায় (গ্রাহক প্রান্তের উত্তেজনা) আছে, তার অনুবৃত্তি (continuation) আছে, শুধু শেষটা—অর্থাৎ পেশীসঞ্চালন নেই। প্রক্ষোভের বেলায় পরাবর্তের তিন পর্যায়ই বর্তমান। কিন্তু শেষ পর্যায়—পেশীসঞ্চালন ক্রিয়াটি, অনেক বেশি জোরদার। অর্থাৎ পেশীর ক্রিয়া উদ্দীপকের স্বাভাবিক সাড়ার তুলনায় অনেক জোরালো। সেচেনফ অবশ্য অনুমানভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে প্রক্ষোভ সম্পর্কে বস্তুবাদীদের আরো সঠিক ধারণা গড়ে উঠেছে।

পশুদের সব কাজকর্মই প্রায় প্রক্ষোভভিত্তিক। তুমি জেনেছো যে, সংকেতের তাৎক্ষণিক তাৎপর্য নিয়ে পশুর কারবার। আগে থেকে তৈরী পরাবর্ত দিয়ে সে সংকেতে সাড়া দিতে অভ্যস্ত। তুমি খাদ্যের সংকেত জানালে সে অভ্যাসগত উত্তেজিতভাবে এদিক ওদিক ছুটতে থাকবে, জোরগলায় ডাকতে থাকবে, লেজ নাড়বে। মস্তিষ্কবল্কল ও বল্কলনিম্ন অংশের সঙ্গে সংযোগের ফলে যে-সব পরাবর্ত তৈরী হয়েছে, প্রক্ষোভ তাড়নায় সেইগুলোই প্রকাশ পাবে। পশুদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ কথাটির ব্যবহার অবান্তর—আমেরিকার একজন বস্তুবাদী বিজ্ঞানী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।** কারণ পশুদের মধ্যে বিপরীত মননক্রিয়ার—ধারণা

* Shibles Waren, U. S. A.

** There is however very little gained by using the term "emotions" with regard to animals. This is true because there is no other phenomenon to which emotions are opposed. (Wells H. K. : I. P. Pavlov, p. 153)

বা বোধ শক্তির (intellect)-র বিকাশ ঘটেনি।

মানুষ ভাষার দৌলতে বিমূর্ত ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম ও বোধশক্তির অধিকারী।* ওয়েলস বলেছেন, ধারণা ও প্রক্ষোভ চেতনার দুই পৃথক চেহারা। ধারণার কাজ বাস্তবকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা। বিশুদ্ধ ধারণা ভাষার মাধ্যমে বাইরের বস্তু বা ঘটনার সঠিক বিমূর্ত সংকেত। যে ধারণা করছে, তার ব্যক্তিগত কোনো ভাবপ্রবণতা বা রসানুভূতি (feeling or sentiment) থাকবে না ধারণার মধ্যে। প্রক্ষোভের প্রাথমিক কাজ ধারণায় প্রতিফলিত বস্তু বা ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় করা, ব্যক্তির পক্ষে তার মূল্য নির্ধারণ করা। সব ধারণার মধ্যেই প্রক্ষোভিক উপাদান কিছু না কিছু থাকবেই। ধারণা ছাড়া প্রক্ষোভ তৈরী হয় না, আবার প্রক্ষোভবিহীন ধারণাও থাকতে পারে না। এই হচ্ছে প্রক্ষোভ সম্পর্কে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত। চেতনার প্রক্ষোভ-অংশ মানুষকে সচল করে, কাজে উদ্যোগী করে। বাস্তব সম্পর্কে ধারণা যত সঠিক হবে, প্রক্ষোভিক সাড়া তত বেশি কাজের উপযোগী হবে। দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। তুমি চিরকাল বড় বড় শহরে থেকেছো, রাস্তাঘাটে সাপ দেখবার সুযোগ তোমার হয়নি। কোনটা কেউটে, কোনটা ঢোঁড়া, কোনটা হেলে—তুমি দেখলে চিনবে না। পাড়াগাঁয়ের পথে চলতে গিয়ে নির্বিষ একটা ঢোঁড়া বা হেলে সাপ দেখলে তুমি ভয়ে আঁতকে উঠবে, হয়তো পথ ছেড়ে বিপথে ছুটতে গিয়ে সত্যিকারের বিপজ্জনক কোনো জন্তুর, যেমন—দাঁতালো শুয়োরের সামনে পড়ে যাবে। আর একজন পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—যে ঢোঁড়া সাপ চেনে, নির্ভয়ে পাশ কাটিয়ে পথ বেয়ে এগিয়ে যাবে। তোমার ধারণার অভাবে তোমার প্রক্ষোভিক সাড়া তোমাকে অকাজ বা অপ্রয়োজনীয় কাজে প্রবৃত্ত করাবে। তোমরা দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়ে রাত করে ফেলেছো, পথে একজন বিদেশী তোমাদের দিকে তাকিয়ে তোমার দুর্বোধ্য ভাষায় হাসিমুখে দুচারটে কথা বললো, তোমার মনে হলো লোকটি বেশ ভদ্র; তার দিকে তাকিয়ে তুমি না বুঝেই তার হাসির প্রতিদান দিলে। তোমার বন্ধুটি কিন্তু ততক্ষণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত পা চালিয়ে তোমার হাত ধরে একরকম টানতে টানতে নিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসলো। তুমি হকচকিয়ে গেলে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে বন্ধু তোমাকে বিদেশীর কথার মানে বুঝিয়ে বললো। তুমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলে। বন্ধুটি ঐ ভাষা জানতো। কাজেই বিদেশীর বক্তব্যের সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলো। দৃষ্টান্ত শুনে বুঝতে পারছো, ধারণা ছাড়া প্রক্ষোভ তৈরী হয় না। আমি বাড়ীওয়ালার নোটিশ পেয়ে গত কয়েকদিন

---

* Ibid

খুব দুর্ভাবনায় কাটিয়েছি। শতকরা পঞ্চাশ টাকা ভাড়া না বাড়ালে আমাকে বাড়ী ছাড়তে হবে। মাত্র গতকাল অভিজ্ঞ উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে ভয় অনেকটা কমেছে। ধারণা হয়েছে যে, নিজেকে যতটা বিপন্ন মনে করেছিলাম, আসলে ততটা বিপন্ন বোধ করার কারণ ঘটেনি। প্রক্ষোভ-উৎপাদক ভয়ের বস্তু সম্পর্কে যত ধারণা বা জ্ঞান বাড়বে, ভয়ের প্রতিক্রিয়া তত কম দেখা দেবে।* ধারণা আর প্রক্ষোভ দুইই চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রক্ষোভ-হীন না হয়ে মানুষ মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারে না—এও যেমন সত্যি; তেমনি আবার এও সত্যি যে, প্রক্ষোভাধীন মানুষই হঠকারী, হিংসাত্মক ধ্বংসাত্মক কাজ করে থাকে।

প্রক্ষোভ যখন প্রচণ্ড হয়ে তুঙ্গে অবস্থান করে, তখন আমরা তাকে বলি প্যাশান (passion)। টাইফুন টর্নাডোর মত শক্তি ধরে প্যাশান। অদ্ভুত অসাধ্য কাজ মানুষ 'প্যাশান'-এর বশবর্তী হয়ে সমাধা করতে পারে; তখন বহির্জাত বা অন্তর্জাত কোনো নিস্তেজনার বাঁধ দিয়ে মস্তিষ্কে সবেগে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা-তরঙ্গকে রোধ করা যায় না। 'প্যাশান' কিন্তু প্রায়ই স্বল্পস্থায়ী। বেশিক্ষণ (অসুস্থদের কথা আলাদা) 'প্যাশান'-এর তাড়না সহ্য করার শক্তি কোনো মস্তিষ্কের নেই।

প্রক্ষোভের মৃদুতম ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকাশকে মেজাজ বা 'মুড (mood) বলা হয়। সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই দেখলে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘে আকাশ ছাওয়া, সূর্যিঠাকুর মেঘের আড়ালে বসে ডিউটি ফাঁকি দিচ্ছেন। মেজাজটা বিগড়ে গেল। সাতটার মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সামনে একজনের সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার। চা বিস্বাদ লাগলো, সামান্য ব্যাপার নিয়ে বোনের সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়া হলো। বাসে আধঘণ্টা ঐ মেজাজই বহাল রইলো। বাস থেকে নেমে গড়ের মাঠের রাস্তায় পড়তে দেখলে রোদে ঝলমল করছে কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো, সূর্যিঠাকুর উঁকি মেরেছেন মেঘের ফাঁক দিয়ে, বৃষ্টি থেমে গেছে: মেজাজ শরিফ। গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলে। দ্রুত 'মুড' বদলে গেছে। আবার কোনো কোনো সময়, যেমন প্রবাসী বন্ধুটির চিঠি পেতে যদি সপ্তাহ খানেক দেরী হয়, তোমার বিষণ্ণ বা তিরিক্ষি মেজাজ ঘণ্টা খানেকের বদলে ৭×২৪ ঘণ্টা বজায় থাকে—এ তুমি জানো।

---

* The more limited his knowledge of these, the less appropriate and more panicky will be his emotional response; and the more he knows, the more appropriate and stable his reactions. Thus in human beings, ideas and emotions are two indispensable and inseparable aspects of the reflection of reality in consciousness. Ibid

প্রক্ষোভকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়। সদর্থক ও নঙর্থক। আনন্দ, ভালবাসা, উল্লাস ইত্যাদি সদর্থক, আর দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদি নঙর্থক। সদর্থক দেহমনের পক্ষে শুভকর, আর নঙর্থক ক্ষতিকর।

এই প্রক্ষোভ সম্পর্কে ভাববাদী মনস্তাত্ত্বিকরা যে সব তত্ত্ব প্রচার করেছেন, সেগুলোর সব থেকে বড় ত্রুটি কোথায় জানো? প্রথমত, তাঁরা মনে করেন যে, প্রক্ষোভ প্রধানত জৈবধর্ম,—পশু ও মানুষের রাগের অভিব্যক্তি এক ধরনের। দ্বিতীয়ত, চিন্তাশক্তির থেকে অনেক আগে মানুষ প্রক্ষোভধর্ম আয়ত্ত করেছে। এই দুই ধারণাই ভ্রান্ত। মানুষের ক্রোধ আর পশুদের 'Rage reaction' এক রকমের নয়। মানুষের সব মননক্রিয়ার সঙ্গে তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ও অবস্থিতির সম্পর্ক আছে—একথা তুমি বোধ হয় অস্বীকার করবে না। প্রক্ষোভ আদিম ও চিন্তাশক্তি অর্বাচীন, এর কোনো প্রমাণ আজ অবধি পাওয়া যায়নি। এমন কোনো গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়নি, যাদের শুধু আবেগ-অনুভূতি আছে, চিন্তা-ক্ষমতা নেই। আমরা জানি সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নতুন নতুন প্রক্ষোভের জন্ম হয়েছে। নরনারীর রোমান্টিক প্রেমের অস্তিত্ব বহু আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া মানুষের দেশপ্রেমের (patriotism) সমার্থক কোনো অনুভূতি ছিল না। আজকের মানুষের প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং তা থেকে উদ্ভূত প্রক্ষোভ—আদিম মানুষের মনে দেখা দিতো না। আর আদিম বলে যুক্তিচিন্তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রক্ষোভ—এই তত্ত্বও টেকে না। বরং নতুন মানসিকতা পুরনোর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ও শক্তিশালী বলেই পুরনোকে হটিয়ে জায়গা দখল করে নিতে পারে।

মস্তিষ্কের পুরনো অংশ—থ্যালামাস, হাইপো-থ্যালামাস ও মস্তিষ্কবৃন্তে প্রক্ষোভের জন্ম ; তাই প্রক্ষোভ আদিম ও শক্তিশালী : এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। ম্যাসারমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রক্ষোভ মস্তিষ্কবল্কলেরই ধর্ম, নিম্নমস্তিষ্কের ধর্ম নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে হাইপোথ্যালামস ব্যবচ্ছেদ করার পরও প্রাণীর ভয় ও রাগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ম্যাসারমানের একটি পরীক্ষার বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি : একটি বেড়ালের হাইপোথ্যালামাসে ছোট ছোট তড়িৎবাহী শলাকা (electrode) প্রবেশ করার আট দশদিন পরে ইলেক্‌ট্রোডের মাধ্যমে হাইপোথ্যালামাসকে উত্তেজিত করা হলো। তার দেহে ক্রোধের সব লক্ষণই প্রকাশ পেলো, পিঠ ধনুকের মত বেঁকে গেল, গোঁ গোঁ শব্দ করে লেজ নাড়তে লাগলো, চোখের তারা বিস্ফারিত হলো, ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। আমরা সবাই জানি এগুলো ক্রোধের লক্ষণ। কিন্তু এই সব লক্ষন সত্ত্বেও, বেড়ালটা কিন্তু অন্যান্য উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারছিলো। আদর করে চাপড়ালে ঘড়ঘড় শব্দ করছিলো, খেতে

দিলে খাচ্ছিলো, এমন কি ইচ্ছুক সঙ্গী কাছে পেলে ভাব জমাবার চেষ্টাও করছিলো। বেড়াল রাগের লক্ষণ দেখালেও আসলে রাগেনি, ভয়ও পায়নি; একে বলে নকল রাগ বা sham rage। এরপর, বেড়ালটির সামনে একটা শিকারী কুকুর হাজির করা হলো। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উচ্চমস্তিষ্কে ভয়ের সঙ্কেত পৌঁছুতেই, আদরে ঘড়ঘড় করা, খাওয়া দাওয়া, 'প্রেম করা' ইত্যাদি সব কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। এবার সে সত্যিই ভয় পেয়েছে বোঝা গেল।* এই পরীক্ষা থেকে ম্যাসারমান সিদ্ধান্ত করলেন যে আসলে প্রক্ষোভের জন্ম মস্তিষ্কবল্কলে, নিম্ন মস্তিষ্কে নয়। জেম্‌স ল্যাঙ্গের (James-Langey, 1884-85) এবং ওয়াল্টার ক্যাননের (Walter Cannon : Bodily Changes in Pain, Hunger & Pain, 1915) বক্তব্য উপস্থিত না করলে প্রক্ষোভের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরের খণ্ডে মনোরোগ প্রসঙ্গে এঁদের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে রইলো।

মস্তিষ্কের টাইপ ও ব্যক্তিত্ব

মস্তিষ্কের টাইপ সম্পর্কে আলোচনার আগে দুটো কথা বলা দরকার। এক, পশুর বেলায় টাইপ-এর বৈশিষ্ট্য কিছুটা সহজাত ও অনড় হলেও, মানুষের বেলায় পরিবেশের প্রভাব ও সুপরিকল্পিত শিক্ষা দিলে 'টাইপ' বদলায়। দুই, বিশুদ্ধ টাইপ মানুষের ক্ষেত্রে খোঁজার চেষ্টা করো না, বা নতুন মানুষ দেখলেই তাকে টাইপের ছকে ফেলার চেষ্টা করো না, কেননা বিশুদ্ধ টাইপের মানুষ খুবই দুর্লভ। তাদের নাটকে গল্পে আমদানি করা চলে, বাস্তবজীবনে দেখা মেলে না। শেকসপিয়ারের সমসাময়িক নাট্যকার বেন জনসন বিশুদ্ধ টাইপের মানুষ নিয়ে দুটো নাটক লিখেছিলেন।** সে দুটো পড়লে আজও মজা লাগে। তিনি অবশ্যই হিপোক্রেটিসের টাইপের ধারণা থেকে নাটক লিখেছিলেন। পশু-মস্তিষ্কের 'টাইপ' নির্ণয়ে হিপোক্রেটিসের ধারা অনুসরণ করলেও, তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে, উচ্চমস্তিষ্কের কার্যকলাপের ভিত্তিতে টাইপের বিশিষ্টতা নির্ধারণ করেন। আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭৭ খৃ. পূ.) মানুষের মেজাজ অনুযায়ী তাদের চার ভাগে বিভক্ত করেন। যারা আশাবাদী আর সব সময়েই

* Masserman : Behaviour and Neurosis, (Chicago 1943 Chapt. 3 Referred by, Hurst. F. in The Neurotic, New York, 1954 p 44

** (১) Every Man In His Humour (২) Every Man Out of His Humour

হাসিখুসী—তাদের নাম দিয়েছিলেন প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguinous); মনে করেছিলেন এদের দেহে বোধ হয় Sanguin, মানে রক্ত বেশি। দ্বিতীয় দল, যারা সব সময়েই ঠাণ্ডা মাথায় নিজের কাজে মন দিতে পারে ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে পারে,—তাদের নাম দিলেন—আত্মপ্রতিষ্ঠ (Phlegmatic); ভেবেছিলেন, এদের দেহে মস্তিষ্ক নিঃসৃত flegma (শ্লেষ্মা)র আধিক্য আছে। চটপটে, বদমেজাজী মানুষের দেহে লিভারের হলদে পিত্তের (chole) আধিক্য আছে ভেবে তাদের নাম দিলেন রগ্‌চটা—কোলেরিক (Choleric)। আর মনে করলেন প্লীহার কালো পিত্তের আধিক্য যাদের তারাই বোধ হয় বিমর্ষভাবাপন্ন (Melancholic) মানুষ। Mela chole মানে কালো পিত্ত।

পাভলভ কুকুর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কতকগুলো অসুবিধায় পড়েছিলেন। কিছু কুকুরের বেলায় উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনা পর্বে নিয়ে আসা সহজসাধ্য হচ্ছিলো না, জটিল ও যৌগিক পরাবর্ত গঠন করতে গিয়ে আবার এক একটা কুকুরের স্নায়ুতন্ত্রে নিস্তেজনার আধিক্য দেখা যাচ্ছিলো। সেই অবস্থায় তাদের মধ্যে আবার বিপরীত ধরনের উপসর্গ দেখা দিচ্ছিলো। তাছাড়া, ব্যাপারগুলো ঠিকমত বুঝতে না পারলে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোও সম্ভব হচ্ছিলো না। এই সব তথ্যকে ব্যাখ্যার জন্যে পাভলভ নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এই সব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে টাইপ-তত্ত্বের জন্ম। খুব সংক্ষেপে পাভলভের বক্তব্য পেশ করছি।

মৌলিক স্নায়ুপ্রক্রিয়া—উত্তেজনা নিস্তেজনার তিনটি বিশেষ ধর্ম: মাত্রা (strength), ভারসাম্য (balance), গতিময়তার (mobility) বৈশিষ্ট্য ও মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন টাইপের সৃষ্টি। কথাগুলোর বোধ হয় ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'মাত্রা বা শক্তি' মানে মস্তিষ্ককোষের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা। উত্তেজনা ও নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার সমতা থেকে আসে স্থিতিস্থাপকতা বা ভারসাম্য। গতিময়তা উত্তেজনা থেকে নিস্তেজনা অথবা নিস্তেজনা থেকে উত্তেজনায় রূপান্তরণের মাপকাঠি।

শক্তিমাত্রার ভিত্তিতে পাভলভ প্রথমত সব প্রাণীকে সবল দুর্বল—এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করলেন। দুর্বল টাইপের মস্তিষ্কে সহক্ষমতার বিশেষ অভাব থাকে, পরিবেশের সামান্য চাপেই, উত্তেজনা কিছুটা বাড়লেই—তাদের ক্রিয়াকলাপে বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়। উত্তেজনার উপাদান মস্তিষ্কে কম, তাই উত্তেজনার মাত্রা বাড়ার ফলে আত্মরক্ষামূলক নিস্তেজনা নেমে এসে মস্তিষ্ককোষের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করে। এদের মস্তিষ্কের মধ্যে নিস্তেজনা প্রবাহ সহজেই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থাকার দরুণ এরা সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই টাইপের মানুষের বেলায় উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব দেখা যায়। স্বভাবতই এরা বিষণ্ণ, তাই এদের বলা হয় বিমর্ষ বা 'মেলানকলিক' টাইপ। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে এই টাইপেরই

আধিক্য। অপরপক্ষে সবল টাইপের মস্তিষ্কে উত্তেজনার উপাদান বেশি থাকে, তাই তারা উত্তেজনার মাত্রা অনেকটা অবধি সহ্য করতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে উত্তেজিত থাকলেও এরা ঘুমিয়ে পড়ে না, উত্তেজনার ফলে এদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না।

সব সবল প্রাণী কিন্তু একধরনের নয়। সবল প্রাণীর মধ্যে একদলের স্থিতিস্থাপকতা বা ভারসাম্য থাকে, আর এক দলের ভারসাম্য থাকে না। যাদের ভারসাম্যের অভাব তাদের নাম দিলেন রগচটা বা কোলেরিক টাইপ। এদের মধ্যে উত্তেজনা-নিস্তেজনার সমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। নিস্তেজনার ক্রিয়া এদের দুর্বল, নিস্তেজনার উপাদান এদের কম। কোলেরিক টাইপের মানুষ সাধারণত অতিমা-ায় উৎসাহী, আত্মবিশ্বাসের মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বেশি, প্রাণশক্তি কর্মশক্তিতে সব সময় যেন টগবগ করছে। এরা স্বভাবতই অসহিষ্ণু, অসংযত, অস্থিরমতি। এই টাইপের মানুষ সাধারণত নতুনত্বের সন্ধানী। আত্মবিশ্বাসের মাত্রাধিক্য এদের বেশির ভাগ সময়েই বিপজ্জনক কাজে প্রবৃত্ত করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এদের সাধ্যের অতীত কাজে প্রণোদিত করে, তাই এদের জীবনের পরিণতি প্রায়ই ট্র্যাজিক হয়ে থাকে। বল্গাহীন কর্মপ্রেরণা থাকার দরুণ এরা অনেক সময়ে যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। নিজের খেয়ালখুসীমত অপরিকল্পিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক সাফল্য লাভ করে, তারা নাদির শাহ, আলেকজাণ্ডার, কলম্বাস, ড্রেকের মত জগৎবিখ্যাত হয়ে থাকে।

যারা সবল অথচ যাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা নিস্তেজনার সমতা আছে, তাদের গতিময়তার কমবেশি অনুযায়ী দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্নায়ুপ্রবাহের গতিময়তা কম থাকলে, আগেই বলেছি, উত্তেজনা-নিস্তেজনার রূপান্তরণ সহজে ঘটে না, বেশ একটু সময় লাগে। একটা উত্তেজনার পরাবর্তের বদলে নিস্তেজনার পরাবর্ত গঠন করা এদের মধ্যে অসম্ভব না হলেও কিন্তু খুবই সময়সাপেক্ষ। এদের নাম দেওয়া হয়েছে ফ্লেগম্যাটিক টাইপ বা স্থিতিস্থাপক মানুষ। প্রায়ই এরা ঘাতসহ, অচঞ্চল, সংযমী। এরা উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। এই টাইপের মানুষের একই কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ। একই উদ্দীপক অনেকক্ষণ ধরে মস্তিষ্কে ক্রিয়া করলেও প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা নেমে আসে না। এরা চট করে বিষয়ান্তরে যেতে পারে না বটে, কিন্তু বিফলতা এদের উদ্যমকে কমাতে পারে না। কাজ করে ধীরে সুস্থে, প্রতিপদে ভেবে চিন্তে অনেক দিন ধরে কষ্টসাধ্য কাজ করার শক্তি রাখে এবং এরা দীর্ঘস্থায়ী গবেষণার কাজের উপযুক্ত। রবার্ট ব্রুস গবেষক না হলেও, বোধ হয় 'ফ্লেগম্যাটিক' টাইপের স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন।

এবার স্যাংগুইন টাইপের কথা বলছি। এদের সঙ্গে কোলেরিক টাইপের কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও, তফাতটাই বেশি। এদের মস্তিষ্কে উত্তেজনা-

নিস্তেজনার রূপান্তরণ সহজেই ঘটে। এরা এক সঙ্গে অনেক কাজে মন বসাতে পারে। এরাও উচ্চাভিলাষী, প্রাণশক্তিতে চঞ্চল, কিন্তু কোলেরিকদের মত মাত্রাজ্ঞানহীন নয়। আত্মবিশ্বাসী এরাও, কিন্তু হঠকারী নয়। নিজেদের ক্রোধাবেগ দমন করতে পারে, স্থানকাল পাত্র বিচার করে কাজ ও ব্যবহার করতে পারে। নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে এরা সজাগ, কিন্তু বাস্তবের বাধাবিপত্তি সম্পর্কেও সচেতন, কাজেই 'কোলেরিক'দের মত অপরিকল্পিত বিপজ্জনক কাজে জড়িয়ে পড়ে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা এদের খুব কম। শিল্পসংস্থার বড় কর্তা, রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে এই টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়।

টাইপ চারটিকে আরো সহজে বোঝাবার জন্য একজন বিজ্ঞানী এইভাবে চার্ট করেছেন :

	সবল			দুর্বল
	শান্ত	চঞ্চল	উচ্ছৃঙ্খল	দুর্বল
মাত্রা/শক্তি	সবল	সবল	সবল	দুর্বল
ভারসাম্য	সমঞ্জস	সমঞ্জস	অসমঞ্জস ও উত্তেজনা অধিক	অসমঞ্জস ও নিস্তেজনা অধিক
গতিময়তা	অনড়	গতিময়	গতিময়	অনড়/গতিময়
	ফ্লেগম্যাটিক	স্যাংগুইন	কোলেরিক	মেলানকলিক

আবার সাবধান করে দিচ্ছি। টাইপ নিয়ে বেশি মাতামাতি করো না। কোনো ব্যক্তিকে দুদিন দেখে টাইপ ঠিক করে ফেলো না। ঠকে যাবার সম্ভাবনা বেশি। বাড়িতে সকালে পড়াশুনোর সময় যাকে দেখে তোমার মনে হবে তার ফ্লেগম্যাটিক টাইপ, দুপুরে স্কুলে ব্লাক বোর্ডের সামনে অঙ্ক কষতে বললে তাকে হয়ত মনে হবে মেলানকলিক টাইপ, বিকেলে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলার সময় হয়তো মনে হতে পারে সে কোলেরিক। পরিবেশের সঙ্গে মেজাজ বদলায়। টাইপের অনেকখানিই পরিবেশের প্রভাব, তা বলে জন্মদত্ত প্রভাব কিছু নেই — তা বলছি না। উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষার সাহায্যে 'টাইপ'-এর বেশ কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব।

এতো গেল প্রধানত কুকুরদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় পাভলভ স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখে যে-সব টাইপের সন্ধান পেয়েছিলেন—তাদের কথা। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের সংযোজনের ফলে তাদের আবার দুটি বিশিষ্ট টাইপে ভাগ করা চলে। এর ফলে, 'টাইপ' নির্ধারণ বেশ জটিল ও কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চলতে গিয়ে, এবং

কিছুটা বংশগতির ফলে সব মানুষের মধ্যে দুটি সাংকেতিকতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে না। হয় প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি অতি বেশিমাত্রায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তবে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে দুটি তন্ত্রের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা, সামঞ্জস্য বজায় থাকে, অবশ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকে দ্বিতীয় তন্ত্র। যাদের প্রথম সাংকেতিকতন্ত্র অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে artist (শিল্পী) টাইপ ; আর philosopher (দার্শনিক) টাইপ তারা, যাদের দ্বিতীয় তন্ত্র বেশি জোরালো।

আর্টিষ্ট বলতে কি বুঝেছেন পাভলভ ? প্রথম তন্ত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস ইত্যাদির অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাইরের জগৎ আর্টিষ্টদের কাছে মূর্ত ও অখণ্ড কল্পনায় প্রতিভাত, ভাবাবেগে জীবন্ত ও রঙিন। আর দার্শনিক ব্যস্ত থাকেন বিমূর্ত চিন্তা আর ধ্যানধারণা নিয়ে, তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কারবার। এঁরা বিমূর্ত গাণিতিক সংকেতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণা করতে পারেন। সে-ধারণায় বাস্তবের প্রত্যক্ষ মূর্ত রূপ বা রঙিন ভাবোচ্ছ্বাস থাকার কথা নয়। প্রথমোক্তদের তুলির আঁচড়ে সমুদ্রের নীল, বনের সবুজ, রমণীর রূপ, উপোসী ভিখারীর শীর্ণ চেহারা রূপায়িত হয় ; তা দেখে অতি পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ অনুভূতি জাগে আমাদের। ব্যক্তিগত আবেদন থাকে এই সব অনুভূতিতে। আর দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের আবেদন ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির কাছে পৌছুবার নয়। অনুভূতি-আবেগকে এড়িয়ে এর আবেদন মননশীল মগজের কাছে। তথ্য থেকে তত্ত্বে উত্তরণ দার্শনিকের কাজ। ভ্যান গগকে যদি আর্টিষ্ট টাইপের প্রতিনিধি বলা হয়, তবে হ্যামলেটকে বলা যায় দার্শনিক টাইপের প্রতিনিধি।

এমনিতেই প্রাণীর নার্ভতন্ত্রের চার টাইপের প্রত্যেকটির দশ-বারোটা সাবটাইপ আছে। মানুষের দুই সাংকেতিকতন্ত্রের যে কোনটির প্রাধান্যের সঙ্গে ঐ সাবটাইপের যোগাযোগের ফলে সাবটাইপের সংখ্যা আরো অনেক হতে পারে। টাইপের আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে রোগনির্ণয় ও উপসর্গ বিচারের সময় আরো বিশদ ভাবে করা হবে। ব্যক্তিত্ব বিচারও সেই সময়ে করবো। বর্তমান অধ্যায় এখানেই শেষ করছি।

মানবমনের ক্রমবিকাশ

মানবমনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় অনিবার্যভাবে দুটি প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হয় প্রথমত, পশুমন থেকে মানবমনের বিবর্তন ; দ্বিতীয়ত, শিশুমন থেকে বয়স্ক-মনের সংগঠন। এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া মনের ক্রমবিকাশের সমস্যা সমাধান অসম্ভব। উনিশ শতকের প্রথম দশকে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে

জানা ছিল না বলে, ফ্রয়েড নৃতত্ব, জাতিতত্ব ইতিহাস থেকে এই দুই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করেন। লোকগাথা ও পৌরাণিক কাহিনীকে, বিশেষ করে রবার্টসন স্মিথের ভ্রান্ত-প্রমাণিত তথ্যকে আশ্রয় করে নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে তোলেন। আর পাভলভ চেষ্টা করেছেন মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে জানতে ও মানসিকতার বস্তুগত অধঃস্তর আবিষ্কার করতে। চতুর্থখণ্ডে এই দুই মহারথীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীর ধারণার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। এই খণ্ডে পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য ও সেই তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তত্ব থেকে মানবমনের ক্রমবিকাশের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। এবার যা বলবো, তার অনেক কিছুই তোমার জানা হয়ে গেছে। এবার মানবমনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের সারাংশ গুছিয়ে একজায়গায় পেশ করছি।

নিম্নপ্রাণী থেকে উচ্চতর প্রাণীতে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটে। ডারুইন ও তাঁর উত্তরসূরীদের এই অভিমতকে পাভলভ, এঙ্গেলসের মতো পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। পশুমন থেকে মানবমনের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ে পাভলভ পশু-ব্যবহার নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক দুই বিশেষজ্ঞের অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি তর্কযুদ্ধে নামেন। এঁদের একজন আমেরিকার ইয়েরকস্ (Yearkes), অন্যজন জার্মানীর কোয়েলার (Koehler)।

ইয়েরকস্-কোয়েলারের বক্তব্য ছিল এই রকম : শর্তাধীন পরাবর্ত-তত্ব দিয়ে কুকুরের ব্যবহার আমরা বুঝতে পারি বটে, কিন্তু বানর প্রজাতির জটিল ব্যবহারের ব্যাখ্যায় ঐ তত্ব অচল। শিম্পাঞ্জীদের ব্যবহার শুধু পরাবর্ত ও অনুষঙ্গের অধীন নয়, মানুষের এই নিকট জ্ঞাতি অন্তত আংশিকভাবে মানুষের অন্তর্দর্শন-ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা মানুষ ও উচ্চতর প্রাণীর অনায়াসলব্ধ স্বাভাবিকধর্ম। এ ধর্ম বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফল নয়। কুকুর নিয়ে পাভলভের পরীক্ষার ফলাফল অগ্রাহ্য করার উপায় ছিলো না, কাজেই তাঁরা বানরপ্রজাতিকে সম্পূর্ণ আলাদা এক শ্রেণীর পশু বলে অভিহিত করার চেষ্টা করলেন। বিবর্তনমূলক ব্যাখ্যা (অর্থাৎ শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষঙ্গের মননক্রিয়া বোঝাবার চেষ্টা) এক্ষেত্রে অচল। চৈতন্যের উন্মেষ ঘটে আকস্মিকভাবে, বিধিদত্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, এখানে মস্তিষ্কধর্ম প্রয়োগ করা চলে না।

কোয়েলার শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নিয়ে কিছু পরিক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেন এবং ইয়েরকসের এই অভিমত সমর্থন করেন। কোয়েলারের পরীক্ষানিরীক্ষা এই রকম : শিম্পাঞ্জীর নাগালের বাইরে কিছুটা উঁচুতে তার পরিচিত খাদ্য—সুস্বাদু কিছু ফল ঝুলিয়ে রাখা

হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার নাগালের মধ্যে একটা লাঠি ও কয়েকটি ছোটবড় বাক্স রাখা হলো। বলা বাহুল্য, শিম্পাঞ্জীকে ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছিলো। ফলগুলো পাবার জন্যে লাফ ঝাঁপ দিয়ে নাগাল না পেয়ে সে প্রথমে লাঠিটা দিয়ে ফলগুলো পেড়ে আনার চেষ্টা করলো। লাঠিটা ঐ ফল অবধি পৌছুলো না। কয়েকবার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বসে রইলো। তারপর উঠে ঝুলন্ত ফলের তলায় একটা বাক্স টেনে আনলো। বাক্সের ওপর দাঁড়িয়েও ফলে হাত গেল না। আরো দু'একটা বাক্স টেনে এনেও অভীষ্ট সিদ্ধ না হতে, সে বসে বসে ঝিমুতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে উঠে সব থেকে বড় বাক্সটাকে ঝুলন্ত ফলের তলায় রেখে, লাঠিটা নিয়ে বাক্সের ওপরে উঠে ফল পাড়তে গিয়ে বিফল হলো। আবার ঝিমুতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হঠাৎ উঠে একটার পর একটা বাক্স সাজালো, সব থেকে ওপরের বাক্সে উঠে লাঠি দিয়ে চেষ্টা করতে ফল তার আয়ত্তে এসে গেল। লাঠি ও বাক্সের সাহায্যে ফলগুলো করায়ত্ত করার চেষ্টা অনেকবার করার পর তবে সে সফল হয়েছিলো। এর থেকেও জটিল কাজ করার ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশের ক্ষমতা শিম্পাজী আয়ত্ত করতে পারে। সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কোয়েলার ও পাভলভ দুজনেরই ল্যাবরেটরিতে অনেক জটিল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। শিম্পাঞ্জীর সাফল্যের ব্যাপার নিয়ে এঁদের মধ্যে মতভেদ নেই। মতভেদ-ব্যাখ্যা নিয়ে।

কোয়েলার বললেন, শিম্পাঞ্জীর চেষ্টা ও ভুল (trial and error) তার বোকামির নিদর্শন। ফল পাড়ার মত জটিল ক্ষমতা আয়ত্ত করার সঙ্গে এই 'ট্রায়াল এ্যাণ্ড এররের' কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, তার চেষ্টা তার বোকামির নিদর্শন। চেষ্টা না করে যখন বসে বসে বা শুয়ে সে চিন্তা করেছে, তখনই সে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ফলের নাগাল পাবার উপায় তার চৈতন্যে অকস্মাৎ উদয় হয়েছে। সে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে।

পাভলভ এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারলেন না। কেননা, তাঁর বস্তুবাদী ধ্যানধারণায় এ ব্যাখ্যা অচল। তিনি র‍্যাফেল নামে একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে ঐধরনের অনেক জটিল কাজ করার পরীক্ষা চালিয়ে বললেন যে, কুকুরের শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের সাহায্যে শেখার সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর শেখার কোনো পার্থক্য নেই। মস্তিষ্কের স্বভাবধর্ম উত্তেজনা-নিস্তেজনা দিয়ে শিম্পাঞ্জীর এই ব্যবহার অনায়াসে বোঝা যায়। শিম্পাঞ্জী বসে ভেবে ভেবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলো— এই ধরনের অদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় না নিয়েই শিম্পাঞ্জীর এই বুদ্ধিবিকাশের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। চেষ্টা ও ভুল করতে করতে শিম্পাঞ্জী এই ক্ষমতা লাভ করেছে। তিনি একটি শিম্পাঞ্জীকে খাবারের বাক্সের ডালা খুলতে শিখিয়েছিলেন। ডালাগুলোতে নানা আকারের ছিদ্র ছিলো—গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ। ছিদ্রের আকারের ও মাপের লাঠি ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে চাপ দিলে ডালা খুলে যেতো।

একসঙ্গে অনেক মাপের ও অনেক আকারের লাঠি সামনে রেখে দিলে, শিক্ষিত শিম্পাঞ্জীটি সঠিক মাপের ও আকৃতির লাঠিটি বেছে নিয়ে ডালা খুলে খাবার সংগ্রহ করতে পারতো। ত্রিকোণ ছিদ্রবিশিষ্ট ডালা খোলার উপযোগী তিনকোণা লাঠি (আগাটা তিনকোণা) বেছে নিতে তার একটুও ভুল হতো না। ডালা পরিবর্তন করলে পাভলভের র‍্যাফেল পরিবর্তিত ডালার উপযুক্ত লাঠিটি বেছে নিতো। সে এই ক্ষমতা অর্জন করেছিল 'চেষ্টা ও ভুল' পদ্ধতিতে। এবিষয়ে পাভলভের মন্তব্য সরাসরি উপস্থাপিত করছি : *

ইয়েরকস ও কোয়েলার যে শিম্পাঞ্জীটির কার্যকলাপ উচ্ছ্বসিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার চেয়ে র‍্যাফেলের কার্যকলাপ কোনো অংশেই কম 'বুদ্ধিমত্তার' পরিচায়ক নয়। তাঁরা এ ধরনের কার্যকলাপকে বানরপ্রজাতির বিশেষ বুদ্ধির প্রকাশের নিদর্শন বলে মনে করেন। কুকুরের কার্যকলাপকে তাঁরা অনুষঙ্গপদ্ধতি নির্ভর মনে করেন, অথচ শিম্পাঞ্জীর কার্যকলাপকে তাঁরা অন্তর্দৃষ্টির ফল মনে করেন। কুকুর ও শিম্পাঞ্জীর কাজ শেখার মধ্যে তফাতটা কোথায় ? শিম্পাঞ্জীরা হাত এবং পা দুইই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে—এই হলো মৌল পার্থক্য। এর ফলেই তার পক্ষে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজে শেখা সম্ভব হয়েছে। সহজেই সঠিক লাঠিটি নির্বাচন করেছে, সেটি বেছে নিয়ে ডালার ছিদ্র পথে ঢুকিয়ে ডালা খুলতে শিখেছে। শিম্পাঞ্জীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা উন্নত ধরনের হওয়াতে (কুকুরের তুলনায়), তার সাফল্য-পথ অনেক সুগম হয়েছে। কুকুরের হাত না থাকাতে, চেষ্টাবহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উন্নত না হওয়াতে, এই ধরনের জটিল কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। র‍্যাফেলের সমগ্র কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে বলা চলে যে, যেখানেই আমরা তার আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি, সেখানেই দেখেছি যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় কুকুরের বেলায় দেখা যায়নি—এমন কোনো কিছুই তার মধ্যে আমরা পাইনি।

কি ঘটেছে ? শর্তহীন উদ্দীপক খাদ্য, শিম্পাঞ্জীর মধ্যে প্রথম সাংকেতিক-তন্ত্র-নির্ভর কতকগুলো পরাবর্ত গঠন করে সেগুলোকে সুসমন্বিত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় দাঁড় করিয়েছে। শিম্পাঞ্জীর চেষ্টাবহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক উন্নত ধরনের হওয়ার দরুণ পরাবর্তগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের হয়ে উঠেছে। নানারকমের এলোপাথাড়ি চেষ্টার ফলে শিম্পাঞ্জী এই নির্দিষ্ট সমন্বিত কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আয়ত্ত করার আগে অনেক ভুলত্রুটী ঘটেছে। তারপর অভীষ্ট সিদ্ধি অর্থাৎ খাদ্য হাতে পাবার সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট পরাবর্তগুলো

* 'বুধবারের' আলোচনায় বর্ণিত ; মানবমন ১৯৬২, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা দেখুন।

সংগঠিত হবার পর নতুন ক্ষমতা লাভ করেছে, তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।
এই ক্ষমতা মস্তিষ্কবল্কলের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠেছে।... র‍্যাফেলের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পাভলভ আরো বলেছেন : চতুষ্কোণ ছিদ্র বিশিষ্ট ডালা খোলার কাজে অনেকগুলো তিনকোণা লাঠির সঙ্গে শুধু একটিমাত্র চারকোণা আগার লাঠি রাখা হলো, তখন র‍্যাফেল ভুল করে চারকোণা লাঠির বদলে একটা তিনকোণা লাঠি বেছে নিল। পরপর তিনবার একই ভুল করার পর চতুর্থবার সে সঠিক লাঠিটি টেনে নিতে শিখলো।* পরীক্ষাটি আর একবার করা হলে র‍্যাফেল দুবার ভুল করলো। এইভাবে পরীক্ষা ও ভুল কয়েকবার করার পর, অনুরূপ পরীক্ষার সময় চারকোণা লাঠিটা একগাদা লাঠির বাণ্ডিলের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও, সেটিকে ঠিক খুঁজে বের করতে পারলো। এবার আর ভুল করলো না।

এই কাজ শেখার ব্যাপারে মস্তিষ্কবল্কলের বিশ্লেষণী অঞ্চল ও নিস্তেজনা স্নায়ুপ্রক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। পরিবেশের অপ্রয়োজনীয় উপাদান বর্জনে সহায়তা করে নিস্তেজনাধর্ম। একশো ওয়াটের আলোর সঙ্গে কুকুরের পরাবর্ত গঠনের সময় এই একই ধরনের স্নায়ুপ্রক্রিয়া ঘটে। সুতরাং কুকুরের বুদ্ধি নেই আর শিম্পাঞ্জী অন্তর্দৃষ্টির ফলে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী—কোয়েলারের এই দাবীর কোনো ভিত্তি নেই। দুজনের ক্ষমতাই অনুষঙ্গ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে। শিম্পাঞ্জী বিবর্তনের ফলে উঁচুতলায় উঠে গেছে, তাই তার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত উঁচুদরের হয়েছে। ......রহস্যময়তা তাঁরা কতই না ভালবাসেন। সম্ভাব্য শারীরবৃত্তমূলক ব্যবস্থার ধার দিয়ে তাঁরা যেতে চান না। আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন ধরে লাঠি চেনার ব্যাপারে, র‍্যাফেলকে যখন কাজগুলো করতে হয়েছিলো, তার মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী অঞ্চল তাকে সাহায্য করছিলো। সঠিক লাঠিটি বেছে নেবার আগে তার ক্রিয়াকলাপে ছিল বিশৃঙ্খলার অভিব্যক্তি। আমরা যদি বাস্তবার্থজ্ঞাপক কোনো কথা প্রয়োগ করতে চাই, তবে 'ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরর'—এই মার্কিন কথাটির পরিবর্তে 'বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া' কথাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন।......কুকুর ও বানরপ্রজাতির মননক্রিয়ার প্রভেদ কল্পনা করার প্রবণতা সমস্যাটিকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে রহস্যময় ও অসাধারণ প্রতিপন্ন করার মানসিকতা থেকে উদ্ভূত। সত্য থেকে বিচ্যুত হবার ফলে ইয়েরক্স্ ও কোয়েলার নানা বন্ধ্যা ধারণাকে আঁকড়ে ধরেছেন,—যেমন, শিম্পাঞ্জীটি 'মানুষের মত অবসর সময়ে চিন্তামগ্ন হলো', অথবা 'একটি সমাধান আবিষ্কার করলো'—ইত্যাদি। আমাদের এরকম অনেক

---

* মানবমন, ১৯৬২ ; দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ ৪-৬

ঘটনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় আছে। একটি কুকুর কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার চেষ্টা করেও সম্পন্ন করতে পারছে না, দুদিন চেষ্টা না করে সে বিশ্রাম নিলো, তার পরদিন সহজেই ঐ কাজটি সম্পন্ন করতে পারলো। এরকম অনেক ঘটনা আমাদের জানা। এখানে আমরা কি বলতে পারি যে, কুকুরটি ঐ দুদিন ধরে সমস্যাটি সমাধানের উপায় চিন্তা করছিলো। অবশ্যই পারিনা। ক্লান্তির জন্য মস্তিষ্কে নিস্তেজনার সঞ্চার হয়েছিলো, ফলে সবকিছুতেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিলো, সব কিছুই দুরূহ হয়ে উঠেছিলো। বিশ্রাম এই ক্লান্তি দূর করে মস্তিষ্কে শর্তহীন ও শর্তাধীন উদ্দীপকের দরুণ উত্তেজনার সংযোগ ঘটিয়ে (যে উত্তেজনাপ্রবাহ তার বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার ফলে আগেই সৃষ্ট হয়েছিলো) নতুন পরাবর্ত সংগঠনে সাহায্য করেছে। একজন সহযোগী আমাকে একদিন বলেছিলেন—নতুন সঙ্গীত রচনার সময় সুরকাররা প্রায়ই যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েন, তাঁদের চেষ্টা সফল হতে চায় না, যত বেশি চেষ্টা করেন, জটিলতা ততই যেন বাড়তে থাকে। গভীর হতাশায় কিছু দিনের মত এঁরা চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকেন। পরে আবার চেষ্টা সুরু করে অল্পায়াসে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁরা নতুন সুর সৃষ্টি করতে পারেন। এর ব্যাখ্যা হল—অনুশীলনের ফলে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সেই ক্লান্তিই সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্রামের ফলে ক্লান্তি দূর হয় এবং সফলতা আসে। শিম্পাঞ্জী সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই যে, তাদের জটিল আচরণ অনুষঙ্গ ও বিশ্লেষণের মিলিত ফল : একেই আমি উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার ভিত্তি মনে করি। এ পর্যন্ত তার আচরণে এর বেশি কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের নিজেদের চিন্তাধারা সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এখানেও অনুষঙ্গের বেশি আর কিছুই নেই।*

পশুমন থেকে মানবমনের বিবর্তন নিয়ে পাভলভীয়দের বস্তুবাদী ধারণার নানাদিক নিয়ে অনেক কথা বলা হলো। বহুকাল যাবৎ মানবমন ভাববাদীদের দুর্গে বন্দী ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে দেহ-মন, বস্তু-ভাব, জৈব-প্রয়োজন কান্তিবিদ্যার (aesthetic) মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। মানবজাতির প্রধান ঐতিহ্য হিসেবে এ ধারণা পুরুষানুক্রমিকভাবে আমাদের মধ্যে প্রবহমান। সুসংগঠিত সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান দ্বয়বাদী দর্শনের পরিপোষক। বিজ্ঞানীরাও যদি এ ধারণার প্রভাবমুক্ত না হতে পারেন, তবে মনোবিদ্যা চিরদিনই প্রারম্ভিক বিবরণমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকবে, মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটবে না। পাভলভ অন্তর্দৃষ্টিবাদীদের (শুধু ইয়েরকস্ ও কোয়েলার নন, এখনও অনেক মনস্তাত্ত্বিক এই ধরনের মতবাদ পোষণ করেন) তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মস্তিষ্ক-

---

* Ibid পৃ: ৭-৮

ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত প্রসঙ্গে অনুষঙ্গ ও বিশ্লেষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) সংকেতে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের উত্তেজনা ঘটে; বিভিন্ন কেন্দ্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতার দরুণ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংকেত নির্দিষ্ট অংশে উত্তেজনা ঘটায়, নিস্তেজনা ধর্মের দৌলতে অন্যান্য অংশের উত্তেজনা হ্রাস পায়। তখন কেবলমাত্র উত্তেজিত অংশগুলোর সংযোজন ঘটে ও ফলে চেষ্টাবহ স্নায়ু (motor nerve) উদ্দীপ্ত হয়ে পেশী ও গ্রন্থির সংকোচন ঘটায়। শিম্পাঞ্জী অভীষ্ট ফল লাভ করে। পাভলভের বক্তব্য বারবার তোমাকে শোনাচ্ছি, কেননা আমাদের সকলের মত তুমিও পুরনো সংস্কার থেকে পুরোপুরি মুক্ত নও: তোমার ভাববাদী ধারণার অবস্থান কেন্দ্রগুলোকে নিস্তেজিত করতে হলে, বারবার পাভলভীয় ধারণার উত্তেজনা তোমার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার।

সব প্রাণীর মধ্যে দুধরনের মৌলিক চিন্তাপদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন পাভলভ। (১) কাজের মধ্য দিয়ে চিন্তা (thinking in action)—এসময় বহির্বাস্তবের ঘটনা ও বস্তুর সংজ্ঞাবহ প্রতিবিম্ব (sensory image of objects and events in external reality) নিয়ে সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ চলে: (২) স্মৃতির প্রতিবিম্বমূলক চিন্তা (thinking in memory image)—এ সময় বহির্বাস্তবে ঘটনা ঘটছে না, বস্তুও চোখের সামনে নেই। শুধু মস্তিষ্ককোষে আগেকার সংবেদনের চিহ্ন ও রেশ রয়ে গেছে। এই স্মৃতির প্রতিবিম্ব নিয়েও শিম্পাঞ্জীর সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ চলে। 'চেষ্টা ও ভুল'-এর মাধ্যমে সঠিক যে পথটি মস্তিষ্কে তৈরী হয়েছে, সেটি ভুল পথগুলোকে মুছে দিয়ে স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠে: আমরা তখন বলি—চিন্তার ফলে শিম্পাঞ্জার বুদ্ধি খুলেছে। এই 'thinking in memory images'-কেই কোয়েলার অন্তর্দৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁর যাই থাক, পাভলভ তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন—কোয়েলার মজ্জায় মজ্জায় সর্বপ্রাণবাদী (animist)। তাঁকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, তাঁর 'আত্মাকে' ল্যাবরেটরীতে এনে তার ক্রিয়াপ্রণালীর নিয়ম-শৃঙ্খলার সন্ধান সম্ভব।

এবার শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাভলভের ধারণা বিবৃত করছি। মানবশিশু কতকগুলো শর্তহীন পরাবর্ত (চোষা, গেলা, মলমূত্রাদি ত্যাগ ও আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি ইত্যাদি) নিয়ে জন্মায়। কিন্তু প্রথম থেকেই সংবেদন ছাড়া এই পরাবর্তগুলো ক্রিয়াশীল হতে পারে না। ঠোঁটে কোনোকিছু ছোঁয়ালে তবেই শিশু চোষার চেষ্টা করবে, মুখের ভেতর কিছু গেলে তবেই গেলার প্রশ্ন আসবে। তুমি জানো সংবেদন কি। সংবেদন মানসিক বিকাশের প্রথম ধাপ। এ-ছাড়া আমরা জানি, খোঁচা দিলে সব শিশুই আহত প্রত্যঙ্গটি সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে, চোখের কাছে কোনো কিছু নিয়ে গেলে চোখ বুঁজিয়ে ফেলবে। হাত-পা চেপে ধরলে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে, না পারলে

কেঁদে লোক জড়ো করবে। এ সবই আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিমূলক পরাবর্তক্রিয়া।

প্রথম বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে সংবেদন থেকে। জন্মের পর কয়েকদিন বাইরের বস্তু সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না, থাকে শুধু সংবেদন ও শর্তহীন পরাবর্তের অভিব্যক্তি। কিছু দিনের মধ্যেই বাইরের নানারকমের সংকেতের সঙ্গে শর্তহীন পরাবর্তের অস্থায়ী যোগাযোগ ঘটতে থাকে। প্রথম দিকটায় এলোমেলো ভাবে সংযোগ ঘটতে থাকে। কতকগুলো সংকেত বারবার মস্তিষ্কে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, কতকগুলো করে না। যে-গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে না, তাদের দরুণ যোগাযোগ ক্রমশ নিস্তেজিত হয়ে মিলিয়ে যায়, পুনরাবৃত্তি সংকেতের দরুণ সংযোগসূত্র ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। দুধের বোতল, ঝিনুক, মায়ের কণ্ঠস্বর, স্পর্শ, ইত্যাদি উদ্দীপক ক্রমশ পুনরাবৃত্ত হতে হতে সুদৃঢ় পরাবর্তে পরিণত হয়; পরে আরো দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ ও ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত হবার ফলে একটা গতিময় বাঁধাধরা ছাঁচ গড়ে ওঠে। এখন গ্রাহক-প্রান্ত উত্তেজিত হলেই মস্তিষ্কের এই গতিময় সংযোজন প্রণালী ক্রিয়াশীল হয়। সংবেদন এখন প্রত্যক্ষণে রূপান্তরিত হয়ে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছেছে। সদ্য গড়ে ওঠা সংযোজক প্রণালী বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। শিশু এখন সংকেত-গুলোর আপেক্ষিক বিচার ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে সক্ষম। বোতল থেকে আর মায়ের বুক থেকে পাচ্ছে— দুধ; এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শিশুমনে। একটা লাল ফুল ও একই আকারের লাল বলের পার্থক্য ও ঐক্য নির্ণয়ও এই পর্যায়ে পড়ে। মা ও মায়ের মত দেখতে মেয়েদের চেহারার পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়-চেষ্টা অভিযোজনের পক্ষে খুবই দরকারী। এরপর সুরু হয় নতুন সংকেতের সঙ্গে পুরনো সংকেতের তুলনামূলক বিচার, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন। সংশ্লেষণের ফলে নতুন সংযোজন ঘটে। শিশুর মধ্যে এই সময় প্রক্ষোভের বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্যে ক্রিয়াশীলতার প্রকাশ দেখা যায়। বোতল, চুষি, লাল কাগজের ফুল ইত্যাদি—যা সামনে আনা হয়, তা-ই ধরবার চেষ্টা করে, মাকে ও ঐরকম দেখতে মেয়েদের হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

পুরনো অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অভিজ্ঞতার বিচার, বিশ্লেষণ ও সম্পর্ক স্থাপনের পরিধি যত বিস্তৃত হতে থাকে, বহির্বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানও তত বাড়তে থাকে।

কথা বলার ক্ষমতা লাভের আগে মানবশিশু ও উচ্চপ্রাণীর উপলব্ধি সংক্রান্ত নার্ভতন্ত্রের প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম ভাবে চলতে থাকে। দুজনের পরিবেশের মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য। মানব-সমাজ, বিশেষ করে নিজের পরিবারের মধ্যে মানবশিশু বড় হবার দরুণ সমাজ ও পরিবারের রীতিনীতি, ব্যবহার ও ভাবাবেগের অংশীদার হতে থাকে। প্রথম সাংকেতিকতন্ত্রই এ-অবধি

শিক্ষা ও অভিযোজনের একমাত্র পদ্ধতি। বাক্‌শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিশু প্রথমে কথা বুঝতে শেখে, তার পর বলতে শেখে। এই থেকে সে সত্যিকারের মানবীয় উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করে। ভাষাভিত্তিক পরাবর্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঘটায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাক্‌স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে উপলব্ধি-ক্ষমতার মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পশু ও কথা ফোটেনি এমন শিশু—কোনো বস্তুর যে-কোনো একটি গুণ, বিশ্লেষণের সাহায্যে আলাদাভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু সেই গুণকে বিমূর্ত করে অন্য বস্তুর ওপর আরোপ করতে পারে না। শেখালে, লাল-কাল-নীল তিন রঙের গুলি থেকে যে কোনো একটি রঙের গুলিকে চিনে আলাদা করতে পারে। কিন্তু এর ফলে, লালকাঠি বা লাল ফুলকে অন্য রঙের কাঠি বা ফুল থেকে চিনে আলাদা করতে পারে না। গুলির লাল রঙকে সে অন্য কোনো জিনিষের লাল রঙের সঙ্গে মেলাতে অক্ষম। বুঝতে পারে না যে দুটো জিনিষের রঙ এক। বস্তুর কোনো গুণ বা ধর্ম অন্য কোনো বস্তুতে আরোপ করতে পারার প্রধান শর্ত হলো সেই গুণকে বস্তু থেকে বিমূর্ত করা। দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এ ক্ষমতা লাভ অসম্ভব। কথা বোঝে এমন শিশুকে তুমি যদি লাল গুলি আর লাল ফুল দেখিয়ে 'লাল' কথাটি বারবার বলো, তাহলে 'লাল' শব্দটি বস্তুর 'লালত্বকে' বিমূর্ত করবে। যে-কোনো জিনিষের লাল রঙ সে চিনতে পারবে। এক প্যাকেট তাস দিলে 'রুইতন' ও 'হরতন'কে আলাদা করে গুছিয়ে নিতে পারবে। রঙের বেলায় যেমন ঘটবে, বস্তুর অন্যান্য গুণের,—যথা, গন্ধ, আকার ইত্যাদির, বেলাতেও ঠিক তেমনি ঘটবে। কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে শব্দহীন একটি সংকেত অজস্র সংকেতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। শিশুর জ্ঞান ও অভিযোজন ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। শিক্ষার সুযোগ এখন আর সীমিত নয়। বহির্বাস্তবের জটিলতা অনুধাবনের ক্ষমতা লাভ করেছে শিশু।

মানবমনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কোনো একটা ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ক্ষমতা, প্রাণীবিশেষে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বিকাশ লাভ করতে পারে, কিন্তু পশু কোনো বস্তুর একটি গুণ অপর বস্তুতে আরোপ করতে পারে না। ঈগল পাখীর দৃষ্টিশক্তি ও কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বিকশিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপলব্ধি ক্ষমতা মানুষের সমান নয়। ভাষার দৌলতে মানুষ শুধু যে বস্তুর গুণাবলী বিমূর্ত করে তুলতে পারে তাই নয়, গুণধর্ম অনুযায়ী বস্তুর বিবরণ দিতে পারে, বস্তুকে প্রণালীবদ্ধ করে তাদের গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার করতে পারে, বস্তুর ও ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারে, এবং দরকার হলে পরিবর্তন ঘটাতেও পারে। এই দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের ক্রম-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়লব্ধ উপলব্ধি বা জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও সম্মার্জন ঘটতে থাকে শিশুমনে। ক্রমশ তার ধ্যানধারণা,

বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা বাড়ে, নিজের পরিচয় ও ভূমিকা বুঝতে থাকে, সামাজিক জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে সামাজিক মানুষ হবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়।

সভ্যতার যে-কোনো স্তরে, যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ভাষাকে আশ্রয় করে শিশু বেড়ে উঠুক না কেন, বাচনভিত্তিক উপলব্ধির ক্ষমতা সে আয়ত্ত করবেই—অবশ্য সে যদি সুস্থ থাকে। তবে উপলব্ধির মাত্রা নির্ভর করবে প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর। প্রথমত,—যে সমাজে শিশু বেড়ে উঠছে, সেই সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির মান ও দ্বিতীয়ত,—শিশুর পরিবেশের জটিলতা ও আকস্মিক ঘটনা। এর কোনোটাই কিন্তু বিধিদত্ত বা নিয়তি-নির্ধারিত নয়। এ সবেরই পরিবর্তন সম্ভব। পিছিয়ে থাকা সভ্যতাকে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অনেক আকস্মিক ঘটনার প্রতিবিধান প্রতিকার করতে পারে, আর বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সাহায্যে অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশের পরিবর্তন করা যায়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিবেশ সম্প্রসারিত ও জটিলতর হতে থাকে। মা-পিসীর আওতা থেকে নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন, সেখান থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কিংবা কর্মস্থল। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির ক্ষমতাও বাড়ে। হাজার হাজার পুরনো পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ে, নতুন নতুন অনেক পরাবর্ত গড়ে ওঠে, জ্ঞান বাড়ে, চৈতন্য বিকাশলাভ করে।

মানবমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাভলভীয় এই ধারণা গড়ে উঠেছে তাঁর ও তাঁর উত্তরসূরীদের বহু বছরের গবেষণার ফলে, হাজার হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যকে ভিত্তি করে। দূরকল্পনা ও অনুমানভিত্তিক নয় এই ধারণা। মানবমনের অতি জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়াকলাপের অনেক দিকই এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অধঃস্তর মস্তিষ্কের বহু ধর্মই এখনও অনাবিষ্কৃত, লক্ষ লক্ষ মস্তিষ্ককোষের চার শতাংশের বেশি আমরা ব্যবহার করতে পারিনা—একথা আমার জানা। তা সত্ত্বেও, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, পাভলভ কর্তৃক পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হবার ফলে মনোবিজ্ঞানের অগ্রগমনের বাধা বহুলাংশে অপসারিত হয়েছে এবং নতুন নতুন গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

মানব মনের ক্রমবিকাশ

বংশগতির ও পরিবেশের প্রভাব

(ক)

বংশগতি

আধুনিক বংশগতিবিদ্যা ও জিনসংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান নিয়ে বিশদ আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নয়। সংক্ষেপে বংশগতি ও জিনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছি।

মানবজীবনের শুরু হয় মাতৃগর্ভে ডিম্বকোষ শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হবার পরমুহূর্ত থেকে। নিষিক্ত ডিম্বকোষটি প্রথমে দুভাগ হয়ে দুটি কোষ হয়, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি—এইভাবে বিভাজনক্রিয়া চলতে থাকে। ক্রমশ কিছু কিছু কোষ আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশিষ্টতা লাভ করতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে দেহের বিভিন্ন সংস্থার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আভাস ফুটে ওঠে। আঠারো দিনের মাথায় ক্ষুদে হৃৎপিণ্ডের মৃদু স্পন্দন শোনা যায়, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে শুরু হয় চোখ, মেরুদণ্ড, স্নায়ুসংস্থা, ফুসফুস ইত্যাদির প্রাথমিক বিকাশ। এগারো সপ্তাহের মধ্যে দেহের সব কটি প্রত্যঙ্গ ও সংস্থার বিন্যাস ও ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়ে যায়। ন মাসের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং আমৃত্যু মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া বংশগতির ধারা অনুসরণ করে শিশুর বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এখানেই বলে রাখা দরকার বংশগতির ধারা মানুষের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত কোনো ছক বেয়ে চলতে পারে না। পরিবেশ-প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই ধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। এছাড়া, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মানুষ তার শৈশব থেকে বার্ধক্যের পথপরিক্রমায় পরিবেশকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে তার বংশগতির ধারাক্রমিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকেও বদলায়; কখনও পরিকল্পিতভাবে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে, কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। বংশগতি, পরিবেশ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক প্রভাব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা সবাই মানব প্রজাতির বিশেষ কতকগুলি সনাক্ত-সম্ভব সাধারণ চিহ্নদ্বারা ভূষিত আর প্রত্যেকেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। এই পরম বিস্ময়কর রহস্য সম্পর্কে আজ আমরা পরীক্ষালব্ধ অনেক তথ্য ও জ্ঞানের অধিকারী।

কোষ-এর (বেশির ভাগ) দুটি অংশ—মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াস ও তার চারদিকের জলীয় পদার্থ 'সাইটো-প্ল্যাজম'-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে অনেক বছর আগে। নিউক্লিয়স-এর মধ্যে ছোট ছোট লাঠির মত দেখতে ক্রোমোজোম-এর অবস্থান। এরা জোড়া বেঁধে অবস্থান করে। কোনো প্রাণীর থাকে ৪ জোড়া, কারুর ১০ জোড়া, মানুষের আছে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোম আবার এক বিশেষ ধরনের বড় বড় ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর সমষ্টি। সংক্ষেপে ডি. এন. এ নামেই এরা পরিচিত। দুগাছা পাকানো দড়ির মত এই অণুগুলি স্ক্রু র মত পরস্পরকে পেঁচিয়ে আছে বলে মনে হয়। অনেকটা দড়ির মই-এর চেহারা। সব প্রাণীর বংশগতির সংকেত এই ডি. এন. এ-র মধ্যেই লিপিবদ্ধ। ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতিটি জোড়ার একটি আসে মায়ের কোষ থেকে, অন্যটি পিতার। নতুন শিশু উৎপাদনের, তার ক্রমবর্ধনের সবকিছু নির্দেশ রয়েছে ঐ সংকেতলিপিতে। ক্রোমোজোমের এই জিন, এককভাবে বা অন্য জিনের সংগে মিলে দেহের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সৃজন ও বর্ধনের নির্দেশ বহন করে। চোখের তারার রং, চুলের রং ও গড়ন, রক্তের বিশেষ টাইপ, এই রকম প্রতিটি বিশেষ গুণের জন্য আলাদা আলাদা জিন দায়ী। এছাড়া আমরা জানি মানুষের 'জিন' কেবলমাত্র মানবিক গুণের ধারক ও বাহক। পিতা-মাতার সমানসংখ্যক ক্রোমোজোমের জিন নিষিক্ত ডিম্বকোষের মধ্যে থেকে সংকেতলিপির নির্দেশে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে, আর এই বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমও দ্বিগুণ হয়, প্রতিটি বিভাজিত কোষে উৎস-কোষের মতই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম তাদের নির্দিষ্ট জিন-সন্নিবিষ্ট হয়ে সেই কোষটিকে সংকেত-লিপির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করে। আগেই বলা উচিত ছিল যে পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বকোষে তেইশ জোড়ার পরিবর্তে তেইশটি করে ক্রোমোজোম থাকে। কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে প্রকৃতির এই বিশেষ ব্যবস্থার দৌলতে নিষিক্ত ডিম্বকোষে ৪৬ জোড়ার পরিবর্তে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকার দরুণ পরবর্তী বিভাজন ও ক্রমবৃদ্ধি সুশৃঙ্খল ভাবেই ঘটে। কোন ক্রোমোজোম বংশগতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, সেটা অনেকখানি আপতনিক ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মাতাপিতার মিলনের ফলে ক্রোমোজোমের সংযুক্তি ৮০ লক্ষ বিভিন্ন রকমের যে কোন একটি হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য অজস্র রকমের হতে পারে। এছাড়া নিষিক্ত ডিম্বকোষ একই প্রলক্ষণদায়ী জিন (মাতা ও পিতার তরফের) জোড়া বাঁধে ; চোখের রং নির্ধারণকারী দুতরফের জিন যদি দুরকমের (বাদামী ও নীল রং) হয়, তবে সন্তানের চোখের রং বাদামী হবে ; কেননা এই জিনটি বেশি প্রভাব-শালী। এদের বলা হয় 'ডমিন্যান্ট' (dominant) জিন। নীল রং প্রদায়ী জিনটি কিন্তু নবজাতকের ক্রোমোজোমের অঙ্গীকৃত হয়ে আপাত নিস্তেজিত অবস্থায়

থাকবে। এদের বলা হয় 'রিসেসিভ" (recess ve) জিন। পরে নীলচোখের কোনো ব্যক্তির সংগে এই জাতকের মিলনের ফলে তাদের সন্তানের চোখ নীল হবে। এইভাবে মাতাপিতার মধ্যে পরিদৃশ্যমান নয়, এমন কোনো প্রলক্ষণ সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তেজী ও নিস্তেজিত জিন সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

কী ভাবে ডি. এন. এ-র সংকেতলিপি অনুযায়ী কোষবৃদ্ধি, বিশের ধরনের কোষসৃষ্টি ও দেহের যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সংস্থা গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার।

এখন জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ জিন বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংবাদবাহী আর. এন. এ. (রাইবোনিউক্লিক এ্যাসিড)-এর মাধ্যমে প্রোটিন-সংশ্লেষণের এই সংকেতবার্তা প্রেরিত হয়। প্রোটিন জীবের সংগঠক-একক – বলা চলে ইমারতের বিল্ডিং ব্লক্স্ (building blocks)। আর. এন. এ. ও ডি. এন. এ-র মত নিউক্লিওটাইডের একটি শিকল ; তবে এখানে ডি-অক্সিরাইবোজের বদলে রাইবোজ থাকে। ডি. এন. এন-তে দুটো শিকল পরস্পরকে জড়িয়ে আছে ; আর. এন. এ.-তে থাকে মাত্র একটি শিকল। নিউক্লিয়সের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত নিউক্লোলিয়স আর. এন. এ. উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে বিজ্ঞানীদের এই রকমই ধারণা। উৎপন্ন হবার সংগে সংগে আর. এন. এ-কোষের ভিতরকার তরল পদার্থ সাইটোপ্লাজমে চলে আসে। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা হয় : ডি. এন. এ- থেকে আর. এন. এ. তৈরি হয়, আর. এন. এ. থেকে তৈরি হয় প্রোটিন (D. N. A. makes R. N. A. and R. N. A. makes protein)। 'জেনেটিক কোড' বা বংশগতির সংকেতবার্তা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছি আমরা ১৯৫৭ সালের পর। এই সময় ল্যাবরেটরীতে প্রথম ভাইরাস-এর একটি ডি. এন. এ সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছিল। দেখা গেল, এই সংশ্লেষিত ভাইরাস ডি. এন. এ প্রকৃতিজ ভাইরাসের মত ব্যাকটিরিয়াকে সংক্রামণে সক্ষম। জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং বিদ্যার সূত্রপাত কোরনবার্গ ও তাঁর সহকর্মীদের এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষার সাফল্যের পর থেকে।

এখন আমরা জানি, পরিব্যক্তি (mutatiou) ডি. এন এ-র মৌল রাসায়নিক উপাদানে পরিবর্তন ঘটায়—বাড়তি কিছু যোগ করে, কিছু বিয়োগ বা হ্রাস করে। হয়তো বংশগতির সংকেতলিপিতেই ত্রুটি থাকে, অথবা সংকেতের কিছু অংশ হারিয়ে যায় কিংবা পাঠোদ্ধারে ভুল হয়। ফল প্রায়শই মারাত্মক। এক ধরনের রক্তাল্পতারোগ ছাড়া আরো দু'চার রকমের খারাপ অসুখ ঘটে পরিব্যক্তির ফলে। ভুল খবর পাঠানোর ফলে কোষবৃদ্ধি হয়তো আর থামলোই না ; গড়ে উঠল না বিশেষ ধরনের কোষ বা সংস্থা ; একই ধরনের কোষ বাড়তে

বাড়তে দেহের অন্যান্য অংশ ও যন্ত্রপাতিকে আচ্ছন্ন করে তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিল। কর্কট রোগ যে ডি. এন. এ., আর. এন. এ.-র ভুল বোঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খল আচরণের ফল এ অনুমান বোধহয় শীঘ্রই পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

ডি. এন. এ. কোষ নিউক্লিয়াস এর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যেতে চায় না। নিজের অঙ্গ থেকেই প্রায় দোসর সৃষ্টি করে জীবদেহের সব কাজকর্ম চালাবার ব্যবস্থা করে। এই দোসরই আর. এন. এ। বার্তাবাহী বা দূত আর. এন. এ -র কথা আগেই বলেছি যার কাজ প্রোটিন তৈরি। আর এক ধরনের আর. এন. এ. এই কাজের সহায়তা করে ঠিক ঠিক অ্যামিনো অ্যাসিডটি বাছাই করে প্রোটিন তৈরির জায়গায় স্থানান্তরিত করে। এদের নাম স্থানান্তরকারী বা ট্রানসফার আর. এন. এ। সংকেতলিপি অনুযায়ী সঠিক নির্দেশ পাঠিয়ে ডি. এন. এ. জীবশরীর বৃদ্ধির ও নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের উপযুক্ত প্রোটিন গড়ে তোলার কাজ এত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে •চালায় যে ললাটের লিখনে বিশ্বাসীরা ডি. এন. এ.-কে অনায়াসে বিধাতাপুরুষ আখ্যা দিতে পারেন। অতি জটিল অতি আধুনিক গণকযন্ত্রের চেয়েও ডি. এন. এ.-র ক্ষমতা বেশি ও এর কার্যকলাপ অনেক বেশি বিস্ময়কর।

এই বিধাতাপুরুষ, এই গণকযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রাসায়নিক পরিচয় জানানো উচিত। ছোট ছোট নিউক্লোটাইড-এর সমষ্টি নিউক্লিক অ্যাসিডের নিজস্ব গঠন বেশি জটিল। প্রতিটি নিউক্লোটাইডের উপাদানের মূলে থাকে একটি অ্যাডেনিন (Adenine), থাইমিন (Thymine), গুয়ানিডিন (Guanidine), অথবা সাইটোসিন (Cytosine); তার সঙ্গে যুক্ত হয় শর্করা জাতীয় উপাদান ডেস্অক্সিবাইরোজ—যার আবার সংযুতি ঘটে ফস্ফরিক অ্যাসিডের সঙ্গে। বিভিন্ন নিউক্লোটাইড ফসফরিক অ্যাসিড গ্রুপের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। মূলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বন্ধনী দিয়ে বাঁধা থাকে শিকল দুটি। অ্যাডেনিনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাইমিন এবং গুয়ানিডিনের বাঁধনে পড়ে সাইটোসিন।

মেয়েদের লিংগনির্ধারক ক্রোমোজোন একই ধরনের : দুটিই X ক্রোমোজোম। পুরুষের লিংগ নির্ধারিত হয় দুই ধরনের দুটি ক্রোমোজোম—X ও Y দ্বারা। নিষিক্ত হবার আগে ডিম্বকোষ শুধু X ক্রোমোজোমেই থাকে ; অপরপক্ষে পুরুষের শুক্রাণুর আধখানায় থাকে X, আর আধখানায় Y ক্রোমোজোম। যদি X ক্রোমোজোম সমন্বিত শুক্রাণু অংশ ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়, তা হলে নিষিক্ত ডিম্ব থেকে স্ত্রীসন্তান, আর যদি Y ক্রোমোজোম সমন্বিত শুক্রাণু-অংশ ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় তা হলে নিষিক্ত ডিম্ব থেকে পুরুষসন্তান পাওয়া যাবে। সন্তান স্ত্রী কি পুরুষ জাতীয় হবে সেটা নির্ভর করে শুক্রাণুর উপর। মেয়েদের দুটি ক্রোমোজোম এক জাতীয় হওয়ায় তাদের মধ্যে যৌন জিনভিত্তিক জন্মগত ত্রুটি

খুব কমই দেখা যায়। একটি ক্রোমোজোম যদি ত্রুটিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরটি সুস্থ থাকার দরুণ ত্রুটি বা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। অপরপক্ষে পুরুষের যৌন-ক্রোমোজোম দুটি দু-জাতীয় হবার দরুণ যে-কোনো একটির ত্রুটি জন্মের পর ধরা পড়বে, ত্রুটিপূরণের-কোনো সম্ভাবনা এ-ক্ষেত্রে থাকছে না। বংশগতি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না যে লিংগভেদে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণাবলীর কোনো হেরফের ঘটতে পারে। সংস্কৃতিগত ও সমাজগত পার্থক্যের দরুণ আমরা স্ত্রী ও পুরুষের কাছে স্বতন্ত্র ধরনের আচরণ ও ব্যবহার প্রত্যাশা করি বলেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য বিশেষ করে নজরে পড়ে।

মানুষের আকৃতিগত বিভেদের অনেকখানি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা থেকে উদ্ভূত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চামড়ার রং, চুলের বৈশিষ্ট্য, চোখের রং ও চেহারা এবং রক্তের গ্রুপ আপাতদৃষ্টিতে জিন-নির্দিষ্ট বলেই মনে হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা মনে করেন, বিশেষ পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতির ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের থেকে শরীরগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই বৈশিষ্ট্য জিনকে প্রভাবিত করেছে। কয়েকশত পুরুষ খররৌদ্রতাপে আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করার ফলে ধীরে ধীরে চামড়ার নীচে ঘন কৃষ্ণ রঞ্জক পদার্থের সমাবেশ ঘটেছে রৌদ্রতাপ থেকে দেহের অভ্যন্তরে থাকা যন্ত্রাদিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। অভিযোজনের জন্যই দৈহিক পরিবর্তন ঘটেছে—এই তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের পর, পঞ্চাশের দশক থেকে শ্বেতজাতির পৌরুষ বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার মত বিজ্ঞানসমর্থিত তথ্যভিত্তিক তত্ত্ব আর বিশেষ পরিবেশিত হচ্ছে না। সাদা কালো পীত বাদামী সব বর্ণের বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন যে সব জাতির সব দেশের সব রং-এর মানুষের জিনবাহিত গুণাবলী ও শারীরবৃত্তিক ধর্ম একই ধরনের। প্রতিটি জাতি বা একই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য যতটা—জাতিগত বা অঞ্চলগত পার্থক্য ততটা নয়। প্রজননবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনো জাতির বা ব্যক্তির (অস্বভাবীদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না) মানসিক প্রবণতা জিনভিত্তিক বলে প্রমাণিত হয়নি। নৃবিজ্ঞানীরা আদিম জাতির মধ্যে নানা ধরনের মনোভাবের সন্ধান পেয়েছেন। আক্রমণমুখিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, অন্তর্মুখিতা পরিবেশ ও সংস্কৃতিনির্ভর—জিননির্ভর নয়ঃ এ বিষয়ে তাঁদের অনেকেই একমত হয়েছেন।

মানবশিশুর বৃদ্ধি ও ক্রম-পরিবর্তনের ব্যাপারে বংশগতির প্রভাব—যাকে জেনেটিক সম্পদের প্রভাবও বলা যায়—ঠিক কতখানি, তার সঠিক বিচার করা বর্তমানে অন্তত সম্ভব নয়। মানবপ্রজাতির সঙ্গে অন্যান্য প্রজাতির যে পার্থক্য বিশেষ করে আমাদের নজরে পড়ে সেটা হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন ও একেবারে নতুন

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। পরিবেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নতুন গুণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা (পাভলভীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় শর্তাধীন পরাবর্ত গড়বার ক্ষমতা) অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। বাবুই পাখীকে বাসা বাঁধার মত জটিল প্রক্রিয়া শিখতে হয় না—এই ক্ষমতা নিয়েই তারা জন্মায়। পিঁপড়েদের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও জটিল কিন্তু সেই বিধিবদ্ধ প্রণালী বজায় রাখবার ব্যবস্থা এদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে না। তাদের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে তারা জীবনযাত্রার প্রণালী বজায় রাখতে পারে না। বাবুই পাখী ও পিপীলিকা প্রজাতির এই সব জটিল ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক কাজের ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ; তাদের জিনের মধ্যেই এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন দশার সংকেত লিপিবদ্ধ ছিল। সংকেত লিখন (transcription) পঠনের (translation) ও সেই অনুযায়ী শরীরের অংশ পরিচালনের ক্ষমতা নিয়েই এরা জন্মগ্রহণ করে। নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট কাজ করবার ও সেই পরিবেশে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার ক্ষমতা—যাকে বলা হয় বিল্ট-ইন অ্যাড্জাসটিভ প্যাটার্ন—মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত ধর্ম।

মানুষের ক্ষমতা এইভাবে সীমিত নয়। মানুষ নতুন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে না, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে যে-পরিস্থিতির জন্য তার ডি. এন. এ.-তে প্রোগ্রাম তৈরি নেই, সেই পরিস্থিতিরও মোকাবিলা করতে পারে। নতুন সংগঠন তৈরি করতে পারে, পরিবেশকে নিজের অনুকূলে আনতে পারে। অতি বড় আপাত বুদ্ধিমান মনুষ্যেতর প্রাণীর সে ক্ষমতা নেই। বাক্‌শক্তি ও বাক্‌ভিত্তিক চিন্তাশক্তির অধিকারী মানুষ নতুন শিক্ষালাভের ক্ষমতার দিক থেকে উচ্চতম যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ-ছাড়া, মানুষের প্রক্ষোভের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি। এই সব বিশেষত্ব মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দিয়েছে, ইতিহাস গড়বার শক্তি দিয়েছে। প্রাকৃতিক রহস্যভেদ করে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়েছে মানুষ। মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানকে পরিবর্তিত করে উত্তরসূরীদের জন্য উন্নততর ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। মানুষের মধ্যে আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির চেয়ে অনেক সময়েই প্রজাতি-সংরক্ষণ প্রবৃত্তি জোরালো হয়ে দেখা দেয় ; মানুষ ভালবাসে, শুধু নিজেকে ভালবেসে সে তৃপ্তি পায় না, অন্যকে ভালবাসে, ভালবাসার জন্য জীবন দিয়ে থাকে মানুষ। এছাড়া মানুষ মূল্যবোধ, আদর্শ, নিজের ও অন্যের আচরণের অর্থ অন্বেষণ ইত্যাদি বিশুদ্ধ মানবিক সমস্যা নিয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে, মাথা ঘামায়। ভালমন্দ বিচার, নৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা, জীবনের অর্থ খোঁজা, মৃত্যু নিয়ে চিন্তা—হোমোস্যাপিয়েনসের স্বভাব-ধর্ম। মানুষ আবার কোনো কোনো অবস্থায় পশুর চেয়ে অবুঝ, নির্মম নিষ্ঠুর।

পশু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পশু হনন করে, মানুষ নিজের গড়া সংস্কারের দাস হয়ে প্রজাতি ধ্বংস করতে ইতস্তত করে না। এই জটিল ও বিচিত্র প্রজাতির অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপই তার ডি. এন. এ-তে লিপিবদ্ধ প্রোগ্রাম বহির্ভূত। আকার, চুলের রং, গাত্রবর্ণ, চোখের রং ইত্যাদি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জিন আছে। অবশ্য এই নির্দিষ্ট জিনও, আমরা আগেই বলেছি, স্থানকাল পরিবেশের প্রভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৌলতে তাদের বিশেষত্ব অর্জন করছে। মানসিক বৈশিষ্ট্য—যার বিবরণ আংশিকভাবে একটু আগেই দেওয়া হয়েছে—জিন-নির্ধারিত বা পুরোপুরি বংশগতি প্রভাবিত নয়, তবে মানবপ্রজাতির সাধারণ গুণ, ধর্ম ও শারীরিক, বিশেষ করে স্নায়ুসংস্থার বৈশিষ্ট্য লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের ফলে যা সে আয়ত্ত করেছে, প্রজাতির মানসিক ধর্ম উন্মেষের জন্য সেই মানবিক বিশিষ্টতার প্রয়োজন অপরিহার্য। এই সব বিশিষ্টতা জিন নির্ধারিত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রভাবেই মানসিক বৃত্তি গড়ে ওঠে। শুধু মানসিক বৃত্তি কেন, দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো, হাঁটাচলা, কথা বলার মত অতি সহজ মানবিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়াও অনায়াসলব্ধ বা জন্মদত্ত নয়। এই সব সাধারণ ধর্মও শিক্ষাসাপেক্ষ ও অর্জিত। মানবশিশু হয়ে জন্মালেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবয়স্কের বিদ্যাবুদ্ধি বা অন্যান্য গুণাবলী আয়ত্তে আসে না। মানবশিশুর মধ্যে কোনো বিল্ট-ইন্ অ্যাডজাস্টিভ প্যাটার্ন (built-in adjustive pattern) থাকে না—আগেই উল্লেখিত হয়েছে। মানবশিশু প্রজাতি-সুলভ জিনের দৌলতে মানুষ হবার পুরো সম্ভাবনা (potentialities) নিয়ে জন্মায় বটে; কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন মানবিক সমাজ ও প্রশিক্ষণ। মানবশিশু অন্য প্রাণীর পরিবেশে বড় হলে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না, স্বজাতিকে দেখে ভয়ে পালাবে, মানুষের খাদ্য সহজে গ্রহণ করবে না। আবার শিম্পাঞ্জী শিশুও অনেক চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও, সব বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য সব মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, মানুষের গুণাবলী অর্জন করতে পারবে না। আমাদের বংশানুক্রমিক মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উদ্দীপকের প্রভাবে নতুন নতুন অভ্যাস বা শর্তাধীন পরাবর্ত গঠিত হবার ফলে। পরাবর্ত গঠনে মস্তিষ্কবল্কলের ভূমিকাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জন্ম থেকেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তার কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একই সমাজে, একই ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে লালিত শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় জন্মগত পার্থক্য ও বংশগতিকে অনেকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। "প্রত্যেকটি ভ্রূণই স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয় এই মৌলিক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির জীবনচক্র আচ্ছন্ন থাকে। মানসিক গঠন, মেজাজ,

আচরণ, ক্রমবিকাশের বিশেষ ধরন—সবের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত"* —এই উক্তির মধ্যে এই ধারণাই প্রকাশ পাচ্ছে। আবার আরেক দল বিজ্ঞানী মনে করেন যে শুধু জন্মদত্ত জিনকে আদি শৈশবের প্রলক্ষণ বা বিশিষ্টতার জন্য দায়ী করা চলে না। শিশুর আদিতম প্রলক্ষণটিও জিন ও পরিবেশ—দুয়েরই উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতে গঠিত। জন্মপূর্ব পরিবেশ ভ্রূণকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে।** তাছাড়া কোনো সময়ে ঠিক সমধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করে দুটি নবজাতক নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। মনুষ্যেতর প্রাণীশাবকের উপর এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে মানবশিশুর পক্ষে সেই ফলাফল প্রযোজ্য হবে—একথাও বলা চলে না। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা ও নতুন অভ্যাস গড়ে তোলার (শিক্ষার) বিশেষ ক্ষমতার কথা আগেই বলা হয়েছে।

জন্মের পর থেকে শিশুমাত্রেই তার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা সব শিশু এক ভাবে করে না। পরিবেশের হেরফেরের সঙ্গে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে মার্ফি ও তাঁর সহকর্মীরা কিছু পরীক্ষা চালিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বাচ্চাদের প্রতিক্রিয়া একেবারে প্রথম থেকেই বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।*** কর্মতৎপরতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা, অভিযোজনক্ষমতা—এক এক শিশুর এক এক ধরনের। জন্মের পর প্রথম সপ্তাহ থেকেই দেখা যায় কোনো শিশু সামান্য শব্দ শুনলেই চমকে ওঠে, মুখে রোদ পড়লেই কেঁদে ওঠে, অন্য একজন এরকমটি করে না। একই পরিবেশে সমান বয়সী, সমান ওজনের, শারীরিক দিকে কোনো অসুস্থ উপসর্গবিহীন দুটি শিশুর সহনশীলতা ও স্পর্শকাতরতার মাত্রা কমবেশি হয়ে থাকে। মা বা ধাত্রীর মেজাজ, সহনশীলতা, উৎকণ্ঠা-প্রবণতা ইত্যাদি মানসিক ধর্মের সঙ্গে শিশুর এই ধরনের ব্যবহারের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেও মার্ফি ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন যে বাচ্চাদের এই সব প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মূলত জিন-প্রভাবিত জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম। প্রক্ষোভিক তারতম্যের দিক থেকেও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যও এঁরা জিন-নির্দিষ্ট বলে মনে করেন। পরিবেশের সঙ্গে জীবনধারার পরিবর্তনের,

---

* Gasell and Amatruda : The Embryology of Behaviour, 1945 p. 284

** Eiduson & Geller : American Journal of Psychiatry, 1962, 119, 342 350

*** Murphy and Associates :Widening World of Childhood, New York, 1962

যথা খাদ্য বদল ও মায়ের কাছ থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকা, ছোটখাটো আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও শিশুদের মধ্যে যে-প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখা যায়, তার জন্য দায়ী জন্মসূত্রে পাওয়া জিনের বৈশিষ্ট্য। এই অভিমত পোষণ করেন যাঁরা, তাঁরা এ কথা বেশ জোর দিয়েই বলেন যে সামান্য পীড়নে (stress) যে সব শিশু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে হজমের গোলমাল, শ্বাসকষ্ট, দেহের তাপমাত্রার তাৎক্ষণিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ অথবা অস্থিরতা, কান্নাকাটি, ভয়ের অভিব্যক্তি ইত্যাদি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—তাদের ভবিষ্যতে প্রতিকূল পরিবেশে স্নায়ুচাপ বৃদ্ধির দরুণ অন্ত্রনালীর ক্ষত, রক্তচাপ বৃদ্ধি, বৃহদন্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি মানসশারীরিক ব্যাধি ও খেদোন্মত্ত বাতুলতা (Manic Depressive Psychoses) অথবা চিত্তভ্রংশ বাতুলতার (Schizophrenia) মত রোগ দেখা দিতে পারে। যদিও এঁরা মনে করেন যে মানসিক রোগ বংশানুক্রমিক বা জিন-বাহিত নয়। এই সব প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রায়শ দেহের কোনো সংস্থার অংশবিশেষে প্রকাশ পায়, মাঝে মাঝে অবশ্য সামগ্রিক সত্তার প্রতিক্রিয়াও লক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে পরিবেশ খুব বেশি প্রতিকূল না হলে যে সব শিশুর কর্মতৎপরতা, সংবেদনশীলতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া—সবই কম, অথচ অভিযোজনক্ষমতা ভাল, তারা জীবনে মোটামুটি সাফল্য লাভ করে, জীবন তাদের মসৃণভাবে চলে। আর যারা কর্মতৎপর, অতিমাত্রায় প্রক্ষোভাধীন ও সংবেদনশীল এবং অভিযোজনক্ষম তারা জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে সফলতা লাভ করে এবং নিজেদের অবস্থায় তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কর্মতৎপরতা প্রক্ষোভাধিক্য ও সংবেদনশীলতা যাদের বেশি তাদের যদি অভিযোজন ক্ষমতা কম হয়, তবে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এবং বহু রকমের অসুখকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়।

শিশুদের জীবনারম্ভে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য, প্রক্ষোভ, সংবেদন, কর্মতৎপরতার তারতম্য ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ না করেও এ প্রশ্ন তোলা যায় যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলি পুরোপুরি জিন-নির্দিষ্ট—এ সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্যপ্রমাণ আছে কি? প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মূলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবের (যা ভ্রূণের উপর ক্রিয়া করেছে) গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে কি? রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ-বর্ণিত মস্তিষ্কের টাইপ প্রসঙ্গত এসে পড়ে। পাভলভের সময় জিনবিজ্ঞান পরিণতি লাভ করে নি।

কৈশোর প্রাপ্তি ও কৈশোর সমস্যার আলোচনায় ও বিশ্লেষণে শর্তাধীন পরাবর্ত-ভিত্তিক বিষয়মুখীন ও লিবিডোভিত্তিক বিষয়ীমুখীন অন্তর্দর্শনবাদী দুই পদ্ধতিরই প্রয়োগ দেখা যায়।

এই দশকে জিনের প্রভাব নিয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করা দরকার। মানসিক গুণ উন্মেষে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, এই দলের সমীক্ষকরা মনে করেন, পরোক্ষ-ভাবে ব্যক্তিগত মানসিক ও চারিত্রিক সংগঠনে জিনের প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। এই মতাবলম্বী মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সোভিয়েত পণ্ডিতও আছেন। সাধারণভাবে লাইসেংকোর তত্ত্বকে জুলিয়ান হাক্সলী থেকে শুরু করে কিছু সোভিয়েত বিজ্ঞানকর্মী যখন একপেশে ও গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করলেন, তখন থেকেই মর্গান তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু সোভিয়েত পণ্ডিতের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিল।* মর্গানের উদ্ধৃতি পাওয়া যাচ্ছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের লেখায়।** অবশ্য তাঁরা জিন-পরিবাহিত বৈশিষ্ট্যকে কোনো সময় অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত মনে করেন নি। তাঁরা বললেন, দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের মাধ্যমে জীবন-অভিজ্ঞতা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবহিত হয়েছে সেই আদিম যুগ থেকে যখন মানুষ প্রথম ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করেছে, এবং এখনও এই ভাবে ভাব-বিনিময় অব্যাহত রয়েছে। এই ভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এই ভাবে অভিজ্ঞতা ও বিশেষ জ্ঞান প্রেরণকে একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী নাম দিয়েছেন—সংকেতবাহী বংশগতি বা signalling heredity।*** আর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, যৌন পদার্থ মাধ্যমে পরিবহিত গুণগুলোকে 'বংশগতি প্রভাবিত' বলা উচিত আর শিক্ষা প্রভাবিত মানসিকতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে বলা উচিত 'অনুবৃত্তি প্রভাবিত'।**** অথবা একে বলা চলে সামাজিক উত্তরাধিকার (social inheritance)।

---

* T H. Morgan : The Scientific Basis of Evolution, New York, 1932

** "There are, then, in man to processes of inheritance : one through the physical continunity of the germ cells ; and the other through the transmission of the experiences of the generation to the next by means of example and by spoken and written word". (Morgan : The Scientific Basis of Evolution. New York, 1932, p. 215)

***M. Lobashev : Genetics, Leningrad (in Russian), p. 7, referred by Dmitri Lebayev in Social Sciences, Moscow, 1982, Vol. I, p. 75.

****S. N. Davidenkov : Evolutionary & Genetic Issues of neuro-pathology, Leningrad, 1947, pp, 109—Ibid.

মানব প্রজাতির জৈব-সামাজিক ক্রমোন্নয়নের পথে ক্রমশ সামাজিক সূত্রে পাওয়া উপাদানের প্রভাব বৃদ্ধি হতে থাকে। এই ধরনের আভাস আমরা আগেই পেয়েছি পাভলভের ল্যাবরেটরীতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে। আমরা জানতে পারি যে, কোনো শর্তাধীন পরাবর্ত কয়েক প্রজন্ম ধরে গঠিত হলে ক্রমশ শর্তহীন পরাবর্তে রূপান্তরিত হতে পারে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্রমোন্নয়ন, মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের প্রভাব সামাজিক বংশগতির উন্মেষের ফল। আর এই 'social inheritance'-এর মূলে আছে মানব-মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ ধর্ম, নমনীয়তা ও সংযোজন ক্ষমতা—এক কথায়, পরাবর্ত গঠনের প্রবণতা।

জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যতই বেড়েছে, ততই সেই প্রাচীনকালে সামাজিক পরিবেশের উদ্দীপক মস্তিষ্ক ধর্মকে প্রভাবিত করেছে, অতি-নমনীয় ও সহজ সংযোজনক্ষম মস্তিষ্কের জেনেটিক প্রোগ্রাম প্রণয়নে সমাজ-সংস্কৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।* অবশ্য এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে সামাজিক চেতনা ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা গঠনে শুধুমাত্র সামাজিক পরিবেশের প্রভাবই কাজ করে ভাবলে ভুল হবে—বলেছেন আর একজন সোভিয়েতের বিজ্ঞানী।** সামাজিক ও জৈবিক বংশগতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈব ধর্মকে পুরোপুরি পরিহার করতে পারে না সামাজিক উদ্দীপক। প্রসঙ্গত বেলিয়ায়েভ বলেছেন, মানবসত্তা অধ্যয়নে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, জৈব-সামাজিক মানবপ্রকৃতির উপর জৈবিক ও সামাজিক উদ্দীপকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, সামগ্রিক ভাবেই বিচার করা উচিত।***

---

* Social Science, Moscow, 1982. No. 1, p. 73

** In analysing individual behaviour there is need for a differentiated approach that would take into account both the social and biological (natural in general) conditions which in inseparable interaction determine that behaviour. (P. Fedosyev : The Problem of the Social and Biological in Philosophy & Sociology, 1977, Quoted by Belyayev, Ibid, p. 26).

***To my mind, a major study in the essence of man and the prospect of his future is largely in realising the inseparability of the interaction of the social and biological in a common biosocial human nature, as well as the historical dynamics of this interaction and its concrete manifestations at various stages of human history, past and present. (Ibid).

এই দশকের অন্য যে সব তথ্য দ্বারা এই কালের জিন-বিশেষজ্ঞরা প্রভাবিত হচ্ছেন, সেই সব তথ্যের বিশ্লেষণ, বিচার এবং তা থেকে নতুন তত্ত্ব বা প্রকল্প প্রণয়নের ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একই সামাজিক পরিবেশে, আমরা জানি, বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায়। তাদের অনেকের মধ্যে থাকে পরার্থিতা (altruism), গোষ্ঠী ও সমাজের প্রতি আনুগত্য ও অনুগামিতা, আবার কিছু ব্যক্তির মধ্যে থাকে অতিমাত্রায় আত্ম-কেন্দ্রিকতা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, অনুগামিতা, অসামাজিক নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি ও হিংসাশ্রয়ী মনোভাবের প্রাধান্য। এ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য সব কালের সব সমাজেই পরিলক্ষিত এবং সৃজনধর্মী ক্রিয়া-কলাপের ক্ষমতা একই পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে বিকশিত। অতি মাত্রায় শোষণধর্মী ও বিষম সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত কিশোরদের মধ্যেও আমরা পরার্থবাদিতার উন্মেষ দেখতে পাই, আবার অনেক বেশি সুস্থ সামাজিক পরিবেশে অসামাজিকতা ও অননুগামিতার প্রকাশ দেখতে পাই কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে! কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা যায়? ইতর প্রাণী নিয়ে যে ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায়, মানব শিশুর ওপর সে ধরনের (অন্য সমস্ত উদ্দীপককে বাদ দিয়ে, বিশেষ একটি উদ্দীপকের দরুণ আচরণ ও মানসিকতার বিকাশ) পরীক্ষানিরীক্ষা সম্ভব নয়; কাজেই জন্মগত জিন-বৈশিষ্ট্যমূলক ও পরিবেশ নির্ভর গুণাগুণের পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

পরিবেশ

সেকালের মত বংশগতি ও পরিবেশ, 'নেচার' বনাম 'নারচার' নিয়ে আজকালকার বিজ্ঞানীরা আর তর্কযুদ্ধে নামেন না। এই দুইয়ের একক ও মিলিত প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা আজ সচেতন। মানুষের বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত বা জন্মগত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই যে পরিবেশ প্রভাবিত না হলে বিকাশ লাভ করে না, এ বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। মানুষ মাত্রেই জন্মমুহূর্ত থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত। আমরা এই অধ্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশন করব।

পরিবেশকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক ও সামাজিক। সামাজিক পরিবেশকে আবার আর্থসামাজিক (socio-economic) এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক (socio-cultural)—দুই দিক দিয়ে বিচার করা চলে। পণ্ডিতেরা মনে করেন বিগত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষের শারীরস্থানিক বা শারীর-বৃত্তিক কোনো বড়দরের পরিবর্তন ঘটে নি। আজকের মহাকাশবিজয়ী মানব সমাজের শিশু এবং বিশ হাজার বছর আগেকার কাঁচামাংসভোজী সমাজের শিশুর মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অতীতের বর্বর যুগের সেই পাহাড়ের গুহায় জাত শিশুকে আজকের মস্কো এবং নিউ ইয়র্কে কোনো বিশেষ গুণীজ্ঞানীর পরিবারে রেখে যদি মানুষ করা যেত, তাহলে সে ১৯৮২ সালে মস্কো বা নিউইয়র্কে জন্মেছে যে শিশু, উত্তরকালে তার মতনই একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী অথবা ব্যালেনর্তকী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তখন জন্মেছিল বলে বর্বর যুগের শিশুটির শিকারী বা ঐ জাতীয় কিছু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আজকেও আফ্রিকার বনে জঙ্গলে, মেরুদেশে বা উষর মরুতে অথবা ঐশ্বর্যশালী নগরীর কদর্য বস্তীতে জন্মালে আজকের সভ্যতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ যুগেও শিশু তার জন্মগত সম্ভাবনার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী হতে পারে না। মানব প্রকৃতিজাত গুণ ও ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই প্রধান। এ্যালডুস হাক্সলি, এই ভূমিকার কথা তাঁর একটি লেখায় খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।*

* Human Potentialities—Science and Human Affairs, California, 1965, p. 64)

প্রকৃতি সদয় না নির্দয় ? অল্পায়াসে খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপন্ন করা যে পরিবেশে সম্ভব, তাকে সদয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর বিপরীত পরিবেশকে নির্দয় বলা হত। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে সদয় নির্দয়ের মধ্যে আগেকার মত অত তফাৎ না থাকলেও সদয় প্রাকৃতিক পরিবেশের খোঁজে ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর দেখা না মিললেও, এ কথা আজও বলা চলে মানুষের দেহের গঠন, গায়ের বা চুলের ও চোখের রঙ, তার হৃদ্‌পিণ্ড ও অন্যান্য আন্তরযন্ত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। শারীরিক অনেক বৈশিষ্ট্য যে বাসস্থানের জলবায়ু, তাপাঙ্কের ওঠা নামা, উচ্চতা, জমির উর্বরা শক্তি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শক্তি সামর্থ্য, কষ্ট সহ্য করা ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ইত্যাদি কিছু কিছু মানবিক ধর্মও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কমবেশি হয়—এ কথাও সকলেই মেনে নেবেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার, বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মানবপ্রজাতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। মহাকাশ বিজয়ের সাফল্যই মানুষের চরম অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মানসিকতার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি নয়—এ বিষয়ে অনেকেই প্রায় একমত। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি, সেখানকার লোক শ্রমবিমুখ হয়, তাদের মেজাজ সামান্য কারণেই বিগড়ে যায় ; যেখানকার চাষের জমিতে পলি পড়ে ও জলের অভাব নেই, সেখানকার চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়—এইসব ধারণা একেবারে মিথ্যে নয় বলে মনে হয়। এইসব নিয়ে খুব কম কাজই হয়েছে। ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ডের "দ্য এ্যাচিভিং সোসাইটি" (১৯৬১)-তে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে তাপমাত্রা খুব বেশি বা খুব কম হলে কাজ করবার প্রেষণা (motivation) বা উৎসাহ থাকে না ; মাঝামাঝি মাত্রার তাপমাত্রা যেখানে, সেখানকার অধিবাসীরা কর্মঠ ও সফল। আবার এ কথাও ঠিকই যে শিশুরা যদি অল্পবয়স থেকেই চরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হয়, তারা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার বেশি ক্ষমতা অর্জন করে। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত যে শিশুর, কৈশোরে পদার্পণ করার পর তার চরিত্রে, তার মানসিকতায় এই কঠোর প্রতিকূলতার ছাপ পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। অস্বাস্থ্যকর বস্তির পরিবেশে অথবা পাহাড়ে জঙ্গলে, খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবের সঙ্গে নিত্য লড়াই করতে হয় যে সব কিশোরদের তাদের হাবভাব, স্বভাবচরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারের আদরে লালিত শিশুর নমনীয়তা না থাকারই কথা। কিন্তু বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদদের প্রতিবেদনে, প্রবন্ধে, পুস্তকে বিভিন্ন ধরনের মতামত দেখা যায়। যারা পিছিয়ে

পড়া গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন তাঁরা অনেকেই অতিকঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা, প্রায় সব রকমের শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, প্রাক্-কিশোর ও কিশোরদের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত মনোভাবের বিকাশ দেখেছেন। আবার দেখা গেছে ঐ একই রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়া কিশোর কিশোরীদের মধ্যে মানসিক বিকার ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব। কোলম্যান (Psychology and Effective Behaviour, 1971) এ বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। বলিভিয়ার এক প্রাচীন যাযাবর গোষ্ঠীর সম্বন্ধে (Science Newsletter 1950 : Hunger regulates lives) বলা হয়েছে যে খাদ্যের অভাবের দরুণ তাদের মধ্যে খাবার ইচ্ছা বা লোভ মানসিক বিকারের স্তরে বিদ্যমান। একজন অপরজনকে বঞ্চিত করে গোপনে পরিবারের জন্য রাখা সব খাদ্য খেয়ে ফেলার প্রবণতা এই গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই নাকি দেখা যায়। স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হলে স্ত্রীর মনোভাব বিশেষ বদলায় না, কিন্তু প্রেমিকাকে কিছু খাদ্য দিলে স্ত্রী খাণ্ডাধারণ করে তেড়ে আসেন। এই প্রতিবেদনের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণের তাগিদের অভাব দেখে মনে হয় না তাদের খাদ্য সম্পর্কে এতখানি লোভ থাকতে পারে। তাছাড়া এস্কিমোদের মধ্যেও খাদ্যাভাব তীব্র, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও লোভের পরিবর্তে দেখা যায় সহযোগিতা ও সম্প্রীতি (Coleman, Ibid)।

প্রসঙ্গত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমনের উপর কঠোর ও নিষ্করুণ পরিবেশ প্রভাব সম্পর্কে একটি সোভিয়েত পত্রিকায় প্রকাশিত সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সকলেরই জানা আছে যে মানুষ যখন সাহস ও উৎসাহের সঙ্গে প্রতিকূল পরিবেশ যথা, শত্রুর আক্রমণ, অবরোধ, বড়দরের যুদ্ধ ইত্যাদির মোকাবিলা করে, যখন সে অসহনীয় দুর্বিপাক ও দুঃসময়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, যখন তার মনের ওপর প্রবল চাপ পড়ে, তখন সে বহুরকমের মানসিক রোগ ও নেতিবাচক প্রক্ষোভজনিত শারীরিক পীড়া (রক্তচাপবৃদ্ধি, আন্ত্রিক ক্ষত, হাঁপানি ইত্যাদি) থেকে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লেনিনগ্রাদের অবরোধের সময় নগরবাসীরা অমানুষিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। খাদ্যাভাব, জ্বালানীর অভাব, অবরুদ্ধ নগরের ওপর জল-স্থল-অন্তরীক্ষ থেকে অবিরত আক্রমণ—লেনিনগ্রাদের মানুষকে একেবারে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা চলছিল। এই সময় প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মানুষের দেহমনের এই অতিপীড়নের দরুন রক্তচাপ বৃদ্ধি ও অন্যান্য চাপা উত্তেজনাজনিত ব্যাধির (Stress syndrome) বিস্তার হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল তা ঘটেনি, রক্তচাপ বৃদ্ধির রোগী সে সময় ছিল না বললেই চলে। ভাদিম রোটেনবার্গ ও ভিক্টর আরশাভস্কি এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনার পর বললেন যে, সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক আচরণ

(active defensive behaviour) ব্যক্তির অভিযোজন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে রোগ আক্রমণকে প্রতিহত করে। যুদ্ধে আহত বিজেতার ক্ষত নিরাময়ে বিজিতের থেকে অনেক কম সময় লাগে (Moscow News, No. 16, 1982)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লণ্ডনের ওপর যখন অবিরাম বোমাবর্ষণ চলছিল, তখন সেখানেও শোনা যায় উদ্বায়ুঘটিত (neurotic) ও মানসশারীরিক ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ (Quest activity) পরিবেশের দুঃখকষ্ট, কঠোরতা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দাক্ষিণ্য ছাড়াই প্রাক্-কিশোর ও কিশোর বলিষ্ঠ মনোভাব ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে—যদি তার পরিবার ও পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ, ও দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামী মনোভাব গঠনের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের আর একটি দিক—জনসংখ্যার ঘনত্বের (population density) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন আজকের মনস্তাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিকরা। প্রধানত ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঘনবসতি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা শিশু ও কিশোর কিশোরীরা বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে, রাস্তাঘাটে নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়বে, এবং মানসিকতার দিক থেকে বিরলবসতি অঞ্চলের কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনধারণের উপযোগী উপকরণের অভাবের কথা কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ধরা হচ্ছে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুণ অভিযোজন ক্ষমতার অবনতি ঘটবে।

১৯৬২ সালে ক্যালহাউনের বিখ্যাত পরীক্ষানিরীক্ষার কথা অনেক লেখক উদ্ধৃত করেছেন।* একটা বদ্ধ জায়গায় ল্যাবরেটরীর ইঁদুরদের বংশবৃদ্ধি করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হল। সেখানে খাবার-দাবার ও বাসা বাঁধবার জিনিসপত্তরের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে মেয়ে ইঁদুর ও পরে পুরুষ ইঁদুরের আচরণে বিশৃঙ্খলা ও বিকার দেখা গেল। বাসা বাঁধা ও বাচ্চাদের যত্ন করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। অযত্নে বাচ্চাদের মৃত্যুহার বেড়ে দাঁড়াল শতকরা প্রায় ছিয়ানব্বই। গর্ভধারণের নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে গেল। চার ভাগের এক ভাগ মেয়ে ইঁদুরের মৃত্যু হল বছর দেড়েকের মধ্যে। তারপর পুরুষের মধ্যে অস্বভাবী আচরণ প্রকাশ পেল। যৌন ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে অসুস্থতা (morbidity) দেখা দিল। সমকামিতা,

---

* Population Density and Social Pathology, Scientific American, 1962, 206(2) ; 139-50

অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ইতুর ও অনিচ্ছুক প্রাক্তবয়স্কদের সঙ্গে সংগম ইত্যাদি অস্বাভাবিকতার পর দেখা দিল হিংস্রতা ও আক্রমণ করার প্রবণতা। মৃত্যুহার বাড়ল, জন্মহার কমতে লাগল। এইভাবে চললে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই গোষ্ঠী বংশবৃদ্ধি ও সংখ্যা-ঘনত্বের জন্য লোপ পেত। অনেকেই এই পরীক্ষার ফল মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন না। আমরা জানি নিম্নপ্রাণীর জীবনধারণ ও প্রজাতি সংরক্ষণ তাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম ও সহজপ্রবৃত্তির উপর প্রধানত নির্ভরশীল। মানুষ এই ধরনের অন্তর্নিহিত কোনো ব্যবস্থার (built-in-apparatus) উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি যদি খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির উপর চাপ সৃষ্টি না করে—তবে মানুষকে ইতুরের মত আত্মধ্বংসী ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। কিছু পশ্চিমী বিজ্ঞানী ইতুরের আচরণের সঙ্গে ঘনবসতির মহানগরীর মানুষের ব্যবহারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন—তাদের দ্রুততালের উন্মত্ত জীবনযাপন ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। ম্যালথুস্ প্রভাবিত এই সব বিজ্ঞানী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও তার ফলে অধিবাসীর মানসিকতার পরিবর্তনের কথা আদৌ চিন্তা করেন নি। কোলম্যান (Psychology and Effective Behaviour) এবং আরো কিছু মনোবিজ্ঞানী কিন্তু মনে করেন যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশই মূলত শিশু ও কিশোরের মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ এবং জীবনের সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

আর্থসামাজিক পরিবেশ

প্রথমে আর্থসামাজিক পরিবেশের কথা ভাবা যাক। ভারত এবং এই রকম দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের শিশু কিশোরদের পক্ষে আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাবের গুরুত্বই বোধহয় সব থেকে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে নানা কারণে শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীর কিশোরের সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার ৩১% ও ২৩%।* এটা ১৯৬৭ সালের হিসেব। আমাদের দেশে ১৯৭১-এর লোক গণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার একশজনের মধ্যে ৬১ জনের বয়স পঁচিশের কম, ৪২ জনের পনেরোর কম আর ছয় বছরের কম বয়স্ক শিশুর সংখ্যা শতকরা পঁচিশ—১১৫ মিলিয়ন। প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটি করে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে—বছরে ২১ মিলিয়ন। পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগেই এদের মধ্যে ৩.৬ মিলিয়নের মৃত্যু হয়।

---

* Nag : Adolescents in India, Calcutta 1982, p. 3

মোট মৃত্যুর শতকরা ৪০ ভাগ ঘটে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে, শতকরা ১৫ ভাগ এক বছরের আগেই মারা যায়। উন্নত দেশে ০—৫ বছরের শিশুর মৃত্যুহার মোট মৃত্যুর শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। মৃত্যুহার গত ৩০ বছরে অনেক কমেছে। কিন্তু এখনও হাজারে ১৫ জন মারা যায় প্রতি বছরে। এই হার শ্রীলংকা মালয়েশিয়ার মত দেশের মৃত্যুহারের দ্বিগুণ আর পশ্চিমী দেশের চেয়ে ৬ গুণ বেশি। শহরের থেকে পল্লীগ্রামে মৃত্যুহার স্বাভাবিক কারণেই বেশি। জন্মানোর পরেই পল্লীগ্রামে হাজারে ১৩১ এবং শহরে ৮১টি শিশু মারা যায়। আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশে এই সংখ্যা মাত্র ২৭।*

শিশুর সমস্যা, প্রাক্-কিশোরকালীন সমস্যা কৈশোরকে প্রভাবিত করে— এ কথা সবারই জানা। শিশুস্বাস্থ্য, শিশুমনস্তত্ত্ব, শিশুদের বুদ্ধি বিকাশ নিয়ে, তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আমাদের এই আলোচনা কৈশোর ও কৈশোর সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই সম্পৃক্ত। শৈশব ও কৈশোরেও মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ এবং মায়ের স্বাস্থ্য, মানসিকতা ও সমস্যার সঙ্গে শিশু ও কিশোরের বুদ্ধি, মনের বিকাশ ও সমস্যা নানাভাবে জড়িত। মায়েদের অপুষ্টিজনিত ব্যাধি, প্রসবকালীন সংকট ও পরবর্তীকালে শিশুচর্যার অজ্ঞতা, বুকের দুধ দানে অক্ষমতা শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক নিরাপত্তা-বোধকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে: এই বিপর্যয়ের প্রভাব কিশোর বয়সেও লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে মা ও শিশুর পুষ্টি, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ পল্লীবাসী, কিন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ হাসপাতালের ৩০% শয্যা ও মোট চিকিৎসকের এক পঞ্চমাংশ। শহরের বস্তি এলাকায় শিশুদের ও মায়েদের অবস্থা হয়তো সামান্য কিছু উন্নততর, কিন্তু আশানুরূপ নয়।

দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচুতে বাস করেন। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রাক্-কিশোর ও কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৩৪৬ মিলিয়ন।** এদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৪৪ মিলিয়ন। ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম পুষ্টি-দায়ক খাবার পাচ্ছে না।*** আই. সি. এম. আর.-এর বিধান অনুযায়ী ২০০০ ক্যালোরির (৫০ গ্রাম প্রোটিন থাকা চাই), খাদ্য খুব কম শিশুই পায়। ১৫

---

* Child in third World, P. P. H., New Delhi, 1979, pp. 27-29

** Nag, Ibid, p. 3

***Child in third World, Ibid p. 29

থেকে ২০% পুষ্টির অভাব নিয়েই এরা বেড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়, তারা কৈশোরে পড়াশুনো ও খেলাধুলোর প্রয়োজনে বাড়তিখাদ্য না পাওয়ার ফলে দেহ ও মনের অপুষ্টিতে ভোগে। মগজ প্রোটিনের অভাবে পুরোপুরি কাজ করে না, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্বাদ তারা ভোগ করতে পারে না। মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটে না।

সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশ

আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুণ শিশু ও কিশোরদের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং নিউরোসিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একজন মনোরোগ চিকিৎসক বেশ কিছুদিন আগে একটি বই লেখেন।* তিনি তাঁর দেশের কিশোর ও প্রাক্-কিশোরদের তরুণ মনের উপর আর্থসামাজিক বৈষম্য ও অপসংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন এই বইটিতে। তিনি সাইকোঅ্যানালিটিক তত্ত্বের সাহায্যে মৃত্যু-রতিবাদকে ভিত্তি করে চিকিৎসাজীবন শুরু করে পরে এই পথ পরিত্যাগ করেন। আর্থসামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক উপাদান পরবর্তীকালে নির্জ্ঞান ও লিবিডোর চেয়ে নিউরোসিসের ব্যাখ্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।** তাঁর দেশের কিশোর দুষ্ক্রিয়তার তথা সব রকমের নিউরোসিসের ক্রমবৃদ্ধির জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায় মানুষ, স্ত্রী-শ্রমিক (সাদা কালো দুই), অন্যদেশের সংখ্যালঘুদের শোষণ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যৌনতা ও অপরাধমূলক সাহিত্য ও সিনেমার ক্রম-প্রসারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, সহজপ্রবৃত্তিবাদী মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েডীয় সাইকোঅ্যানালিসিসই তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য) অপরাধ, নিউরোসিস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের কারণ হিসেবে অন্তর্দ্বন্দ্বকে, বিষয়ীভিত্তিক মানসিক সংঘাতকে (subjective psychological conflict) দায়ী করেছেন,

---

* (Furst Joseph : The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954)

** We would regard neurosis as being the intensive reflection within the sick individual's practice and consciousness of certain highly individualistic, destructive and antisocial qualities, engendered by the specific aspects of the social system in which he lives. (Furst Joseph : The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954, p 128)

কিন্তু আসল কারণ বাইরে, সমাজে।*

কিশোর কিশোরীদের মানসিকতা ও কৈশোরের নানাবিধ সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের উপায় নির্ধাণের জন্য কিছুকাল আগেও অধিকাংশ মনস্তাত্ত্বিক ও মনোরোগ চিকিৎসক শৈশবের অবদমিত কামনা বাসনার গতিপ্রকৃতির (প্রধানত কামেচ্ছা) উপর পুরোপুরি নির্ভর করতেন। পরবর্তী জীবনের, বিশেষ করে আদি ও মধ্য কৈশোরের ভাবনাচিন্তা, কিশোর কিশোরীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য সবই নির্জ্ঞান প্রভাবিত বলে ভাবা হত। হর্নি, ফ্রম প্রমুখ নিওফ্রয়েডিয়ানরা সংস্কৃতি (culture), সমাজ ইত্যাদি কথা আমদানী করেছিলেন, কিন্তু কথাগুলো ফ্রয়েডেরই লিবিডোরই নতুন নাম বা পোষাক। হ্যারী কে. ওয়েলস স্পষ্টভাবেই বলেছেন ও তথ্য প্রমাণ উদ্ধৃতি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ফ্রয়েডবাদের এই সব সংস্কারকরা আধুনিক নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের আলোকে ফ্রয়েড-বাদকে গ্রহণীয় করার জন্য সমাজ-সংস্কৃতি কথাগুলো ব্যবহার করেছেন। আসলে তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতি ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানেরই অনুলিপি।** পারিবারিক সমস্যা, মাতাপিতার আচরণ শিশুকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে; কিন্তু বহির্বাস্তবের নতুন নতুন উদ্দীপক তাকে পরিবর্তিত করবে না, শৈশবের উদ্দীপনা কিশোরকে, তার ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে—এই ফ্রয়েডীয় শিক্ষাকে মেনে নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অতটা দুর্বল অনেকেই মনে করেন না। চার বছরের শিশুর মধ্যে যুবকের যৌনধর্মিতা আবিষ্কার করা, কৈশোরকে সরাসরি অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করার মধ্যে নতুনত্ব আছে কিন্তু বিশ্বাস্য উপাদান নেই।***

---

* I would say unequivocally that the determining contradiction of neurosis is not an internal, psychological and subjective one. It is an external contradiction. It lies in the neurotic's social practice......The internal conflicts are reflections and derivatives of the conflicts in his social practice and the latter express the contradictory relations that are inherent in our social system. (Ibid, p. 149)

** Reformed psychoanalysis is a theory of the unconscious but the reflection theory is the theory of the consciousness. (Harry K. Wells : The Failure of Psychoanalysis, International Publishers, New York, p. 162)

***Freud conceived of people only in one way, namely, that after the age of three or four they are driven by adult sexuality—consciously or unconsciously—as the main motivation in life. It is only this philosophically static view point which would permit Freud to visualize children as miniature adults or coniceve of adults as enlarged children. (Furst : The Neurotic, 1954, p. 103)

সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিশোরের ক্রমবিকশিত বাস্তব চিন্তা, আন্তর্মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন, তার সামাজিক ভূমিকা নির্ধারণ ইত্যাদি কৈশোর ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। ফ্রয়েডীয় ভাবধারা দ্বারা পুরোপুরি বা আংশিক আচ্ছন্ন থাকার দরুণ এই সম্পর্ক নির্ণয়ে পশ্চিমী পণ্ডিতদের বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসীরা ছাড়া অনেক পশ্চিমী দুনিয়ার মনস্তাত্ত্বিকরাও এই রকমই মনে করেন।* কিশোরদের সমস্যাই হোক আর বয়স্কদের সমস্যাই হোক, তার কারণ জানবার জন্য পরিবেশের আর্থসামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পূর্ণ জ্ঞান ও সম্যক পর্যালোচনা দরকার। কিশোরদের ও বয়স্কদের সব সমস্যা, তাদের মনের দ্বন্দ্ব বিরোধ বুঝতে আমরা যদি শুধু শিশুদের দুধ খাওয়া আর 'টয়লেট ট্রেনিং' এবং মাতাপিতার আচরণ দিয়ে বিচার করতে বসি তাহলে আমরা সমাধান তো দূরের কথা, সমস্যার উৎস সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণাও তৈরি করতে পারব না। শিশুর বা কিশোরের সব কিছু সমস্যা মাতাপিতার মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত, মাতাপিতার মানসিকতা আবার তাঁদের মাতাপিতার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি দ্বারা নির্ধারিত—এই ভাবে বিচার করলে সমাজব্যবস্থার দোষত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্যাও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। পরিবারের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ সেখানেই পারিবারিক নিয়মকানুন, বিধি-ব্যবস্থা ন্যায়-নীতির উৎস বিদ্যমান। ব্যক্তি হিসেবে মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কোন্ বিশেষ আদর্শ তাঁরা প্রাক্-কিশোর ও কিশোর মনে অনু-প্রবিষ্ট করছেন তার গুরুত্বই বেশি।** এ নিয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনার

---

* The psychoanalysts say that person's thoughts or behaviour arise from the sources entirely within himself or some part of his mind which is "Unconscious" and thereby shut off from influences emanating from the world of reality outside the brain. This trend leads into pure mysticism... the unscientific nature is perhaps most clearly seen when psychiatrists...overlook all economic and political causes of world tensions, claiming instead that social problems are created by improper methods of raising children. (Saul, in Psychoanalytic Quarterly, Vol. 18, No. 2, 1949)

** The key question is not the psychology or behaviour of parents as individuals. The key question is the nature of the aspects of capitalist morality, ideology and practice which the parents transmit to their child. (Furst, op. cit., p. 134)

চেষ্টা করব। বয়ঃসন্ধিকালের যৌনসমস্যা সহজ প্রবৃত্তিগত যৌনসমস্যা নয়; সমাজে প্রচলিত নরনারীর সম্পর্ক ও সমাজ সংগঠনের সঙ্গে এই সমস্যা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কিশোরদের যৌনতা প্রসঙ্গে অন্যত্র এই জটিল ব্যাপার বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক বিবর্তনের ফলে প্রজাতি যেমন বিশিষ্ট মানবিক স্নায়ু সংস্থার (২৩ জোড়া ক্রোমোজম ও জিন সমৃদ্ধ) অধিকারী হয়েছে, তেমনি আবার হাজার হাজার বছরের সামাজিক বিবর্তনের ফলে বিশেষ এক সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। বিভিন্ন স্থানের সংস্কৃতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে দুস্তর ব্যবধান আছে বলে মনে হলেও 'মানব সংস্কৃতি'র একটা সামান্যীকৃত রূপও আছে। যেমন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র হলেও ভাষা আছে, সংগীত শিল্প সাহিত্য আছে, পরিবার ও সমাজ চালাবার নিয়ম কানুন রীতিনীতি আছে (Coleman, op, cit.. pp. 52-53)। নৃবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা আজকের মনোবিদ্যাকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। মার্গারেট মীড ও অন্যান্য নৃবিদ্যাবিশারদদের গবেষণা অধ্যয়ন থেকে শৈশবের ও কৈশোরের বুদ্ধি চরিত্র মানসিকতা ইত্যাদির বিবর্ধন ও বিকাশে এই সংস্কৃতির অবদান ও প্রভাবের স্বীকৃতি পুরনো দিনের সহজ প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের মর্যাদা বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। আনা ফ্রয়েড, মেলানি ক্লাইনের শিশু পালন ও শিশুচর্যাভিত্তিক (Child raising) শিশু মনস্তত্ত্বকে মার্গারেট মীডের মত গবেষকদের বাস্তব তথ্য-ভিত্তিক অভিমত অনেকখানি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করেছে। সংস্কৃতির প্রভাবকে প্রবৃত্তিবাদী শিশু ও কিশোর মনস্তাত্ত্বিকও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।*

গোষ্ঠীর প্রয়োজন, বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ ও নির্দিষ্টভাবে মেটাবার চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে, আবার অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরও নানা কারণে অবক্ষয় ও বিলোপ ঘটে। সংস্কৃতি দেশে দেশে বিভিন্ন; আবার একই দেশে ধর্মভিত্তিক, জাতি-ভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, আমাদের মত দেশে আবার ভাষাভিত্তিক,

---

* Culture is seen as a principal element in the development of the individual which will result in having a structure, a type of functioning and a pattern of irritability different in kind from that of individuals who have been socialized under another culture. (M. Mead : The concept of culture and the psychosomatic approach—In "Contribution toward medical psychology" (Ed. A. Wader, Vol. I, New York, 1953, p. 378)

আলাদা আলাদা অবর-সংস্কৃতি (Sub-Culture) রয়েছে। বিভিন্ন সাব-কালচার-এর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু মিল ও সম্পর্ক আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আবার অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি থেকে আলাদা হলেও, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু জায়গায় নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। সংস্কৃতির রূপান্তরণ ঘটলেও সব দেশের, সব জাতির সংস্কৃতিই যে মানব সংস্কৃতি, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। প্রতিটি সমাজ তার শিশুদের জন্ম থেকেই স্বকীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধে অনুমোদিত আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার শিক্ষা দিতে থাকে। উদ্দেশ্য নিজের সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় ও বাঁচিয়ে রাখা। এ কাজের জন্য প্রতি সমাজেই নানা রকমের এজেন্সী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে। গৃহ, পরিবার, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রধানত এই প্রশিক্ষণে অনেককাল ধরে নিযুক্ত। আজকাল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব গণমাধ্যমের। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কম হওয়ার দরুণ, সংবাদপত্রের চেয়ে সিনেমা রেডিও যাত্রা ইত্যাদি কিশোর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আজকাল বড় বড় নগর শহরে দূরদর্শন খুবই জনপ্রিয় মাধ্যম। কেবলমাত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদেরই দূরদর্শন কেনবার ক্ষমতা আছে ; কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত বস্তিবাসী আধা চেনা অচেনা কিশোর কিশোরীরা হিন্দী সিনেমা ও ফুটবল খেলা দেখতে সৌভাগ্যশালী প্রতিবেশী দূরদর্শন-মালিকদের বাড়ীতে ভিড় করে। কিশোর কিশোরীর মান-সিকতা ও চরিত্র গঠনে এই সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-এর অবদান সম্পর্কে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিবরণ দেওয়া হবে। আগে বলা হলেও আবার জানাচ্ছি যে খেলার মাঠে, স্কুলে, সিনেমা হলে কিশোর কিশোরী এক সঙ্গে একই জিনিস শিখছে বা দেখছে বটে ; কিন্তু ঠিক একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে ঘটছে না। ব্যক্তিগত গ্রাহীক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও ঔৎসুক্যের তারতম্যের কথা বাদ দিয়েও বলা চলে এরা নিজ নিজ অবর-সংস্কৃতি প্রভাবিত ও শৈশব থেকে বিভিন্নভাবে পূর্ব-শর্তাবদ্ধ (pre-conditioned) হবার ফলে একই ঘটনা, একই শিক্ষা, একই দৃশ্য তাদের মনে পুরোপুরি না হলেও বেশ কিছুটা ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করছে। কিশোর যে ছোটো গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম, সে কিছুটা সেই গোষ্ঠীর চোখ দিয়ে কান দিয়ে দেখে ও শোনে। সেই ছোটো গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, ভালমন্দ বিচার দ্বারা স্বভাবতই সে অভিভাবিত ও সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্বিত। এই গোষ্ঠীর মূল্যবোধ বড় গোষ্ঠী, বা দেশীয়, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী হলে, কিশোরের মনে সংশয় জাগতে পারে ; গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যদি তার নিজস্ব নিরাপত্তা বোধকে বিঘ্নিত করে, তাহলে সে দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতিকে বেশি মূল্য দিয়ে নিজের গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে হয় সে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হবে না হয় জাতীয় জীবনধারাকে আত্মীভূত করে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন দেবে।

আবার অনেক সময় বাড়ীর ও পরিবারের সংস্কৃতির ধারা থেকে সরে গিয়ে অনেক নীচু মানের সংস্কৃতির (যেমন ছিনতাই পকেটমার বা মাদকাসক্তের দলে ভিড়ে) প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। একটি কিশোর একই সঙ্গে কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত হবার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সে পৃথক পৃথক সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ-প্রভাবিত হতে পারে। পূর্ববঙ্গের দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের বাঁশের ছাপরায় বাসকারী কোনো কিশোর মেধাবী ছাত্র হবার জন্য স্কুলে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বনেদি বাড়ীর ছেলের বন্ধু হয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু সংস্কৃতির ধারক হতে পারে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলার মাঠে স্কুলের বন্ধুর মত মোহনবাগানের সমর্থক না হয়ে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক হতে পারে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো খদ্দরধারী শিক্ষকের প্রভাবে কমিউনিস্টবিরোধী হয়ে নির্বাচনের সময় পাড়ার ছাপরাবাসী ছেলেদের বিরোধিতা করতে পারে, আবার কোনো বোহেমিয়ান কবির কবিতা পড়ে একই সময়ে ধর্ম-বিরোধী নিহিলিস্ট হয়ে উঠতে পারে। গত ৩০ বছর, বিশেষ করে গত দশকের শেষ থেকে আমাদের দেশে ও সমাজে নানা ধরনের ভাবধারা—প্রগতিশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী, অতিবিপ্লবী, প্রতিবিপ্লবী, সনাতনপন্থী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং আরো অনেক—কিশোর মনের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করছে। কিশোর কিশোরীদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। বহুধর্মী উদ্দাম উদ্দীপকের চাপে উৎকেন্দ্রিকতা সংবেদনশীল কিশোর কিশোরীদের অস্থির অব্যবস্থিত করে তুলেছে। এখনও পাপ-বোধের তাড়নায় বাড়ীর বড়দের মত হয়তো বাবাজী দাদাজীর আশ্রমে ছুটছে না, কিংবা নিরাপত্তার আশায় অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনের হিষ্টিরিয়ায় ভুগছে না কিন্তু বেশ কিছু মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে অথবা আত্মরক্ষার তাগিদে বোমা ছোরা বন্দুক নিয়ে নিজেদের সজ্জিত করছে। তারা অন্যভাবে বাবা-কাকার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করছে। 'পিয়ার কালচার' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; 'পিয়ার কালচার'-এর সঙ্গে 'পৈতৃক কালচার'-এর মিলের দিকটা সেই সব আলোচনায় বোধ হয় দেখানো হয়নি।

বড় হওয়ার বিবরণীর মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। তবে যারা সহজপ্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে বড় হওয়াটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। খাবার-দাবার আদরযত্ন ঠিক মত পেলে সব শিশুই আপনা থেকে বড় হবে; আপনা থেকে তার শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটবে; এবং এই পরিবর্তনের ফলে আদি মধ্য ও অন্ত কৈশোরের বিশেষত্বগুলো দেখা যাবে। সমাজ-সংস্কৃতি বড় হওয়াকে প্রভাবিত করবে না; কিন্তু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানুষ হওয়ার দরুণ সেই সংস্কৃতির অংশীদার হবে; প্রথমে মাতাপিতার

শিক্ষায়, তার পর যে সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আগেই করেছি তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশিক্ষণে। ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ বা একরৈখিক নয় বলে মনে করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসীরা। পিতামাতা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান শিশুকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন, কিন্তু শিশুর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ একতরফা নয়। সংযোগ ও সাহায্য দুতরফা না হলে 'বড় হওয়া' দৈহিক দিক থেকে না আটকালেও বুদ্ধি ও মানসিকতার দিক থেকে আটকাবে। পুনরুল্লেখের দোষে অভিযুক্ত হব জেনেও আবার বলছি শিশু মানবিক ধর্ম উন্মেষ, বিকাশের সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, সেই ক্ষমতাকে জাগ্রত করার জন্য শিশুকে মানসিক গুণ আয়ত্ত করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হয়, সেই উৎসাহে ভাঁটা না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হয়। বাবা, মা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুকে প্রভাবিত করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশু যাতে মাতাপিতা ইত্যাদি শিক্ষার এজেন্টদের প্রভাবিত, আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করতে পারে, সে দিকেও দৃষ্টি রাখবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পরের পরিপূরক, দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের শিশুকে কিশোর যুবকে পরিণত করার ব্যাপারে এই ধরনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন গর্ডন চাইল্ড।* শিশু যখন কথা বুঝতে বা বলতে শেখেনি, তখনও সে অর্থহীন শব্দ ও অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে শিক্ষকদের, মানে বড়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং নিজেদের বড় হবার ব্যাপারে অক্রিয় থেকে প্রথমে কিছুটা নিষ্ক্রিয় এবং পরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। হাত পা নেড়ে অর্থহীন শব্দ করে শরীরকে নানাভাবে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে বাচ্চা বাক্স্ফুটনের আগেই নিজেকে বড়দের কাছে যাতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তার দায়িত্ব ও তাদের সঙ্গে এই বড় হওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতার দায়িত্ব বাপ-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এ-পর্যন্ত পণ্ডিতেরা বোধ হয় সকলেই একমত।

সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে তা নিয়ে এবং পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার তাৎপর্য ও পদ্ধতি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। খুব সংক্ষেপে সেই মতভেদের কথা উল্লেখ না করলে আমাদের পক্ষে কৈশোর সমস্যা বিশ্লেষণে ও সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র

---

* A baby does not indeed inherit at birth a physical mechanism of nerve paths stamped in the germ plasm of the race and predisposing it to make automatically and instinctly the appropriate bodily movements. But it is born heir to a social tradition. Its parents and elders will teach it how to make and use equipment in accordance with the experience gathered by ancient generations. And the equipment it uses is itself just a concrete expression of this social tradition. (Gordon Childe: What happened in history, 1964, pp. 15-16)

অনুসন্ধানে অসুবিধা ঘটবে।

মেরিল, চিনয়, লিনটন, লেভি* প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতের মত সামান্যীকৃত করলে বোঝা যায় যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) বলতে এঁরা সহজাত প্রবৃত্তির তৃপ্তির পথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কথাই বুঝেছেন (Linton, Chinoy)।** মেরিল সংস্কৃতি বলতে শুধু নিত্য আভ্যাসিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে যে সহযোগিতা বা প্রতিযোগিতা দেখা দিয়ে থাকে, সেই কথারই উল্লেখ করেছেন। সামাজিক জীবনকে স্বতঃপ্রবাহিত নদীস্রোত মনে করেছেন অনেকে। তাঁরা 'ইনট্রার-সাইকিক'—পারস্পরিক মানসিক দ্বন্দ্ব অথবা 'ইনট্রা-সাইকিক্'—নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য কোনোরকম সামাজিক দ্বন্দ্বের কথার উল্লেখ করতে চান না। এঁরা শ্রেণীর (আর্থনীতিক) কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে ভোলেন না যে পশ্চিমী সমাজে, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণীবৈষম্য কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয়। নীচু থেকে উঁচুতে ওঠার অপর্যাপ্ত সুযোগ আছে, ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও দক্ষতায় পঞ্চম শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে পারে। পঞ্চম শ্রেণী কথাটা বলছি এই জন্যে যে ফিডম্যান কাপলান সম্পাদিত মনোরোগবিদ্যার পুস্তকে, পাঁচটি আর্থসামাজিক শ্রেণীর

---

* Merril : Society and Culture, New Jersey, 1962
Chinoy : Society, An Introduction to Sociology, New York, 1961
Linton : The Study of Man, N.Y. 1936
Levy M. D. : The Structure of Society, Princeton, 1952

** (1) Social Interaction is "a continuous and reciprocal series of contacts between two or more socialized human beings. The nature of these exchanges varies from individual to individual and from one social class to another." (Merril, op. cit., p. 21, 25)

(2) ...The process of socializing individuals and the demand society makes of its members almost inevitably create psychological problems, repressing man's desires and enforcing modes of behaviour which run counter to impulses and drives both innate and acquired (Chinoy op. cit., p. 57)

(3) If Society is to survive, culture must not only provide techniques for training and repressing the individual, it must also provide him with compensation and outlets. If it thwarts and suppresses him in certain direction it must help him to expand in others. It must also provide the individual with harmless outlets for the socially repressed desires. (Linton, op. cit., 413)

উল্লেখ আছে।* এই 'সোশ্যাল মোবিলিটি' ও 'ক্লাস কোলাবোরেশন' তত্ত্বে পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকেই বিশ্বাসী। অন্য দল, যাঁরা মোটামুটি যুক্তিবাদী অথবা যাঁরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তাঁরা কিন্তু এভাবে সমাজকে বা সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াকে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন না যে মানুষের মধ্যে শুধু প্রবৃত্তিমূলক আত্মরক্ষার তাগিদই একমাত্র চালিকা শক্তি। কিশোরদের মানসিকতা গঠনে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও নিজেকে জাহির করে সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির কাছে কিছু প্রত্যাশা করে, এবং শৈশবের অব্যবহিত পরের অবস্থায় কিশোর তার কাছে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করুক আর না করুক, নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়। সাধারণত মাতাপিতা এই ভূমিকা নির্ণয়ের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার পর যদি বিপথে চালিত না হয়, নিজের ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়, অবশ্য এ ব্যাপারে মাতাপিতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক বা আত্মীয় স্বজন অনেকেই সাহায্য করেন। সেই ভূমিকা যদি কিশোরের মনঃপূত না হয় বা তার দরুণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে যদি তার ক্ষমতা না থাকে, যদি সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হয়, তবে তার ফলাফল তার পক্ষে ও অনেক সময় গোটা পরিবারের পক্ষে খারাপ হয়। আবার সে যদি ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট না হয়, তাহলে তাকে পরিবার ও সমাজ সব সময় ক্ষমার চোখে দেখেন না। পরিবার গোষ্ঠী বা সমাজের অকল্যাণ বা ক্ষতিকর কাজে সে যদি লিপ্ত হয় তা হলে তাকে আরো অনেক বেশি অবহেলা ও তাড়না সহ্য করতে হয়। আমাদের সমাজে এবং আজকাল প্রায় সব তথাকথিত সভ্য সমাজে এ বিষয়ে আগের মত বেশি কড়াকড়ি নেই। বেশির ভাগ সমাজই এখন 'পারমিসিভ সোসাইটি'র পর্যায়ে পড়ে। কিশোর মাতাপিতা, শিক্ষক, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশা আচরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্যকে ও নিজেকে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে। সব সমাজেরই একটা নিজস্ব নৈতিকতা ও স্বাভাবিক বিধিব্যবস্থা আছে। আমাদের ও অন্যান্য অনেক সমাজেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় ব্যক্তিকে সেই শৈশব থেকেই। কিশোরদের কাছে এই প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপ্রদ নয়, বিশেষ করে যদি বাবা মা আত্মীয়স্বজন প্রতিযোগিতার উপর অতিগুরুত্ব আরোপ করেন। মাতাপিতার প্রতি আমরা চিকিৎসক হিসেবে দোষারোপ করি বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই প্রতিযোগিতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষম, এবং এই শ্রেণী-সমাজের সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক আদর্শ অথবা স্বাভাবিক

---

* Comprehensive Text Book of Psychiatry, Indian Edition, 1972, pp. 208-209

কর্মসূচির অঙ্গ, যাকে বলা হয় 'সোশ্যাল নর্ম'। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ না করতে পেরে যে সব কিশোর কিশোরীর কোমল মনে আঘাত লাগে, তাদের কিছু কিছু হয়তো বড় হয়ে মনোরোগে আক্রান্ত হয়, হীনমন্যতায় ভোগে। অনেক সময় পরীক্ষায় পিতামাতার আশানুরূপ ফল করতে না পেরে ছেলেমেয়েরা আত্মহত্যাও করে। আমাদের দেশে কিশোর সুইসাইডের সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় বেশি না হলেও, ক্রমশ যে বেড়ে চলেছে—এ বিষয়ে অনেকেই বোধহয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। এই প্রতিযোগিতা ঘটে প্রায়শঃই একই শ্রেণীর (আর্থিক) ছেলেমেয়েদের মধ্যে ; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে অতি তীব্র বিষম ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা শ্রেণী-সমাজেরই বিশেষত্ব। এ বিষয়ে বাজারে চলতি মনোবিদ্যার পুস্তক লেখকেরা খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষালাভের সুযোগ যাদের নেই, যাদের কথা এই অধ্যায়ের গোড়াতেই লিখেছি ; তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আছে ; কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার অসাফল্যকে তাদের সমাজে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না (বুর্জোয়া সমাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব এদের খুব বেশি পরিমাণে সংক্রমিত করেনি) তাই অসাফল্যে তারা মনের দিক থেকে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিশোর কিশোরীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, সহযোগিতাও আছে। কিশোর কিশোরীরা বয়ঃক্রমের কম বেশি অনুযায়ী দল বাঁধে, ক্লাব গড়ে, অনেক সহযোগিতামূলক কাজকর্মও করে। যে শ্রেণীর কিশোর কিশোরীদের কথা পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় তারা বেশির ভাগই সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পড়ে। 'পিয়ার গ্রুপ' কথাটি আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার ব্যবহার করেছি ; কথাটি মনস্তত্ত্বের পুস্তকে খুবই প্রচলিত। অনেকেই মনে করেন শিশু ও কিশোর মানসিকতা গঠনে মাতাপিতা ও 'সমবয়সী'দের প্রভাবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ (Coleman 1971, op, cit., p. 55)। কিন্তু অন্যান্য প্রভাবকে আজকের দিনে তুচ্ছ বলা চলে না। সমবয়সীদের প্রভাবকে এঁরা আলাদা আলাদা করে বিচার করেননি। মধ্য কিশোর ও অন্ত কিশোরীদের দল বা গোষ্ঠী নানা রকমের আছে : সহপাঠী, পাড়ার ছেলে, আত্মীয় স্বজন, ক্লাবের ছেলে আছে, এ ছাড়াও হালে আবার রাজনৈতিক গোষ্ঠী সব পাড়ায়, মহল্লায়, এবং স্কুলে তৈরী হয়েছে। এরা সবাই আলাদা আলাদা 'পিয়ার গ্রুপ'। এদের সকলেরই কিছু কিছু প্রভাব মিশুকে স্বভাবের বহির্মুখীন কিশোরদের ওপর পড়বেই। কিশোর যে 'পিয়ার গ্রুপে'র চর্চার বিষয় বা ক্রিয়াকলাপের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হবে, যাদের সঙ্গে বেশি আত্মীয়তা ও নৈকট্য অনুভব করবে, তাদের প্রভাব তার ওপর বেশি পড়লেও, অন্য গ্রুপের প্রভাবও নগণ্য হবে না। এ মিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা আগে একবার বলেছি। আবার যে কিশোর অন্তর্মুখীন, অথবা শুধু শিল্পসাহিত্যে অনুরাগী, সেও নানা ধরনের নন্দনতত্ত্বের বিকর্ষণ আকর্ষণের মধ্যে

পড়বে। কোনো বিশেষ 'পিয়ার গ্রুপে'র প্রভাবে কিশোর বড় হয়ে উঠছে বলে মনে হয় না। আজকালকার কিশোরদের রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ স্বাধীনতাপূর্ব কিশোরদের থেকে বেশি না কম এ নিয়ে কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কলেজ স্কুলে সব রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন আছে, এ-থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে কিশোর কিশোরীরা স্বাধীন ভারতে আগের তুলনায় অনেক বেশি রাজনীতিমনস্ক। এই সব কিশোর কিশোরীরা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি বাকৃপটু, বহির্মুখীন, একরোখা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা বেশি সমাজসচেতন, না এদের রাজনীতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আদর্শের অনুপ্রেরণা, না আত্মপ্রকাশের তাগিদ ও আত্মরক্ষাভিত্তিক প্রবৃত্তি সে কথা বলা কঠিন। এরাই কিন্তু একমাত্র কিশোরগোষ্ঠী দ্বারা সংঘবদ্ধ ও যাদের নির্দিষ্ট কোনো 'পীয়ার কালচার' আছে বলা চলে। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনীতির মতবাদে পরিবর্তন ঘটতে পারে। এরা সাধারণত কোনো তরুণ বা বর্ষীয়ান নেতার অনুবর্তী, দল বা মত পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। এই ব্যাপারটা প্রথম দিকে পরিবার বা গুরুজনদের কাছ থেকে গোপনে রাখা হয়। যদি গুরুজনদের কোনো রাজনৈতিক রং থাকে তবে অবশ্য লুকোচুরির প্রয়োজন হয় না। অনেক সময়, বিশেষ করে গত দশকের আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলনের যুগে দেখা মাতাপিতার রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক মতামতকে কিশোররা (তরুণ ছাত্রদের অনুকরণে) অগ্রাহ্য করে অন্য ধরনের তত্ত্বাশ্রয়ী হয়েছে। আমি কিন্তু অন্ত কিশোর ও মধ্য কিশোরদের কথা বলছি। অল্পবয়সী কিশোররা সাধারণত খেলাধূলা, সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত থাকে ও পারিবারিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। মধ্য ও অন্ত কিশোরের ক্ষেত্রে চলতি মনস্তত্ত্বের পুস্তকে তাদের যৌনতা খেলাধূলা, ও অস্বভাবী আচরণ সম্বন্ধে বেশি লেখা হয়েছে, রাজনৈতিক প্রবণতা নিয়ে সাময়িক পত্রের পাতায় আলোচনা হলেও পাঠ্যপুস্তকে এ সম্পর্কে খুব খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। বর্তমান সময়ের কিশোরদের ওপর মাতাপিতা ও সমবয়সীদের প্রভাব, 'পেরেণ্টাল ও পিয়ার কালচার'—দুই কালচারেরই প্রভাব ক্ষীয়মাণ বলে মনে হয়। মা-বাবা, শিক্ষকদের অপেক্ষা কিছু সংখ্যক কিশোর কিশোরীর উপর রাজনৈতিক দাদাদের, আর কিছু সংখ্যকের উপর সিনেমা-নায়ক ও খেলার মাঠের হিরোদের প্রভাব বেশি - একথা বললে বোধ হয় খুব বেশি প্রতিবাদ হবে না। শ্রেণী সমাজের পরিবৃত্তিকালীন সংকটে আজকের কিশোর কিশোরীর মনে উন্মেষ উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নানারকমের প্রতিরক্ষামূলক মানসিকতার ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মস্তিষ্কের তড়িৎলিখন ও সূক্ষ্ম জালতন্ত্র
(E. E. G. and Reticular Formation)

প্রথম সংস্করণের কিছু উৎসাহী পাঠক শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। চিঠি লিখে তাঁদের ঔৎসুক্য মেটাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁদের প্রশ্ন তুলে প্রাথমিক পরিচিতির এই বইটি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবে কিছু কিছু সম্মার্জন ও সংযোজন প্রয়োজনানুযায়ী করতে হয়েছে। তার ফলে, উৎসাহী পাঠকরা বোধ হয় কিছুটা সন্তুষ্ট হবেন।

এখানে মস্তিষ্কের তড়িৎ-লিখনচিত্রের (E. E. G.) মাধ্যমে শর্তাধীন পরাবর্ত বুঝতে গিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষক যে-সব প্রশ্ন তুলেছেন এবং পাভলভের সহকর্মীরা —বিশেষ করে পি. কে. আনোখিন সেই সব প্রশ্নের যে-সব মীমাংসা করেছেন— সেই সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু জানাতে চেষ্টা করছি। এ-ছাড়া, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম-জালতন্ত্রের (Reticular Formation) ক্রিয়াকলাপ ও মস্তিষ্ক-বল্কলের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনার কিছু কিছু এখানে বিবৃত করা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে প্রথম সংস্করণে খুবই সামান্য বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

আনোখিনের পরীক্ষাগারের লাপটেভই (১৯৪১, ১৯৪৭) বোধ হয় প্রথম পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তের তড়িৎ-লিখনচিত্রের পরীক্ষাকার্য শুরু করেন। তারপর থেকে নানাদেশের আরো অনেক ল্যাবরেটরিতে শর্তাধীন পরাবর্তকালীন মস্তিষ্কের তড়িৎ-লিখন চিত্রগ্রহণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমানে E. E. G.—স্নায়ুবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃত এবং নিজস্ব পরিভাষায় সমৃদ্ধ। মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঠিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুসংস্থা সম্পর্কে তড়িৎ-লিখনবিদ্‌দের নিজস্ব ধ্যানধারণা দিয়ে তাঁরা পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে রত। সাম্প্রতিককালে তড়িৎ-প্রবাহ সম্পর্কে উৎসাহী গবেষকরা আবার সূক্ষ্মজালতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও 'থ্যালামাস' (মস্তিষ্ক কাণ্ডের অংশবিশেষ) এর সঙ্গে উচ্চমস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কিছু কাজ করতে চাইছেন (cortico-subcortical relation)। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিশ্লেষণের সাহায্যে শর্তাধীন পরাবর্ত যাঁরা অধ্যয়ন করতে চান, তাঁদের শুধু তড়িৎ-লিখনযন্ত্র ও চিত্রের বিশেষজ্ঞ হলেই চলছে না; পাভলভীয় মস্তিষ্কবিদ্যা ও মস্তিষ্ক কাণ্ডের

শারীরবৃত্ত সম্পর্কও তাঁদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন ঘটছে।

আনোখিন ও অন্যান্য পাভলভ-পন্থীরা মনে করেন এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণায় শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কিত পাভলভীয় বিশ্লেষণকে কেন্দ্রবিন্দু করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। অন্যথায় নানারকমের ভ্রান্তি ও ভুলবোঝাবুঝি ঘটবার সম্ভাবনা। বাস্তবে ঘটছেও তাই। তড়িৎ-লিখনচিত্র থেকে পাওয়া চিহ্নগুলির ভাষান্তরণ অনেক বিভ্রাটের সৃষ্টি করছে। মস্তিষ্ক-বল্কল (Cerebral Cortex) ও সূক্ষ্মজালতন্ত্রের সম্পর্ক ও শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনে তাদের ভূমিকা নিয়েও মতানৈক্য ঘটছে।

এই সব বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করে বিভিন্ন শাখার গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্তগুলির সমন্বয় সাধন সম্ভব। বিদ্যুৎ-লিখনযন্ত্রের চিহ্নগুলির সঠিক তাৎপর্য ও শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক উপাত্তগুলির সঙ্গে তাদের ব্যতিক্রম ও পার্থক্যের কারণ নির্ণয়ের আন্তরিক চেষ্টা করা হলে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্য দূর হবে, বলেছেন আনোখিন।

শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের অগণিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আজ মস্তিষ্ককোষ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত, অনেক রহস্য মীমাংসিত এবং পরাবর্ত গঠনের জ্ঞানও সম্প্রসারিত। বেশির ভাগ মস্তিষ্ককোষ, বিশেষ করে পেশী সঞ্চালক কোষ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগ সেতু অজস্র। নির্দিষ্ট একটি পরাবর্ত সংগঠনে অজস্র সংযোগসেতুর নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র বিজড়িত হয়; অন্যগুলি সাময়িকভাবে অক্রিয় থাকে। অন্যান্য কোষগুলিরও (উচ্চমস্তিষ্কের নিম্নমস্তিষ্কের যোগাযোগকারী) কোনো কাজ থাকে না। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের কোষগুলিও ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে একগোত্রের নয়, সমরূপ নয়। মস্তিষ্কবল্কলের ক্ষুদ্রতম অংশের কোষও বহু শাখান্বিত ও বহুধরনের সংযোজনের ফলে ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মী।

শারীরবৃত্তিক দিক থেকে এই সঠিক তথ্য জানার পর, স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগবে যে তড়িৎ-লিখনচিত্রের সংকেত আমাদের এই পরাবর্ত গঠনের ভিত্তির—অর্থাৎ অধঃস্তরের এই সূক্ষ্ম-সংযোজনের সঠিক সংবাদ দিতে পারে কি ? তড়িৎ-লিখনে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশের বিশেষত্বের সন্ধান মেলে কি ?

আমরা জানি, সাধারণত যে-ভাবে তড়িৎ-লিখনলিপি গৃহীত হয়, তার দ্বারা মস্তিষ্কের অনেকখানি অংশের মোটামুটি সাধারণ অবস্থা মাত্র প্রতিফলিত হতে পারে। লিখনযন্ত্রের বিদ্যুৎবাহ প্রান্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেহের উপরিস্থলে স্থাপিত করা হয়, কাজেই মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ ও ক্ষুদ্রতম অংশের সংবাদ (শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনে, আগেই বলেছি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের কয়েকটি কোষের অজস্র সংযোগসম্ভাবনার কয়েকটি মাত্র অংশগ্রহণ করে) পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। অবশ্য মাইক্রো-ইলেক্ট্রোড পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র একটি অংশের

কোষ-সংক্রান্ত সংবাদ পাওয়া যায়, এবং সেইভাবে Jasper* শর্তাধীন পরাবর্ত-বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। চেষ্টা করা সত্ত্বেও Jasper বিশেষ ফল লাভ করতে পারেন নি।** পরবর্তীকালে Towe ও Amassian (Towe. A, and Amassian, 1958) Jasper-এর পদ্ধতিতে মানুষ ও জন্তুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্ত করেন যে উপরিগত ও গভীর দুরকমের তড়িৎ-লিখনচিত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো সম্পর্ক আবিষ্কার সম্ভব নয়।*** Bremer (1943)-এর তড়িৎ-লিখনচিত্র বিশ্লেষণ করার পর, বোঝা গেল যে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত মস্তিষ্ককোষের বহুমাত্রার উত্তেজনা তরঙ্গ, যা সবসময় একের পর একটি পরস্পরকে প্রতিস্থাপিত করে মস্তিষ্কের বহুমুখীন অভিযোজন ক্ষমতা সৃষ্টি করে তার ছবি তড়িৎ-লিখন চিত্রে ঠিকমত প্রতিফলিত হয় না। শর্তাধীন পরাবর্তের গবেষকরা তা বলে তড়িৎ-লিখনচিত্রের মূল্য অস্বীকার করেন না। পরাবর্ত গঠনের সূক্ষ্ম কারুকার্য চিত্রে ধরা না পড়লেও, তাঁরা জানেন উত্তেজনা তরঙ্গের ফলে চিত্রে সময়মত পরিবর্তন ঘটে।**** বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার

---

* Jasper H. H. and Cruikshask R. M. 1947 & Jasper & Penfield W. 1949

** These investigations lead H. H. Jasper to the conclusion that the E E G index of the conditioned reflex cannot, with the necessary precision, be correlated with the neuro-physiological indexes of the state of individual nervous cells or as he puts it 'through the E E G indexes the conditioned reflexes cannot be expressed in terms of excitation and inhibition (Anokhin, P. K., Electro-encephalographic Analysis of the Conditioned Reflex, (Moscow Press 1958 —reported by Pribram, K. H., in Brain & Behaviour —3, 1969, p. 134).

***Similar experiments have also been made in recent years by other authors on animals and man under conditions of neurosurgical interference. The results of these observations lead to this conclusion—that no definite correlations can be established between a deep and superficial E E G, and between the individual elements and the electro-encephalogram (Ibid).

**** Thus the question is not in denying any significance of the E E G in recognising the intimate mechanism of the conditioned reflex, but in determining with sufficient authenticity the place occupied by the wave electrical activity in the system of the finest selective inter-neuronic interaction which forms the basis of the conditioned reflex (Ibid).

ব্যাপারে মত পার্থক্যের কারণগুলি তুলে ধরবার জন্য এত কথা বলা হল। যদিও শর্তাধীন পরাবর্তের উত্তেজনা নির্দিষ্ট সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং প্রবাহের ধারায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাহলেও খুব সংক্ষিপ্ত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গোটা মস্তিষ্কে পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রতিক্রিয়া তড়িৎ লিখন চিত্রে ধরা পড়ে।

এছাড়া, মনে রাখা দরকার এই তাড়িৎশারীরবৃত্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে মস্তিষ্ক বিষয়ক জ্ঞান আমাদের বেড়েছে ও পরাবর্ত সম্পর্কিত অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। পাভলভের সময় তাড়িৎশারীর বৃত্তিক পদ্ধতিতে গবেষণার (electrophysiological investigations) কোনো সুযোগ ছিল না; মস্তিষ্কের ভেতরে কি ঘটছে সেটা মূলত পরীক্ষকরা বাইরের প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করতেন; কিন্তু পাভলভের অকৃত্রিম বিজ্ঞান-মনস্কতা ও আরোহী প্রথায় বিচার, একই পরীক্ষা অনেককে দিয়ে করিয়ে তথ্যের ওপর বিষয়ীগত প্রভাব কমিয়ে আনা, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী মনে অন্ধ বিশ্বাসের (dogma) স্থান না থাকা ইত্যাদি কারণের দরুণ এই অনুমান প্রকল্পগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাভলভের জীবদ্দশা থেকেই পাভলভের পরীক্ষাগারে তড়িৎ-চুম্বক পদ্ধতি প্রয়োগ হতে থাকে। পরবর্তীকালে এবং বর্তমানে শারীরবৃত্তিক পরীক্ষানিরীক্ষার আধুনিকতম পদ্ধতির সাহায্যে কাজ করার ফলে পাভলভীয় গবেষকরা মানব-মস্তিষ্কের উপর স্বাভাবিক পরিবেশে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। এ-সুযোগ আগে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। উচ্চ ও নিম্ন মস্তিষ্কের (cortex and sub-cortex) পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণে শর্তাধীন পরাবর্তের বিশ্লেষণের গুরুত্ব—মস্তিষ্ককাণ্ডে অবস্থিত সূক্ষ্মজালতন্ত্র (reticular formation) ও থ্যালামাসের বিশেষ শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া জানবার পর—আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চাশের থেকে ষাটের দশকের মধ্যে এই সূক্ষ্মজালতন্ত্র নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এই সব কাজ করা কিছুদিন আগেও সম্ভবপর ছিল না। তাড়িৎশারীরবৃত্তিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের ফলেই আমরা মস্তিষ্ককাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। সোভিয়েত দেশে শুধু নয়, জার্মান ও ফরাসী বিজ্ঞানীরাও এই দিকে অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমরা খুব সংক্ষেপে সেই সব তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিচার থেকে পাভলভপন্থীরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, সেই সিদ্ধান্ত সহজ করে পরবেশন করছি:

(১) কিছু কিছু পরীক্ষকের মতে বিশ শতকের প্রথমদিকে বহির্জগতের উদ্দীপনা মারফত্ অন্তর্মুখ উত্তেজনাপ্রবাহের ধ্রুপদী পথটি সূক্ষ্মজালতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ জানার পর আরো নির্দিষ্ট হয়েছে এবং পথের কিছুটা পরিবর্তন মেনে নিতে হয়েছে। আগেকার মত উত্তেজনাপ্রবাহ কেবলমাত্র

মস্তিষ্কবল্কলের উপরিভাগে সমতলক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং আনুভূমিক (horizontal) এখন আর ভাবা চলে না। এর উল্লম্ব (vertical) পরিব্যাপ্তিকে মেনে না নিলে অনেক পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যা চলে না। বলা উচিত, মস্তিষ্কের উত্তেজনাপ্রবাহের গতিবিধি শুধু মস্তিক-বল্কলের কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বল্কলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও পরবর্তীকালে নীচুর দিকের নিম্নমস্তিষ্কের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে।

(২) এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্ন, শর্তাধীন পরিবর্তগঠনে উচ্চ-মস্তিষ্কের দুটি অংশের কার্মিক সংযোজনের প্রশ্নটিও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। একটি আলোচনা চক্রে (1958, London) কিছু গবেষক (Gestaut 1957, Fessartand Gestaut, 1958) বহু তথ্য সমাবেশ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন, এই সংযোজন (Coupling) মস্তিষ্কবল্কলে বা উচ্চমস্তিষ্কে গঠিত হয় না, এই সংযোজন ঘটে সূক্ষ্মজালতন্ত্রে। এই সিদ্ধান্ত পাভলভের ধারণাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিল কি ? অন্তত বেশ কিছু বিজ্ঞানীর মনে ঐ সময় এই রকম ধারণার উদয় হয়েছিল। পাভলভ কিন্তু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মস্তিক বল্কলের বা উচ্চমস্তিষ্কের বাইরেও শর্তাধীন পরাবর্ত গঠিত হতে পারে।* আনোখিন পাভলভের এই উদ্ধৃতি দিয়ে নিজে উপরে উদ্ধৃত পণ্ডিতদের তথ্যগুলি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, নিজের ও সহকর্মীদের নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নিম্নমস্তিষ্কের সংযোজনগুলি উচ্চমস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।** প্রসঙ্গত আনোখিন বলেছেন পরিচিত কোনো 'খারাপ' লোককে একগাদা লোকের মধ্যে দেখলেও আমাদের খারাপ লাগে। এই খারাপ লাগাটা নিঃসন্দেহে শর্তাধীন পরাবর্ত জাতীয় প্রতিক্রিয়া। যদি মনে করা হয়, এই খারাপ লাগাটা একটা প্রক্ষোভসংক্রান্ত পরাবর্ত, কাজেই এর গঠনস্থান নিম্নমস্তিষ্কের কাণ্ডের কাছাকাছি (থ্যালামাস,

---

* Sometimes, under some special conditions, the conditioned reflexes are also formed outside of the cerebral hemispheres in other parts of the brain. (Pavlov : Works, 1949 Vol III p 169, Russian Edition).

** Coming back to the conception of Fessard and Gestaut concerning the conditioned coupling in the subcortical formations,...I should like to note....these conditioned connections are historically linked to the controlling function of the cortical neuron (op. cit).

হাইপোথ্যালামাস, সূক্ষ্মজালতন্ত্র ইত্যাদির অবস্থান যেখানে) কোনো জায়গায়, তাহলে ভুল করা হবে। কেননা ভিড়ের মধ্যে লোকটিকে খারাপ বলে সনাক্ত করণের ব্যাপারে নিশ্চয়ই উচ্চমস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়!

আনোখিন ও তাঁর সহকর্মীদের পরীক্ষা থেকে আরো জানা গেছে যে প্রতিরক্ষামূলক শর্তাধীন পরাবর্তের অভিব্যক্তি প্রথমেই দেখা যায় মস্তিষ্ককাণ্ডের সন্নিহিত সূক্ষ্মজালতন্ত্রে। তড়িৎলিখনচিত্রে সমতাল ছন্দের, সেকেণ্ডে 4—6 মাত্রার (4 to 6 cycles per second) চিহ্ন দেখা যায়। খাদ্য পরাবর্তে এ ধরনের চিহ্ন পাওয়া যায় না ; তড়িৎলিখনচিত্রে দেখে বোঝা যায়, স্পন্দনের দ্রুততা বেড়েছে। থ্যালামাস ও সূক্ষ্মজালতন্ত্রের সূক্ষ্ম ছন্দোবদ্ধ চিত্রলিখন শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক পরাবর্তের প্রতিক্রিয়া। এবং এই অবস্থায় মস্তিষ্কবল্কলে সূক্ষ্মজালতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক ক্রিয়াকলাপের ফল পরিলক্ষিত হয়।

শর্তাধীন পরাবর্ত দুটি স্বতন্ত্র অথচ প্রায়ই একই পর্যায়ের উপাদানে গঠিত। প্রথমটি সংযোজন (coupling) ও দ্বিতীয়টি সংকেত (signalization),— সতর্কতার সংকেত। এই দুটি উপাদানের শারীরবৃত্তিক গঠন ও ব্যবস্থার সম্যক উপলব্ধি ছাড়া শর্তাধীন পরাবর্ত-এর জটিলতা বোঝা যায় না। তড়িৎলিখন চিত্রের সাহায্য বর্তমানে শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্ক গবেষণায় অপরিহার্য, কিন্তু তড়িৎলিখনবিদ পরাবর্তের জৈবিক উপযোগিতা—বিশেষ করে সংযোজন ও সংকেতের শারীরবৃত্তিক গঠন ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হলে—তাঁদের সাহায্য ও তড়িৎলিখনচিত্র বিরোধ বিসংবাদেরই সৃষ্টি করবে, বিজ্ঞানী মহলে বিভ্রান্তি বাড়বে—কোনো পক্ষেরই অগ্রগতির সহায়ক হবে না।

Ref :

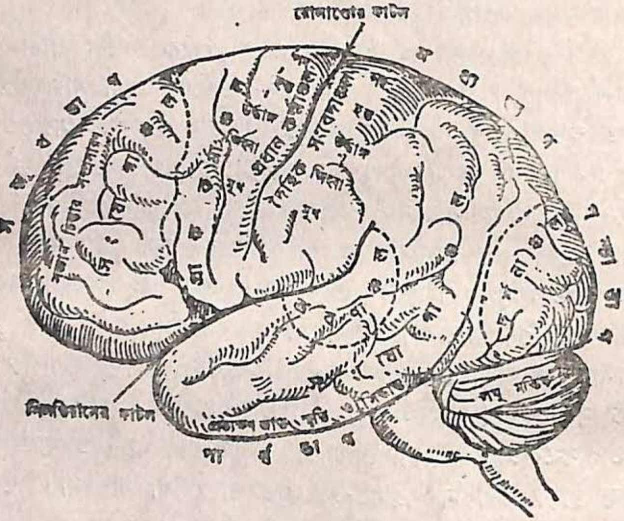
(1) Amassian V. E. (1953) EEG clin, Neurophysical Vol 5, pp 415-38.

(2) Anokhin, P. K. (1949) The main problem in the study of higher activity, The Problems of higher Nervous activity, (Russ) Moscow p 105

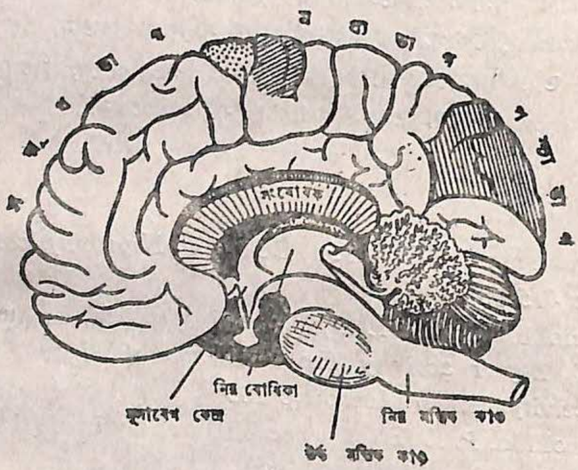
(3) Anokhin. P. K. Electro-encephalic analysis of the conditioned Reflex, Moscow, 1958,

পরিশিষ্ট

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল



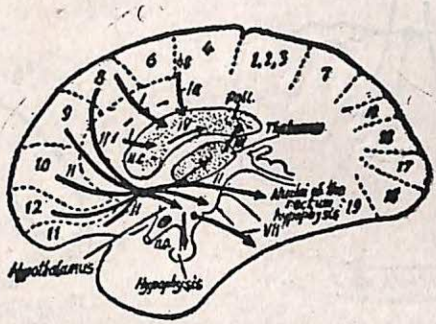
চিত্র-ক—গোলার্ধের বাইরের দিক



চিত্র-খ—গোলার্ধের বাইরের দিক

(চিত্র দুটি নেওয়া হয়েছে 'মনোবিজ্ঞান পরিচয়' থেকে)

চিত্র-গ – মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র

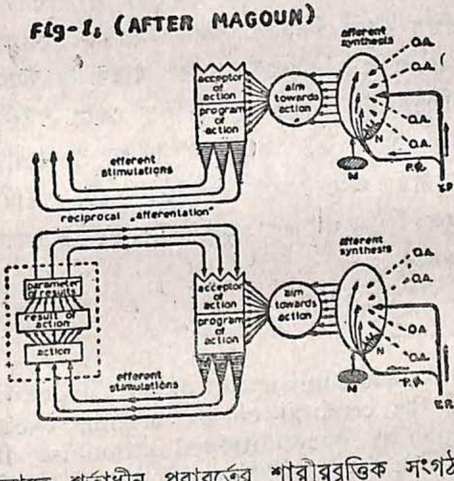


(গোলার্ধের ভেতরের দিক)

9, 10. 11 ও 12—আগেকার ধারণামত সম্মুখপিণ্ডস্থ মন-সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষেত্রগুলি ; 4 ও 6 চৈষ্টিক কেন্দ্র ; 1, 2 ও 3 সাধারণ সংবেদীয় কেন্দ্রসমূহ , 17—দৃষ্টিকেন্দ্র

শর্তাধীন পরাবর্তের আদর্শ নক্সা

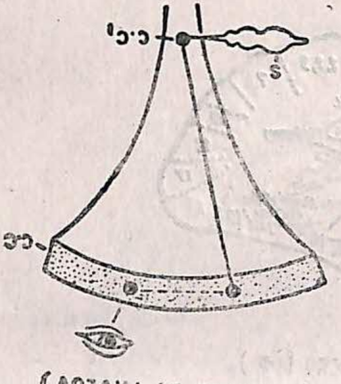
Fig-1, (AFTER MAGOUN)



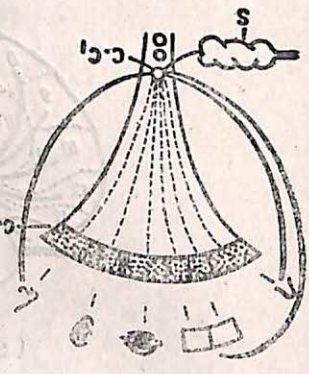
এই আদর্শ নক্সাতে শর্তাধীন পরাবর্তের শারীরবৃত্তিক সংগঠন ও আচরণের প্রক্রিয়া বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পাঁচটি ধাপে নিম্নে বর্ণিত ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হয়। (Magoun 1963)

(ক) এ্যাফেরেন্ট (afferent) সংশ্লেষণ ; (খ) কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ ; (গ) কাজের অনুমোদন ও প্রোগ্রাম গঠন ; (ঘ) এফেরেন্ট (efferent)-এর উদ্দীপন ও কার্যকলাপ ; (ঙ) কার্য-অনুমোদকের দিকে কার্যকলাপের বিভিন্ন সংবাদ পরিবহণ।

শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কে পাভলভের ধারণা



পাভলভের প্রাথমিক ধারণা



পাভলভ পরিবর্তিত ধারণা

প্রথমে পাভলভ ভেবেছিলেন যে, শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের সময় মস্তিষ্ক-বল্কলের বিভিন্ন সংবেদক অঞ্চলের সঙ্গে বহির্বাহী ও অন্তর্বাহী নার্ভের মাধ্যমে নিম্নমস্তিষ্কে অবস্থিত লালা নিঃসরক কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। পরে সিদ্ধান্ত করেন যে, শর্তহীন পরাবর্তের কেন্দ্র মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর বেলায় শুধু নিম্নমস্তিষ্কে অধিষ্ঠিত নয়, মস্তিষ্কবল্কলেও কিছু কোষ শর্তহীন পরাবর্ত গঠনের সময় উত্তেজিত হয়। এই সময় মস্তিষ্কবল্কলে কোনো শর্তাধীন উদ্দীপনা পৌঁছুলে দুই উত্তেজিত অংশের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে, শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের সময় মস্তিষ্কবল্কলের বিভিন্ন সংবেদক অঞ্চলের আনুষঙ্গিক আন্তর-বল্কলিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।*

---

* During the accomplishment of each unconditioned reflex... cells of the cerebral cortex become excited, which are acted upon by unconditioned stimulus. If this coincides in time with the excitation of other cortical cells stimulated by the action of the conditioned stimulus the latter are coupled cortically with the cortical representation of the unconditioned stimuli. (Bykov : A Text Book of Physiology, Moscow, p 598)

ইংরাজী মানবমন Vol. 3 No. 1 এ প্রকাশিত ডাঃ অসীম কুমার দত্তের প্রবন্ধ থেকে Figs 1, 2 & 3 নেওয়া হয়েছে।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

উৎসর্গ

কুমুদ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

পাভলভ ও ফ্রয়েড

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ও ইভান পেত্রভিচ (১৮৪৯-১৯৩৬) সমসাময়িক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করে বিশ শতকের তিরিশের দশক অবধি তাঁরা নিজস্ব পদ্ধতিতে মনোবিদ্যাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। মনোবিদ্যার গবেষণায় দুই বিপরীত ধারার প্রবর্তক হিসেবে এঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাভলভের জীবনে তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব যেমন তাঁকে বিশেষভাবে উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, ফ্রয়েডের বেলাতেও তেমনি তাঁর পরিবেশের ঘাতপ্রতিঘাত তাঁকে নির্জ্ঞান মনস্তত্ত্বের গবেষণার পথে চালিত করেছিল। আমার এই উক্তি থেকে যেন এই ধারণা কারুর না জন্মায় যে ব্যক্তি-প্রবণতা পরিবেশের দ্বারাই কেবলমাত্র নির্ধারিত। ব্যক্তিও পরিবেশকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে এবং ব্যক্তিমস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ও শৈশবে গঠিত পরাবর্ত পরিবেশকে বিশ্লেষণ করতে ও উদ্দীপক বাছাই করতে বহুলাংশে সাহায্য করে।

ফ্রয়েড ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নির্জ্ঞানতত্ত্ব

ফ্রয়েড ইহুদী পরিবারে জন্মেছিলেন; কিন্তু তাঁর পিতা জেকবের ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি ছিল না বললেই চলে। বিজ্ঞানের সাহায্যে একদিন সব কিছুর ব্যাখ্যা করা যাবে এবং মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি একদিন তাকে সবরকমের সংস্কার থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় ভেদাভেদ লুপ্ত করবে—এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা খৃষ্টানদের ইহুদীবিদ্বেষে উৎপীড়িত হয়ে বহুবার বাসস্থান বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র বাণী ইহুদীদের মনে কিছুটা আশাভরসার উদ্রেক করেছিল—কিন্তু সে মাত্র কয়েক বছরের জন্য। ফ্রয়েডের বয়স যখন চার বছর তখন ইহুদীবিদ্বেষ তীব্রতরভাবে প্রকাশ

পায়, তার ফলে জন্মস্থান পরিত্যাগ করে পরিবারের সঙ্গে ভিয়েনাতে এসে জেকব আশ্রয় লাভ করেন। শৈশব থেকেই ফ্রয়েড মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি লাতিন, গ্রীক, হিব্রু, ইংরাজী—ইত্যাদি নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সমকালীন অনেক তরুণদের মত ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ (evolution) তাঁকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু তখন ইহুদীদের পক্ষে চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় শিক্ষালাভ করা সহজ ছিল না। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ডাক্তারী পড়তে সুরু করেন। রোগ ও নিদানতত্ত্বের চেয়ে শারীরবিদ্যার জ্ঞান অর্জনে তিনি অধিকতর মনঃসংযোগ করেন। এ-ব্যাপারে তৎকালীন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী (Ernst Brücke) তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও প্রভাবিত করেন। ইনি বিশ্ববিখ্যাত হেলমহোৎজ (Helmholtz)-এর সহযোগী ছিলেন। হেলমহোৎজ ও তাঁর সহযোগীরা (Raymond Ludwig and Brücke) সেই সময়কার ভাববাদী দর্শন অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানীদের 'জীবনশক্তি', 'ইলান-ভাইটাল', 'আত্মা'—ইত্যাদি অবাস্তব পরিকল্পনার ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। তরুণ ফ্রয়েড এঁদের প্রভাবে প্রথমজীবনে এঁদের মত নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। বস্তুবাদী শারীরবিদ্যা প্রসারের আন্দোলনকারী প্রবক্তাদের শপথ* অনুযায়ী নিজেকে বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত করেন। অভিব্যক্তি-বাদ-এর (Darwinism) প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হবার বস্তুবাদসম্মত কারণ অনুসন্ধানের গবেষণায় তখন অনেক বিজ্ঞানী মেতে উঠেছেন ; তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ফ্রয়েডের মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবসৃষ্টির ধর্মীয় উপাখ্যানের বিরুদ্ধে ডারুইন-অনুগামীদের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অনুপ্রাণিত ফ্রয়েড জীবনের প্রথম পর্বে শারীরবিদ্যার বিশেষ বিভাগ—স্নায়ুবিদ্যার (Neurology) চর্চায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। নিউরোন-থিওরির মূলে ফ্রয়েডের প্রথম পর্বের গবেষণার অবদান অনস্বীকার্য। দীর্ঘ বিশ

* No other forces than the common physical chemical ones are active within the organism. In those cases which cannot at the time be explained by these forces one has either to find their specific way or form of action by means of the physical-mathematical method or to assume new forces equal in dignity to the chemical-physical forces inherent in matter, reducible to the force of attraction and repulsion. (Ernst Jones, The Life and Works of S. Freud, Vol. I New York, 1935).

বছর ধরে ফ্রয়েড বিজ্ঞানচর্চা করেন। তাঁর গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল অনুবীক্ষণের সাহায্যে স্নায়ুকোষের সাংগঠনিক বিন্যাস অবলোকন ও অনুধাবন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। এই পর্বের ফ্রয়েডকে 'র‍্যাডিকাল-মেটিরিয়ালিষ্ট' আখ্যায় অভিহিত করেছেন ফ্রয়েডশিষ্য আর্নস্ট জোন্স।

তাঁর শিক্ষকের (Brücke) ইনষ্টিটিউটে সুষুম্নাকাণ্ডের (spinal cord) জাতিজনিক (phylogenetic) বিকাশ (development) ও পরে সুষুম্নাশীর্ষের (medulla oblongota) ব্যক্তিজনিক বিকাশের গবেষণার জন্য বিশেষ ফেলোশিপ ও বৃত্তিলাভ করে তিনি প্যারীতে শার্কোর নিউরোলজি ক্লিনিকে প্রায় চারমাস অতিবাহিত করেন। এখানে হিষ্টিরিয়া রোগের একটি বিশেষ উপসর্গ—অসাড়তার (paralysis) প্রতি তাঁর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। অসাড়তা দৈহিক আঘাত থেকে হতে পারে আবার মানসিক আঘাত থেকেও অনেক সময় অসাড়তা হয়ে থাকে। দৈহিক আঘাতের ইতিহাস সহজেই জানা যায়, বোঝাও যায়, কিন্তু হিষ্টিরিয়ার অসাড়তার মানসিক কারণ শুধু অনুমান করাই যায়। শার্কোকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ফ্রয়েড শুনলেন যে হিষ্টিরিয়াজনিত অসাড়তার মূলে থাকে 'ডিনামিক-ট্রমা'; ডিনামিক কথাটির অর্থ বেগবান,সক্রিয়, গতিসম্পন্ন—যাই হোক না কেন, তার তাৎপর্য অনুধাবন সহজ নয়। শার্কো 'ডিনামিক-ট্রমা' কথাটির ওপর বিশেষ আলোকপাতে সক্ষম হলেন না। কুকুরের লালা ঝরার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাভলভ উচ্চমস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিশেষ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞান গড়ে তোলেন। তেমনি এই 'ডিনামিক-ট্রমার' অর্থ আবিষ্কার করতে ফ্রয়েড তাঁর ত্রিস্তরভিত্তিক মনস্তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন, সাইকোএ্যানালিটিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন: স্নায়ুবিদ্যার পরীক্ষামূলক গবেষণা ছেড়ে অনুমান-ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব প্রণয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এর প্রভাবে সুষুম্নাকাণ্ডের মূল্যবান গবেষণা সম্পর্কে পরবর্তীকালে তাঁর সমস্ত অনুরাগ দূর হয়ে যায়।*

---

* The medulla oblongota is a very serious and beautiful object. I recall exactly how much time and effort I devoted to its study several years ago. But now I must say that I do not know of anything more indifferent to the psychological understanding of fear than the knowledge of the nervous path travelled by its excitation: (Quoted by Popov in Psychopathology and Psychiatry, Foreign Language Publishing, Moscow, p 418 from Gesammelte Werke XI, Bd, S. p 408).

কি ভাবে এবং কেন মস্তিষ্ক এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পরিহার করে দূর-কল্পনাভিত্তিক মনের প্রকোষ্ঠ ও নির্জ্ঞান-প্রাধান্যভিত্তিক মানসিক ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কারে আগ্রহী হলেন ফ্রয়েড ? এ-সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি।

শার্কোর ক্লিনিক থেকে ফিরে এসে ফ্রয়েড ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিবাহের পর ভিয়েনাতে স্নায়ুচিকিৎসায় ব্রতী হলেন। পাভলভের মত অর্থাভাব না থাকলেও ফ্রয়েডেরও অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল ছিল না। আর্থিক অভাব তাঁকে ততটা পীড়িত না করলেও রোগীরা তাঁকে বিব্রত করল। তাঁর কাছে যে-সব রোগী আসছিল, তাদের বেশীর ভাগেরই কোনো আঙ্গিক আঘাত বা রোগ ছিল না। তাদের রোগের কারণ—শার্কোর সেই 'ডিনামিক-ট্রমা'—তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দেহে কোনো আঘাত বা ক্ষতের ইতিহাস নেই—অথচ তারা অসুস্থ ; কারণ জানতে না পারলে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় ; তাদের রোগ সারাবার কোনো হদিশই পাচ্ছিলেন না। এই বিব্রত অবস্থায় ফ্রয়েড ফরাসী দেশের নান্সীর এক ডাক্তারের (Bernheim) লেখা একখানি বই পড়েন।* এই বইতে সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্যে মনের অসুখ সারাবার বিবরণ ছিল। এই ভদ্রলোক এক সময় শার্কোর ছাত্র ছিলেন। ফ্রয়েড ঐভাবে চিকিৎসা করে অনেকগুলি রোগীর উপসর্গ খুব তাড়াতাড়ি দূর করতে সক্ষম হলেন। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মেসমারের মত রাতারাতি ফ্রয়েড ভিয়েনার 'মিরাক্‌ল-হিলার' (Miracle healer) হয়ে উঠলেন। তিনি উৎসাহিত হয়ে আবার ফ্রান্সে গেলেন। নান্সীতে গিয়ে পুস্তকের লেখক ও অন্য একজন সম্মোহক-চিকিৎসকের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিজের চোখে দেখলেন। কোনো কোনো রোগীকে গভীরভাবে সম্মোহিত করে স্বপ্নচারী অবস্থায় (somnambulistic) নিয়ে অভিভাবনের সাহায্যে জটিল উপসর্গ নিরাময় করতে দেখে ফ্রয়েড চমৎকৃত হলেন। সম্মোহন-অভিভাবনের সাহায্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে কিন্তু নানাভাবে বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। অনেক রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না, কারুর বা সম্মোহন-নিদ্রা পাতলা হয় ; আরো দেখা গেল, এই পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে উপসর্গ দূর করা গেলেও পুরোপুরি রোগ নিরাময় করা যায় না। তিনি সম্মোহন চিকিৎসার ওপর ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এভাবে মনের রোগের সঠিক কারণ—শার্কো কথিত সেই 'ডিনামিক-ট্রমা'র সন্ধান পাওয়া

---

* Dr. Hippolyte Bernheim : "Suggestion and Its Application as a Therapy"

যাবে না। তবে শার্কো ও অন্যান্য সম্মোহক-চিকিৎসকের সংস্পর্শে এসে তিনি এবিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হলেন যে, শক্তিশালী এমন কোনো প্রক্রিয়া রোগীর মনের গভীরে কাজ করছে—যে সম্বন্ধে রোগী নিজেই বিশেষ কিছু জানে না।*

এই সময় তাঁর পূর্বপরিচিত অন্য একজন চিকিৎসকের (Breuer) একটি রোগীর রোগ নিরাময়ের ইতিহাস তাঁর মনে এল এবং তিনি এই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিখ্যাত 'আন্নাও'-এর রোগ কাহিনীর তাৎপর্য বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করলেন। এই রোগিনীকে সম্মোহিত করলে তার শৈশবের বিস্মৃত একটি মানসিক আঘাতের কথা মনে পড়ে। বিস্মৃত ঘটনাটি মনে পড়ায় তার মনে বিস্মৃত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। এর ফলে রোগ-উপসর্গ দূর হয়ে যায়; রোগিনী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করে। ডাক্তারটি (Breuer) এই রোগ-নিরাময় পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন 'বিরেচক পদ্ধতি' (cathartic process)।

ফ্রয়েডের মনে হল যে এতদিনে তিনি 'ডিনামিক-ট্রমা'র সন্ধান পেয়েছেন। তীব্র আবেগ বা প্রক্ষোভ চেপে রাখবার চেষ্টার ফলে মনের অসুখ জন্মায় এবং শারীরিক উপসর্গ (এই রোগিনীর ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়াজনিত অসাড়তা ও বিভ্রান্তি) প্রক্ষোভের প্রতিকল্প (substitute) হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এঁরা (Freud and Breuer) 'ষ্টাডিজ ইন হিষ্টিরিয়া' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ফ্রয়েডের 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্বের প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কথা এই বইটির ভূমিকায় পাওয়া যায়। মানসিক শক্তি (psychic energy) যদি বাইরে আসার পথ না পায়, তাহলে সেই শক্তি মনোবিকারের উপসর্গে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তিকে নিজস্ব পথে চালিত করতে পারলে রোগ-উপসর্গ দূর হয়—এই অভিমত তাঁরা প্রকাশ করেন। এই ভূমিকার মধ্যেই নিহিত ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বের বীজ। এই সময়েও ফ্রয়েড কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে নিউরোসিসের কারণ আবিষ্কার করার কথা ভেবেছেন। ১৯৫৪ সালে ইংরিজি ভাষায় অনূদিত তাঁর এই সময়কার লেখা একটি পুস্তিকায় তার প্রমাণ মেলে।**

---

* "...received the profoundest impression of the possibility that there could be powerful mental process which nevertheless remained hidden from the consciousness of men— (Freud—An Autobiographical Study, London, 1951).

** The intention of this project is to furnish us with a psychology which shall be a natural science : its aim is to represent psychical processes as quantitatively determined

স্নায়ুবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ১৮৯৫ থেকে কার্যত দ্বয়বাদী ধ্যানধারণার প্রবক্তা হয়ে পড়লেন। একদিকে তিনি বলেছেন যে মস্তিষ্কই মানসিক ক্রিয়ার আধার; আবার অন্যদিকে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন: যেহেতু মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, সেহেতু মনস্তত্ত্বের বিকাশে মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করা চলে।* একসময় তিনি লিখেছেন—মানসিকতা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত; গবেষণা এ-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে (Freud, Collected Papers Vol IV, London, 1953, p 107); আবার অন্য সময়ে বলেছেন যে—শারীরবিদ্যা, মস্তিষ্কবিজ্ঞান ও রসায়নের সাহায্য ব্যতিরেকেই মনস্তাত্ত্বিকদের এগিয়ে যেতে হবে (Freud, Gesammelte Werke, XI, Quoted by Jones, Life and Works of S. Freud)। এর অনেক আগে সেচেনফের বিখ্যাত পুস্তক "Reflexes of the Brain" প্রকাশিত হয়ে রুশদেশে শুধু নয়, ইয়োরোপের বিজ্ঞানীমহলে আলোড়ন এনেছে, এই সময় মস্তিষ্কবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছে এবং পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে কেন ফ্রয়েডকে বারবার বলতে শোনা যায় যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ থেকে মানসিকতার উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও মনস্তত্ত্বের গবেষণায় শারীরবৃত্তের কোনো সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই? স্নায়ু-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কেন তিনি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে না চলে অনুমান ও দূরকল্পনার সাহায্যে মনোবিদ্যার নতুন তত্ত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াসী? একটি কারণ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। আমরা আগেই দেখেছি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করার মত ধৈর্যের অভাব ছিল ফ্রয়েডের। অবলোকন, অনুধাবন থেকে দূরকল্পনার উপর নির্ভর করে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মত প্রবণতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান—এরূপ অনুমান করা চলে। নিজের সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বে অটল থাকার মত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন ফ্রয়েড।

---

states of specifiable material particles and so to make them plain and void of contradictions. The material particles in question are the neurones. (Freud, The Origin of Psycho Analysis, New York, 1954)

* I have no inclination at all to keep the domain of the psychological floating, as it were, in the air, without any organic foundation. But I have no knowledge, neither theoretical nor therapeutical, beyond that conviction. So I have to conduct myself as if I had only the psychological before me. (Quoted by Ernst Jones, Life and Works of Sigmund Freud, New York, 1953)

অনেক সময় সিদ্ধান্তে অটল থাকা নতুনকে গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। চলতি অর্থে দার্শনিক না হয়েও দর্শনের পণ্ডিতদের মত সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় এমন কোনো তত্ত্ব প্রণয়নে তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। অপর দিকে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাভলভ fact বা উপাত্তের টুকরো সংগ্রহের প্রবণতা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড fact এর সাহায্যে তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন; সেই তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা চলে না – এমন উপাত্ত বা ফ্যাক্ট সংগৃহীত হলে তত্ত্বকে পরিবর্তিত করতে ইতস্তত করেন নি। বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্র আবার সাধারণের প্রয়োগে বিশেষের অনুধাবন, তা থেকে আবার সূত্রের সংশোধন—এই পদ্ধতিতে পাভলভ-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। আর ফ্রয়েড কয়েকটি মাত্র রোগীর উপসর্গ বিশ্লেষণ করে নির্জ্ঞানতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে পুরাণ অতিকথা ইত্যাদি থেকে নিজের তত্ত্বের পরিপোষক কাহিনীগুলোই বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁর উক্তি দিয়েই আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করা যায়। জাতিবিদ রবার্টসন স্মিথের (আমরা পরে এ-সম্পর্কে আলোচনা করব) আদিম সমাজ সম্পর্কিত কাহিনী সম্পর্কে তাঁর উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।* স্মিথের তথ্য সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতিত্বের প্রধান কারণ যে এর দ্বারা তাঁর 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্ব সমর্থিত হচ্ছে অথবা এই তথ্যের ওপর তাঁর তত্ত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করছে।** ফ্রয়েডের এই স্পষ্ট উক্তি তাঁর সততা ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় বহন করে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানানুগত্যের প্রমাণ বহন করে না। আমার মনে হয় ফ্রয়েডের মস্তিষ্কে (পাভলভীয় পরিভাষায়) শিল্পীসুলভ বৈশিষ্ট্যের আধিক্যের দরুণ তিনি সামগ্রিকভাবে সব কিছু দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ্লেষণ ও খণ্ডিত 'ফ্যাক্ট'-এর দিকে নজর কম দিয়েছেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার। আগেই বলেছি, সে সময়ে ইহুদীদের বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না; নির্যাতনের ভয়ে

---

* I have often been vehemently reproached for not changing my opinions in later editions of my book, (Totem and Taboo) since more recent ethnologists have without exception discarded Robertson Smith's theories and have in part replaced them by others which differ extensively . Above all however, I am not an ethnologist but a psycho-analyst. It was my good right to select from ethnological data which would serve me for my analytical work. The writing of...Robertson Smith provided me with valuable points of contact with the psychological material of analysis...I cannot say the same of the work of his opponents. (Freud, Moses & Monotheism, New York, 1949)

** পাভলভ পরিচিতি চতুর্থ খণ্ডে বিশদভাবে লেখা হবে।

অতি শৈশবে তাঁকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে পরিবারের সঙ্গে ভিয়েনাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। হয়তো শৈশবের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁকে প্রথাসিদ্ধ ঐতিহ্য-সম্মত পথ পরিবর্জন করতে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তী-কালে ইয়ুং-এর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের ব্যাপারে 'খৃষ্টান-ইহুদী' বিরোধ কিছুটা দায়ী বলে আমার মনে হয়। সংখ্যালঘু নির্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে প্রচলিত মত ও পথের বিরোধিতা করা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাছাড়া, কার্টেজিয়ান ধ্যানধারণা শুধু ফ্রয়েডের সময়কার নয়,—বর্তমানকালের অধিকাংশ মানুষকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশীর ভাগই মন ও মস্তিষ্ককে সম্পর্কহীন মনে করেন অথবা বড়জোর সমান্তরালবাদ তত্ত্বকে মেনে নিয়ে মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান। বিজ্ঞানীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়—মস্তিষ্ক বহির্জগতের সঙ্গে আর মন আন্তরজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত।*

জীবনের শেষ কুড়ি বছর ফ্রয়েড তাঁর সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বকে নানা-ভাবে সম্প্রসারিত করেছেন এবং নিজের মতবাদকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন: নাম দিয়েছেন আধিবিদ্যা বা মেটাসাইকলজি। এদিক থেকে ফ্রয়েড তাঁর পরবর্তী-কালের অনুগামীদের তুলনায় নিজের মতবাদ সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন ও সৎ। মস্তিষ্ক বা স্নায়ুবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া 'সাইকলজি' বা সত্যিকারের মনোবিজ্ঞান যে গড়ে উঠতে পারে না—তাঁর প্রথম জীবনের এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বকে তিনি অধিমনোবিদ্যা বলে আখ্যাত করেছেন।** এই স্পষ্টবাদিতার জন্য ফ্রয়েড নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি তাঁর 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্বকে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন নি।

এইবার 'সাইকো-এ্যানালিটিক' তত্ত্ব গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সম্মোহক-চিকিৎসকদের প্রভাবের ফলে তিনি ভুলে যাওয়া মানসিক আঘাত সম্পর্কে আগ্রহী হলেও পরবর্তীকালে সম্মোহনের সাহায্য তিনি পরিত্যাগ করেন। সম্মোহন

---

* "Brain is a part of the external world; while mind is a part of the inner world"—Dr. D. S. Kothari. (From a speech quoted in The Statesman, Calcutta, 30. 1. 77)

** The indefiniteness of all our discussions on what we describe as metapsychology is of course due to the fact that we know nothing of the excitatory process that takes place in the elements of the psychical systems, and that we do not feel justified in framing any hypothesis on the subject—we are consequently operating all the time with a large unknown quantity, which we are obliged to carry over into every new formula. (S. Freud, Beyond Pleasure Principle, New York 1950)

ছাড়াই ভুলে যাওয়া ঘটনা রোগীদের স্মৃতিপথে উদিত হতে পারে—যদি তাদের মনের কথা অবাধে বলতে দেওয়া হয়। বার্ণহাইম এইভাবে তাঁর এক রোগীর মানসিক আঘাতের কাহিনী জানতে পেরেছিলেন। সব রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না ; কিন্তু নিজের মনের কথা অবাধে বলার স্বাধীনতা সব রোগীকেই দেওয়া যায়। এইভাবে অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির (free association method) সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে ফ্রয়েড অনেক রোগীর জীবনের বিস্মৃত ঘটনার সন্ধান পেলেন। তখন স্বভাবতই তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হল যে—কেন তারা জীবনের সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভুলে গেছে যা তাদের মনে বিশেষ এবং তীব্র প্রক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। একটু ধৈর্যসহকারে তাদের কথা শুনলে এবং অবাধে কথা বলে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলে তারা আবার সেই-সব ঘটনা মনে আনতে সক্ষম হচ্ছেই বা কেন ? রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ধারণা হল যে, যে-সব ঘটনা তারা বিস্মৃত হয়েছে—সেগুলো তাদের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে বেদনাদায়ক ছিল। সেই-সব ঘটনা বা চিন্তা তাদের মনে লজ্জা, ঘৃণা অথবা ভয়ের উদ্রেক করেছিল, তাই সেগুলো স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেছে। এই হচ্ছে ফ্রয়েডের অবদমন (repression) তত্ত্বের গোড়ার কথা।

যখনই ব্যক্তির মনে অবৈধ অথবা ভয় ও লজ্জাজনক চিন্তা কিংবা ভাবের উদয় হয় তখনই তার বিপরীত ভাবধারার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে। দুই পক্ষের এই সংঘাত সম্পর্কে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সজাগ থাকে। এই সংঘর্ষের ফলে এক পক্ষ পরাজিত বা পরিত্যক্ত হয় এবং ফলে ব্যক্তিমনে সংঘাতের নিরসন ঘটে। মানসিক শক্তি (psychic energy) তখন অন্য ব্যাপারে নিয়োজিত করা যায়। সুস্থ মানুষ এইভাবে তার মানসিক সংকট ও সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু অবৈধ চিন্তা বা ভাবের উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে চেতনার জগতে আসতে দেওয়া না হয়, তাহলে জ্ঞাতসারে ব্যক্তিমনে কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ঘটে না বটে ; কিন্তু অবদমিত চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক শক্তি অবচেতন বা অচেতন মনে অবস্থিত হয়ে নানাভাবে ঘোরা-পথে চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। অবদমনের ফলে অবচেতন মনের সাইকিক এনার্জি নিউরোটিক উপসর্গের সৃষ্টি করে। এই অবদমন তত্ত্বের ভিত্তিতে ফ্রয়েড তাঁর ইপ্সিত 'ডিনামিক-ট্রমা'র স্বরূপ বুঝলেন এবং এইভাবে তাঁর বিখ্যাত সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বের প্রধান উৎস খুঁজে পেলেন। স্নায়ু-শারীরবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্কহীন ফ্রয়েডের প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনস্তত্ত্ব এইভাবে গড়ে উঠল। অসামাজিক ও অবৈধ ভাবাবেগকে তিনি পরবর্তীকালে সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সমীকরণ করলেন। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে কামেচ্ছা ও মৃত্যু-ইচ্ছাকে তিনি প্রাধান্য দিলেন। বিপরীত-ধর্মী প্রবণতাগুলো বিবেকের ধর্ম। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় 'সুপার ইগো' এবং চলতি কথায় আমরা যাকে বিবেক বলি তা প্রায় সমার্থবাচক। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বের প্রাথমিক

পর্যায়ের এই ধ্যানধারণার খসড়াগুলোকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করতে আরো অনেক সময় লেগেছিল। নিউরোটিক উপসর্গ নিরসনের চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রধানত তাঁর অবদমন তত্ত্বকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল। অবদমিত ভাবাবেগ ও অভিলাষকে অচেতন থেকে চেতনার প্রকোষ্ঠে নিয়ে আসতে পারলে তবেই সংশ্লিষ্ট 'সাইকিক এনার্জি'কে প্রশমিত করা অথবা তাকে বিবেকগ্রাহ্য পথে পরিচালিত করা যাবে। এর ফলে রোগ-উপসর্গের উপশম ঘটবে। নির্জ্ঞান রাজ্যে অবদমিত অবৈধ অভিলাষের অনুসন্ধান পদ্ধতির নাম দিলেন 'মনঃসমীক্ষা বা সাইকো-এ্যানালিসিস।' এই অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রধানত অন্তর-দর্শনভিত্তিক (introspective) ও ফ্রয়েডের নিজস্ব কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্বের সাহায্যে পরিচালিত।

সাইকো-এ্যানালিটিক পদ্ধতিতে অবদমিত অভিলাষ অনুসন্ধানে বা অন্তর-দর্শনে, আগেই বলেছি, সম্মোহন অভিভাবনের সাহায্য ফ্রয়েডের মনঃপুত হয় নি। শুধু যে সব রোগীকে সম্মোহিত করা যায় না—তা-ই নয়; সম্মোহিত অবস্থায় অভিভাবন অনেক সময়, ফ্রয়েডের মতে, অবদমিত অভিলাষকে আরো প্রচ্ছন্ন করে অনুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই তিনি অবাধ অনুষঙ্গ, স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (dream interpretation) ও পাত্রান্তরণের (transference সাহায্যে তাঁর পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করলেন। অবদমিত বাসনা অভিলাষ ছদ্মবেশে প্রহরীকে (censor) ফাঁকি দিয়ে অচেতন মন (ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় নির্জ্ঞান—the unconscious) থেকে চেতনার রাজ্যে আসবার চেষ্টা করে এই তিন ভাবে। বিচারবুদ্ধি-ভাবনাচিন্তার প্রয়োগ না করে কথা বলে চললে এমন সব শব্দ, প্রতিচ্ছবি বা বাক্যাংশ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে যা দিয়ে সমীক্ষক অবদমিত অভিলাষের স্বরূপ বুঝতে পারেন, অথচ অবচেতন প্রকোষ্ঠের পাহারাদারের নজর সেদিকে পড়ে না। সমীক্ষক অবশ্য প্রতীক-সাঙ্কেতিকের সাহায্যে আপনা থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ ও বাক্যাংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তার ফলে নির্জ্ঞানে নির্বাসিত অবদমিত অভিলাষের স্বরূপ ধরা পড়ে। ফ্রয়েডের মতে প্রতীক-সংকেতই নির্জ্ঞান রাজ্যের আদিম ভাষা এবং ভাষান্তরণ ছাড়া এর অর্থ বোধগম্য হয়।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার ব্যাপারেও প্রতীক-সংকেতের সাহায্য অপরিহার্য। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নবৃত্তান্তই প্রতীক সংকেত, ব্যাখ্যার সাহায্যে এই প্রতীকের ভাষান্তরণ করার পর স্বপ্নের আসল বস্তু বা চিন্তা বোধগম্য হয়। অবাধ অনুষঙ্গের বেলায় যেমন অসতর্ক মুহূর্তে রোগী অচেতন মনের অবদমিত অভিলাষের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, তেমনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও অসতর্ক রোগীর অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক-সংকেত প্রকাশ করে।

পাত্রান্তরণ (transference)-এর ওপর ফ্রয়েড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আধুনিক মনঃসমীক্ষায় পাত্রান্তরণের ততটা গুরুত্ব নেই। সমীক্ষক

ও রোগীর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের আবেগময় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সে সম্পর্ক প্রেম ও কামগন্ধী ভালবাসার সম্পর্কও হতে পারে, আবার দারুণ বৈরিতার বা ঘৃণার সম্পর্কও হতে পারে। ফ্রয়েডের মতে সমীক্ষকের প্রতি ব্যবহার ও তার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অতীত জীবনে কোনো আবেগমণ্ডিত ঘটনার পুনরাভিব্যক্তি ঘটছে। অবদমিত কোনো অভিলাষ এখানেও সচেতন মনে আসবার চেষ্টা করছে। অবশ্য সেটা প্রতীক-সংকেতের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝতে হবে।

প্রতীক-চিহ্ন, প্রতীক-সংকেত নির্ণয় ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে ফ্রয়েডের নিজস্ব বিধান অনুসৃত না হলে অবদমিত অভিলাষের কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না। মিশরের চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা বুঝতে হলে যেমন বিশেষ ধরনের প্রতীক-সংকেত জানা দরকার, নির্জ্ঞান মনে নির্বাসিত কামনা-বাসনার হদিশ পেতে হলেও তেমনি ফ্রয়েডীয় প্রতীকের বিশেষ তাৎপর্য ও অর্থ জানা একান্ত প্রয়োজন। ফ্রয়েডের প্রতি কোনো কটাক্ষ না করেও বলা চলে যে, তাঁর প্রতীক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার ব্যাপার আর গুপ্তসম্প্রদায়ের সঙ্কেতলিপির সাহায্যে সংবাদ আদানপ্রদান প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। প্রতীকার্থ ঠিক করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে দূরকল্পনার ওপর নির্ভরশীল।

ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্ব গঠনের অতি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক পরিচয়ের সঙ্গে একথা জানানো বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে, এই তত্ত্ব গঠনে প্রথম কয়েক বছর ফ্রয়েড প্রায় কারুরই সাহায্য পান নি। এই তত্ত্ব গঠনে একাকী এবং অনেকটা সংগোপনে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে ও লিখে যেতে হয়েছে। ১৯০০ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক দুটি, The Interpretation of Dreams এবং Psychopathology of Everyday Life প্রকাশিত হবার পর জনসাধারণের কাছে তিনি পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁর তত্ত্বের প্রতি ক্রমশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। যেমন ধর্মীয় কারণে শৈশবে তাঁর পরিবার প্রতিবেশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর নিজস্ব 'সাইকো-এ্যানালিসিস' তত্ত্ব গঠনের ব্যাপারেও তিনি সমসাময়িক বিজ্ঞানীমহল থেকে প্রথম দিকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এদিক থেকে পাভলভের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুটা মিল আছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাভলভ বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক সমাদৃত এবং নোবেল পুরস্কারে ভূষিত। কিন্তু তারপর যখন শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব গঠনে ব্রতী, তখন তিনি দ্বয়বাদী দর্শনাবিষ্ট বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক অবহেলিত ও উপহসিত।

যে বিখ্যাত বই দুটির কথা একটু আগে উল্লেখ করলাম, সে দুটিতে ফ্রয়েডের দৃষ্টি বা ভাবনা শুধুমাত্র মানসিক রোগের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। স্বপ্ন দেখে সকলেই, দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তি ঘটে সবারই। এই বই দুটি পড়লে বোঝা যায় যে তিনি রুগ্ন মনের আলোচনা থেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব গঠনের দিকে অগ্রসর

হয়েছেন। একটা সার্বিক ও সর্বজনগ্রাহ্য মানসিক দর্শন প্রণয়নের প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিমন থেকে সমাজমানস ও বর্তমান সভ্যতার বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সর্বব্যাপারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয়ের দিকে মন দিয়েছেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যা ও দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তির ব্যাখ্যার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সুস্থ মানসিকতার তাৎপর্য বুঝতে হলেও অবদমন তত্ত্বের সাহায্য অপরিহার্য। স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মতবাদ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। নাম ভুলে যাওয়া, হঠাৎ বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলা, লিখতে গিয়ে ভুলে করা—ইত্যাদি দৈনন্দিন ভুলভ্রান্তির ব্যাখ্যা ফ্রয়েড একইভাবে করলেন। অবদমিত অভিলাষের ও প্রক্ষোভের চেতনার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টার ফলে ভুলভ্রান্তি ঘটে—এই মতবাদ তিনি দৃষ্টান্তসহকারে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন। আপনি একজনের নাম যদি প্রায়ই ভুলে যান, তাহলে বুঝতে হবে আপনি লোকটিকে কোনো কারণে পছন্দ করেন না। কিন্তু এই অপছন্দ আপনার বিবেক অনুমোদিত নয়। কাজেই স্মৃতির কোঠা থেকে তাকে নির্বাসিত করে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি চেয়েছেন।

অবদমন তত্ত্ব সম্পর্কে এখানে আরো দু-চার কথা বলা দরকার। পাহারাদার বা সেন্সরের কথা আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি। কল্পনা করুন যে, অবচেতন ও চেতন মনের মাঝে একটা দরজা আছে। সেখানে অভিভাবকরূপে পাহারাদারের অবস্থিতি। অবচেতন মনের অবদমিত কামনাবাসনা যাতে কোনোভাবে চৈতন্যের প্রকোষ্ঠে না আসে এই তদারকি কাজে পাহারাদার নিযুক্ত। স্বপ্ন, ভুলভ্রান্তি বা নিউরোটিক উপসর্গের মাধ্যমে অভিভাবককে ফাঁকি দিয়ে ছাড়া আসার উপায় নেই। জীবনের শেষ বিশ বছর ফ্রয়েড নিউরোসিস চর্চা ছেড়ে তাঁর মনস্তত্ত্ব দর্শনের (যা তিনি 'মেটাসাইকলজি' বা অধিমনোবিদ্যা বলে অভিহিত করেছেন) চর্চায় মেতে ওঠেন। এই সময় আগেকার নির্জ্ঞান বা অচেতন (The unconscious), অবচেতন (preconscious), সংজ্ঞান বা চেতনের পরিবর্তে নতুন পরিভাষা ব্যবহার করলেন। অভিভাবক পাহারাদারদের (censorial guardian) নতুন সংজ্ঞা দিলেন সুপার-ইগো, নির্জ্ঞানকে 'ইদ' (id) বলে অভিহিত করলেন। আর সংজ্ঞানের নাম দিলেন 'ইগো' (ego)। 'সুপার ইগো' পুরনো বিবেকের পোষাকী নাম। 'ইগো' বা চৈতন্য যুক্তির আলো দিয়ে সব কিছুর বিচার করে ; 'সুপার ইগো' গঠিত হয় 'ইগো'র ওপর ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধের প্রভাবে আর 'ইদ' সেই আদিম যুগের অযৌক্তিক, অজ্ঞেয়, অপ্রতিরোধ্য সহজাত প্রবৃত্তির ফ্রয়েডীয় পরিভাষা। 'ইগো'কে আমরা 'অহং'ও বলতে পারি। 'ইগো'র ধারণা যে, সে বুঝি যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা সহকারে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকে চালিত করছে। ফ্রয়েডের মতে এ ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদ্যাবুদ্ধি

যুক্তিবিজ্ঞান মানুষকে পরিচালিত করে না। হতভাগা 'ইগো' জানে না যে সে আসলে 'ইদ' বা নির্জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হচ্ছে। সহজাত মৃত্যুরতিবাদ (death-eros instinct) আসল সঞ্চালক। 'অহং'কে তিনি খামখেয়ালী অতিশক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে চড়া একজন অশ্বারোহীর সঙ্গে (যার কাজ কোনোমতে ঘোড়াকে সামাল দেওয়া) তুলনা করেছেন।* বাইরের জগৎকে জানা, প্রকৃতি ও সমাজকে পরিবর্তিত করার অহঙ্কার—ফ্রয়েডের মতে আকাশকুসুম চয়নের মতই অলীক কল্পনা। আসলে আমরা কাম ও মৃত্যু প্রবৃত্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করছি আর সে সংগ্রামে হেরে যাওয়াই আমাদের নিয়তি। সভ্যতা আমাদের নির্জ্ঞান প্রবৃত্তিকে অবদমনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে বলে আমরা মনের রোগে ভুগছি। ফ্রয়েডের মতে সভ্য সমাজের ব্যক্তিমাত্রেই কমবেশি নিউরোটিক। পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের তত্ত্বের বহুলাংশে সংস্কারসাধন করলেও প্রখ্যাত নিও-ফ্রয়েডিয়ানদের মুখেও আমরা এই কথাই অন্যভাবে শুনতে পাই। ফ্রয়েড তাঁর সময়কার ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে লক্ষ্য করেই হতাশাব্যঞ্জক অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আসল রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা তিনি করেননি। তাঁর সমসাময়িক মার্কস এঙ্গেল-এর রচনা ও ধনতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের কোনো মূল্য দিয়েছেন বলে আমরা জানি না। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নীতিহীন শোষণ ও বঞ্চনা তাঁর নজরে পড়েনি। কামেচ্ছা পরিপূরণের ব্যাপারে সমাজের বাধানিষেধকে তিনি মানুষের দুর্দশা ও মনোরোগের একমাত্র কারণ মনে করে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছেন।** তিনি এক জায়গায় আক্ষেপ করে বলেছেন : মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছি না বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।***

ফ্রয়েডের নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বিজ্ঞানীমহলে অপাঙ্‌ক্তেয় থাকার দুঃখ ১৯০৮

---

* Thus in its (ego D. G) relation to the id it is like a man on a horse-back, who has to hold in check the superior strength of the horse—(Ego and The Id, London, 1930)

** When one surveys the aims of civilization and the means it employs, one is bound to conclude that the whole thing is not worth the effort and that in the end it can only produce a state of things which no individual will be able to bear. (Civilization and its Discontent)

***My courage fails me, therefore, at the thought of rising up as a prophet before my fellowmen, and I bow to their reproach that I have no consolation to offer them. (Ibid)

খৃষ্টাব্দ থেকে অনেকটা লাঘব হয়। জুরিখের সর্বজনমান্য চিকিৎসক ইয়ুং এই সময় ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এই বছর সাইকো-এ্যানালিটিক সোসাইটির প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নিউইয়র্কের চিকিৎসক ব্রিল যোগদান করেন। এই এ. এ. ব্রিল ফ্রয়েডের লেখাগুলির ইংরিজি অনুবাদ করার পর তাঁর নাম যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি বক্তৃতার আমন্ত্রণ পান। ইয়োরোপের বিজ্ঞানসমাজে অনাদৃত ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুধীসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়। আমেরিকায় ইয়োরোপীয় সংরক্ষণশীলতা ও আভিজাত্যগর্ব স্বভাবতই কম ছিল। সেখানে ক্যাথলিকদের ও অন্ধ ইহুদীবিদ্বেষের প্রভাব ছিল না। তাই বোধ হয় ফ্রয়েডকে ও ফ্রয়েডবাদের নতুনত্বকে স্বাগত জানাতে তাদের সঙ্কোচ হয় নি। এ-ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং সম্প্রসারণশীলতাও বোধ হয় নতুন ধরনের মনোদর্শনের প্রতীক্ষায় ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাইকো-এ্যানালিটিক আন্দোলনের ঢেউ আটলান্টিক পেরিয়ে জন্মস্থান ইয়োরোপের তটভূমিতে এসে আঘাত করল। মনস্তত্ত্ব ও মনোরোগবিদ্যার সীমা অতিক্রম করে ফ্রয়েডবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জীবনদর্শন হয়ে উঠল। আমাদের দেশেও এই আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়ল। চিকিৎসক মহলের চেয়ে সাধারণ বুদ্ধিজীবী, ও শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে অবদমন, নির্জ্ঞান, ইডিপাস কমপ্লেক্স ইত্যাদি ফ্রয়েডীয় পরিভাষা বিশেষ পরিচিতি লাভ করল। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের ছাত্রদের মধ্যে ফ্রয়েড আলোচনা সুরু হয়ে গেল। তবে বেশিরভাগ আলোচনাই ছিল ভাসা-ভাসা ধরনের—ফ্রয়েডের সর্বরতিবাদ ও ইডিপাস গূঢ়ৈষা নিয়ে। তবে ফ্রয়েডবাদ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা ও পঠন-পাঠনে সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু কয়েকজন পণ্ডিত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে প্রয়াত গিরীন্দ্রশেখর বসু ও শ্রীরঙিন হালদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের উদ্যোগে এখানেও এই সময় সাইকো-এ্যানালিটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে মনের রোগের চিকিৎসার সূত্রপাত ঘটে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ফ্রয়েডের যে-সব পুস্তক প্রকাশিত তার সবগুলিই প্রায় অধিমনোবিদ্যার সম্পর্কিত।* সমাজ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় সাইকো-

* 1. Leonardo da Vinci, A study in Psycho-sexuality (1910), 2. Totem and Taboo (1913), 3. Beyond the Pleasure Principle (1920), 4. Group Psychology and the Analysis of the Ego (1921), 5. The Ego and the Id (1923), 6. Civilization and its Discontents (1929), 7. Moses and Monotheism (1939).

এ্যানালিসিস্-সম্মত এইসব আলোচনা ও তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ঔংস্কুক্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। ইডিপাস কমপ্লেক্স ও ইলেক্‌ট্রা কমপ্লেক্স—এই কথা দুটি কলেজের ছাত্রমহলে প্রগতিসূচক হিসেবে গৃহীত হল। এখন আর শুধু ব্যক্তিমানসিকতা ফ্রয়েডের আলোচ্য ও বিচার্য বিষয় নয়; তিনি মানব প্রজাতির মানসিকতা, চারিত্রিক সংগঠন, ইডিপাস-গূঢ়ৈষার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলেন। সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ সভ্যতার উত্থান পতন;—এক কথায় মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাস নাকি গড়ে উঠেছে এবং চালিত হচ্ছে এই গূঢ়ৈষার প্রভাবে। শৈশব থেকে কামেচ্ছা ও সেই ইচ্ছা অবদমনের ইতিহাসই শুধু ব্যক্তির নয়, মানব-প্রজাতির ইতিহাস। ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব অল্প দিনের মধ্যে তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট ও অভিভূত করে ফেলল। এই তত্ত্বের নতুন মাদকতা ঐতিহ্য বিরোধিতা ও আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হল। 'নিষিদ্ধ কথা'র বিশেষ আকর্ষণ অনেককেই আকৃষ্ট করল। বিশের দশকের শেষের দিকে অনেক ছাত্র তরুণের কাছে একই সঙ্গে ফ্রয়েড, বাকুনিন, ক্রপটকিন্ ও মার্কস-এর রচনাবলী অধ্যয়ন বিপ্লবীর ধর্ম বলে বিবেচিত হল। এই লেখকও ছাত্রাবস্থায় এই আধুনিকতার স্রোতে ভেসে যেতে একটুও দ্বিধান্বিত বোধ করে নি। শারীরবিদ্যার পাঠ্য পুস্তকে পাভলভ সম্পর্কে এক অধ্যায় যখন পড়ছি তখন পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত ফ্রয়েডের লেখা বেশ কিছু বই পড়া হয়ে গেছে এবং তার থেকে অনেক বেশী কিছু খবর বাংলা ইংরিজি প্রবন্ধ থেকে জানা হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, কিশোর-সুলভ অর্বাচীনতার কণ্ডূয়ন ও নিজেকে আধুনিক বলে জাহির করা ছাড়া সেই সব পঠন-পাঠনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

আত্মপ্রসঙ্গ ছেড়ে এবার ইডিপাস তত্ত্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। আগেই জাতিবিদ রবার্টসন স্মিথের অসমর্থিত কাহিনীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা ও সেই পক্ষপাতিত্বের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। শুধু রবার্টসন স্মিথের আদিম সম্প্রদায় সম্পর্কিত কাহিনী নয়। যে সব অতিকথা, লোকগাথা বা ধর্মীয় বিধি তাঁর তত্ত্বের সপক্ষে উপস্থাপিত করা চলে—তিনি শুধু সেই সবই গ্রহণ করেছেন: বিরোধী পক্ষের যুক্তিতর্ককে আমল দেওয়া বা তার সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। মানব সমাজের উৎপত্তি, সংগঠন রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের মূলে পিতৃহত্যাজনিত অপরাধবোধ ছাড়া আর কিছু যে থাকতে পারে না—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। আদিম মানবগোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে এক অগাধ শক্তিশালী পিতার অধীনে থাকত গোষ্ঠীর সমস্ত নারী। অবাধে তাদের ভোগ করার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত প্রতিটি পুত্রকে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত করে দিতেন। পুত্ররা একদিন ফিরে এসে পিতৃহত্যা করে তাঁর নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। নরমাংসভোজী এই আদিম মানবগোষ্ঠীর পুত্ররা পিতাকে শুধু হত্যা করে নিরস্ত থাকেনি, যুদ্ধজয়ের উৎসবে তাঁর মাংস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির

করেছিল।* মানবপ্রজাতির এই আদিম উৎসব এখনও নানাভাবে নানা জাতির মধ্যে পালিত হচ্ছে। এই পিতৃহত্যা থেকে প্রথম পাপবোধের উন্মেষ, এবং সেই থেকেই সামাজিক সংগঠন, বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উৎপত্তি।** উৎসবের শেষে ছেলেদের মনে জন্মাল ভয় ও পাপবোধ। তাদের সন্তানরাও তাদের হত্যা করতে পারে—এই ভয়; আর পিতাকে হত্যা করা পাপ—এই অপরাধবোধ। তখন তারা সমাজ গড়ল, বিধিনিষেধ তৈরী করল, গোষ্ঠীর মধ্যেকার নরনারীর মধ্যে যৌনমিলন নিষিদ্ধ করল। খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য উৎপাদন ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠন ও অন্যান্য বিধিনিষেধের সৃষ্টি হয়েছে—এই ধরনের সহজবোধ্য ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ফ্রয়েডের মনে এল না। কেননা, এই সব জাতিবিজ্ঞানীদের বক্তব্য তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রাচীন গ্রীকগাথা ও অতিকথা তাঁকে আগের থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। ইডিপাসের কাহিনীর দৈবনির্ভর ও পূর্বনির্ধারিত পরিণতির মধ্যে তিনি মানব-প্রজাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিবিধির ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে ছেলেরা শৈশব থেকেই মাকে ভালবাসে আর পিতাকে ভয় ও ঘৃণা করে। তিনি সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান সমাজের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী যথেচ্ছাচারী পরিবারপ্রধান পিতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সব দেশের সব সমাজের পিতার চরিত্রে আরোপ করলেন। পিতাকে, পরিবারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে পুরুষ-সন্তান বেশী ভয় পাবে—এটাই স্বাভাবিক। কারণ পিতার সান্নিধ্য থেকে তারা বঞ্চিত থাকত এবং পিতা তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরকে কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ

---

* "...there is a violent and jealous father who keeps all the females for himself, and drives away his sons as they grow up...One day the brothers who had been driven out come together, killed and devoured their father...The totem meal which is perhaps mankind's earliest festival, would thus be a repetition and commemoration of this memorable and criminal deed, which was the beginning of so many things of social organizations, of moral restrictions and of religion. (Freud, Totem and Taboo, New York, 1952)

**Society was now based on complicity in the common crime; religion was based on the sense of guilt and the remorse attaching to it; while morality was based partly on the exigencies of this society and partly on the penance demanded by the sense of guilt. (Freud—quoted by Wells. Harry K in Pavlov & Freud, Lawrance & Wishart, London)

করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বেশীমাত্রায় শাসন করতেন। ভিয়েনার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের পিতাপুত্রের সম্পর্ককে তিনি সমস্ত মানব প্রজাতির সর্বকালের সম্পর্ক বলে গণ্য করেছেন এবং কিছুসংখ্যক নিউরোটিকের স্বপ্নব্যাখ্যা (নিজের কাল্পনিক প্রতীকার্থের সাহায্যে) দিয়ে নিজের তত্ত্বকে সমর্থিত করেছেন; পিতৃবৈরিতাকে তিনি সমাজ ও ইতিহাসের চালিকাশক্তি বলে প্রচার করেছেন। মায়ের প্রতি পুত্রের প্রেমের পথে পিতা প্রধানতম ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। পিতাকে সন্তান ঘৃণা করে আবার শ্রদ্ধাও করে। তাই সন্তান পিতার মৃত্যু কামনা করে আবার এই কামনাকে সংজ্ঞান মনে উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবদমিত করে নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করে। এই কামনার সঙ্গে সংযুক্ত 'সাইকিক এনার্জি তার নির্জ্ঞানে স্বপ্ত থাকে, লুপ্ত হয় না।

ফ্রয়েডের মতে প্রাগৈতিহাসিক পিতৃহত্যাজনিত পাপবোধ থেকে ধর্মের উৎপত্তি। ঈশ্বর এই আদিম-পিতার প্রতিমূর্তি। যে পিতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁকে পূজনীয় ও সম্মানার্হ করার অভিলাষ থেকে পিতাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-রূপে কল্পনা। প্রাচীন ধর্মীয় আখ্যানকে ভিত্তি করে ফ্রয়েডের 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' গড়ে উঠেছে। তাই একদিকে যেমন ধর্মধ্বজী পাদ্রীদের কাছে তিনি নিন্দিত হয়েছেন, তেমনি অপরদিকে ধর্মীয় আখ্যানদ্বারা প্রভাবিত শিল্পী-সাহিত্যিক কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছেন। মনে রাখা দরকার যে, ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের পত্তন হয়েছিল এবং সম্পত্তি ও সামাজিক প্রভুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছিল। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার বিধি চালু হওয়ার দরুণ ভ্রাতাদের মধ্যে ও পিতাপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে, বিত্তবানদের ও প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক রাজারাজড়াদের পরিবারে এই ধরনের দ্বন্দ্ববিরোধ বেশি করে দেখা দিত। পরবর্তীকালেও রাজ্যসম্পত্তির মালিক পিতা ও উত্তরাধিকারী পুত্রের মধ্যে সম্পত্তিকেন্দ্রিক সংঘর্ষের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। এই সব বিরোধের কারণ ইডিপাস গূঢ়ৈষা না সম্পত্তি-লালসা? অনেক ক্ষেত্রে এক রাজাকে নিহত করে অন্য কেউ রাজা হলে রাজ্যসম্পত্তির সঙ্গে নিহত রাজার হারেমটিও নতুন রাজার করায়ত্ত হত। আকস্মিক কারণে বা দৈবক্রমে পিতৃ-পরিত্যক্ত কোনো বিজয়ী বীর নিজের পিতৃপরিচয় না জানার দরুণ নিজের পিতাকে হত্যা করে হয়তো বা নিজের মাতাকে ভোগ্যসম্পদ হিসেবে লাভ করেছেন। তা নিয়ে চরম ট্রাজেডীর নাটক লেখা হয়েছে, শিল্পী সাহিত্যিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন, কিন্তু ইডিপাস কমপ্লেক্স-এর যাথার্থ্য ও সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া মাতৃপ্রধান আদিম সমাজে পিতৃপরিচয় জানা খুব সহজ ছিল না। সেই সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে অনেক পুত্রই নিজের অজ্ঞাতসারে হয়তো পিতৃনিধন করেছেন। এ-থেকেও স্বভাব পিতৃবৈরিতা

প্রমাণিত হয় না। তাই রবার্টসন স্মিথের আদিম গোষ্ঠীজীবনের কাহিনী অন্য কোনো জাতি-বিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিক কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। আবার পুরুষ-প্রধান সমাজে যখন পুরুষের বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হল, তখন বহু পুত্র পিতার বংশ-পরিচয় জানলেও, পিতার চেহারার পরিচয় জানবার সুযোগ পেত না। এইরকম পিতাপুত্রের যুদ্ধ এবং তরুণ পুত্রের কাছে বৃদ্ধ পিতার পরাজয় কাহিনী সব দেশের গল্পগাথায় পাওয়া যায়। এ-সবই ফ্রয়েডকে তাঁর তত্ত্ব উদ্ভাবনে ও তত্ত্বকে সর্ব-ব্যাপারে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও মানসিক গঠনের মধ্যে বিদ্যমান থেকে এই ইডিপাস কমপ্লেক্স ইতিহাস তৈরী করছে—এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য কোনো সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তির অবতারণার চেষ্টা ফ্রয়েড কোনোদিন করেন নি। নির্জ্ঞান মনের কামনার সন্ধান কোনো ব্যক্তির পক্ষেই পাওয়া সম্ভব নয়—এই এক কথায় আপনাকে ফ্রয়েডবাদীরা থামিয়ে দিতে পারেন। আপনার গোপন মনে মাতৃলিপ্সা ও পিতৃবিদ্বেষ ধূমায়মান, কিন্তু আপনি তা জানতে পারছেন না : এই কথার প্রতিবাদে আপনার কিছুই বলার নেই। পরশুরামের চরিত্র তারিণী কবিরাজের সেই বিখ্যাত উক্তি বড়জোর এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারেন—হয় Zানতি পার না।

এইবার ইতিহাসের নির্জ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে দু'চার কথা বলছি। ফ্রয়েডবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে অনেকাংশে মার্জিত ও শোধিত হয়েছে। ইডিপাস কম্‌প্লেক্স-এর ওপর একালের মনঃসমীক্ষকরা খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন না বটে, কিন্তু হর্নি, এরিক ফ্রম ইত্যাদি নয়া ফ্রয়েডবাদীদের নিয়ে আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাব যে মূলত সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে এঁদের ধারণা প্রায় একই আছে। ফ্রয়েডের ইতিহাস ব্যাখ্যায় বা বিচারে অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তিমালিকানা, মুনাফার মোহ,—ইত্যাদির কোন স্থান নেই। ইতিহাসে জনগণের কোনো ভূমিকা নেই। শক্তিধর মহারথীরা ইতিহাস তৈরী করেন। সাধারণ মানুষের পিতার ভূমিকায় আছেন নেতৃবৃন্দ। জনগণের সব সময়েই একজন পরিচালক ও শাসক দরকার; কেননা তারা বুদ্ধিহীন জড়। এই মহান নেতাদের বশ্যতা স্বীকার করাই মানবধর্ম।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে পিতাকে আমরা দলবেধে হত্যা করেছিলাম —সেই পিতাকে উচ্চাসনে বসিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া আমাদের স্বভাবধর্ম,—আমাদের মনের গোপন পাপবোধ দূর করার একমাত্র উপায়। তাঁকে আমরা প্রশংসা করব, পূজা করব, বিশ্বাস করব, আবার ভয়ও করব।*

* We know that the great majority of people have a strong need for authority which they can admire, to which they can submit, which dominates and sometimes ill treats

এই তত্ত্বকে বলা হয় 'Great Man Theory'। খুব নতুন কথা নয়। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, জনগণের ঈশ্বর-নির্বাচিত শাসক ও রক্ষক—একথা নানা ভাবে নানা স্থরে সামন্ত-সমাজে বলা হয়েছে। শক্তিমান দুর্বলকে রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনবোধে শাসন করবে—সমাজের নীচু তলার মানুষ একথা শুনতে ও বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত ছিল। ফ্রয়েড সেই সর্বজনবিদিত বহু-প্রচারিত শাসককুলের বক্তব্যের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিলেন, তাঁর সুবিখ্যাত ইডিপাস তত্ত্বের অবতারণা করে। নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত না হলেও শোষক ও শাসকমহলে এই তত্ত্ব সমাদৃত হল। কেননা, বিশ শতকের প্রথম থেকেই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব কমে আসছিল, পাদ্রীপুরোহিতদের প্রতিপত্তি শিক্ষিত মহলে তখন ক্ষীয়মান। বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের কাছে এই সাইকো-এ্যানালিটিক ব্যাখ্যা বেশ উপাদেয় মনে হল। গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রভাব ইয়োরোপের জনগণের মনে যে নতুন মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল, বুর্জোয়া শাসকদের কাছে আর তার প্রয়োজন নেই। সামন্তদের প্রভাব খর্বিত, তারা এখন আপোষ-প্রার্থী। ব্যক্তিচেতনা ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার সম্প্রসারণের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ভাবগত দিক থেকে বিপন্ন। পুরনো অস্ত্র দিয়ে জনজাগরণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন আয়ুধ দরকার; সেই আয়ুধ পাওয়া গেল ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন বা মেটাসাইকলজির মধ্যে। সামন্ত প্রভুদের এই অস্ত্রের প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। এই নতুন তত্ত্ব তাদের জানিয়ে দিল যে—তারা, মানে নেতৃস্থানীয়েরা সাধারণের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই শ্রেষ্ঠ। তাদের মুরুব্বিয়ানা বা অছিগিরির এখনও প্রয়োজন আছে। গণতান্ত্রিক অধিকার যেখানে বিশেষভাবে স্বীকৃত, সেই লিঙ্কন, জেফারসনের দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাই ফ্রয়েডবাদকে প্রথম স্বীকৃতি ও স্বাগত জানালেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করে যখন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করলেন যে সাম্রাজ্যবাদের বাজার ভাগাভাগি ও উপনিবেশ কাড়াকাড়ি যুদ্ধের মূল কারণ; ফ্রয়েড তখন আইনস্টাইকে এক

---

them. We have learned from the psychology of the individual whence comes this need of the masses. It is the longing for the father that lives in each of us from his childhood days, for the same father whom the hero of legend boasts of having overcome. And now it begins to dawn on us that all the features with which we furnish the great man are traits of the father, that in this similarity lies the essence, which has so far eluded us, of the great man. ...He must be admired, he may be trusted, but one cannot help also being afraid of him. (Freud : Moses and Monotheism)

পত্রে লিখলেন যে যুদ্ধ ঘটে জৈবিক কারণে এবং যুদ্ধ অনিবার্য।* মানুষের মনের হিংসাত্মক প্রবণতা যুদ্ধ ঘটায়। ফ্রয়েড নিজে কিন্তু শান্তিবাদী ছিলেন। এই সব কথা ফ্রয়েড নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রবক্তা হিসেবে বা কোনো যুদ্ধবাদী দেশের উদ্দেশ্য গোপন করার মতলবে বলেন নি। তিনি তাঁর জীবনদর্শন অনুযায়ী সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের সমর্থনে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মতবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের মনঃপুত হয়েছিল; তাই ফ্রয়েডবাদের জয়ধ্বনিতে একচেটিয়া সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠেছিল। এখন আমেরিকাতে ব্যবহারবাদী স্কিনারের যুগ চলছে, কিন্তু তা বলে ফ্রয়েডবাদ একেবারে নিস্তেজ হয়নি। আইনস্টাইনের কাছে লেখা ঐ চিঠিতে তিনি তাঁর প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধেও দুচার লাইন লিখেছিলেন: মানুষ প্রবৃত্তির দাস, আত্মধ্বংসী ও আগ্রাসী মনোভাব তার নির্জ্ঞানে অবস্থিত, ফ্রয়েডের তত্ত্ব আইনস্টাইনের কাছে পৌরাণিক কাহিনীর মত শোনাতে পারে, ফ্রয়েডের কাছে আইনস্টাইনের পদার্থবিদ্যাও পৌরাণিক কাহিনীর মত লাগে।** ফ্রয়েড নিজেকে শান্তিবাদী মনে করতেন; কেননা তিনি সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থতার তাড়নাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন। এই পরিহারকে কিন্তু অবদমন বলা চলে না। এর নাম উদ্‌গতি, ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় sublimation —মানে, নীচ জৈব প্রবৃত্তির ধারাকে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের পথে প্রবাহিত করে মহীয়ান করে তোলা। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে উদ্‌গতি সম্ভব নয়। তারা সকলেই প্রায় অশিক্ষিত, সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের ধার দিয়েও যায় না। তাদের মধ্যে মৃত্যুরতি প্রবৃত্তি খুবই জোরালো, তারা রিপুর বশবর্তী হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে বাধ্য।***

---

* "...it (war) seems quite a natural thing, no doubt it has a good biological basis and in practice it is scarcely avoidable. (Freud : Collected Papers)

** Human instincts are of only two kinds, those which seek to preserve and unite and those which seek to destroy and kill and which we class together as destructive or the aggressive instinct.... It may perhaps seem to you as though our theories are a kind of mythology and in the present case, not even an agreeable one. But does not every science come in the end to a kind of mythology like this ? Cannot the same be said today of your own physics ? (Ibid)

*** The ideal condition of things would of course be a community of men who had subordinated their instinctual life to the dictatorship of reason but in all probability that is a Utopian exception. (Ibid)

নেতৃস্থানীয় শক্তিমান কিছু ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে থাকা জনগণের পক্ষে অপরিহার্য মনস্তাত্ত্বিক ধর্ম। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে ফ্রম হিটলারের একনায়কতন্ত্রের আলোচনায় আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও বলেছেন যে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা বা মুক্তি চায় না। তবে কথাটিকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সময়োপযোগী করে বলেছেন। স্থানান্তরে এ-সম্পর্কে বলা হবে। সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য ও প্রাধান্য ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বসম্মত ও প্রকৃতির বিধান বলে বিবেচিত হতে পারে। তেমনি সমাজে পুরুষপ্রাধান্যকেও ফ্রয়েড স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত বলে মনে করেছেন। আর্থ-সামাজিক কারণের উল্লেখ করা ফ্রয়েড দরকার মনে করেননি। অঙ্গসংস্থানের দিক থেকেই নারীরা পুরুষ অপেক্ষা হীন—এই তত্ত্ব প্রচার করে ফ্রয়েড তাঁর সমকালীন সমাজে নারীদের পশ্চাদ্‌-বর্তিতার ব্যাখ্যা করেছেন। পুরুষের মত যৌনাঙ্গ না থাকার জন্য নাকি বাল্যবয়স থেকেই মেয়েরা হীনমন্যতায় ভুগছে। তারা শুধু শারীরিক শক্তি বা শৌর্যবীর্যের দিক থেকেই হীন নয়; বুদ্ধি মেধা ন্যায়নিষ্ঠা ও বিচার শক্তি—সব দিক থেকেই, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে, মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট। নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে যারা সংগ্রাম চালায়, তাদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করা সমীচীন নয়—একথা ফ্রয়েড বেশ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন।*

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্ব অথবা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তত্ত্ব মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তাঁর কল্পনা অনুসারে মন ইদ, ইগো ও সুপার-ইগো—এই তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই বিভাগের সমর্থনে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ উপাত্ত বা বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি নেই। প্রকোষ্ঠভিত্তিক কল্পনাকে আশ্রয় করে এবং অবদমনকে সব রকমের মননক্রিয়ার জনক হিসেবে গণ্য করে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। ফ্রয়েড সমর্থকরা মনে করেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে কিন্তু জটিল মননক্রিয়ার ব্যাখ্যা মেলে না। মানসিক কোনো কিছুই স্নায়ুতন্ত্রের শারীরবৃত্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়; সম্পর্ক থাকলেও সে-সম্পর্ক প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্ণয় সম্ভব নয়। ফ্রয়েডীয় মতবাদ ভাববাদী দর্শনের আশ্রয়পুষ্ট এবং ভাববাদেরই এক নতুন সংস্করণ। পুরাণ, লোকগাথা, অতিকথা ইত্যাদির মধ্যে ফ্রয়েড প্রথমত অসুস্থ মনের ক্রিয়াকলাপের

---

* We must not allow ourselves to deviate from such conclusions (নারীদের হীনতা—ধীঃ গঃ) by the denial of the feminists, who are anxious to regard the two sexes as completely equal in position and worth. (Ibid)

ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। পরে অবাধ অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন প্রতীকের সাহায্যে সেই ব্যাখ্যাকে সমর্থিত করেছেন। মনের নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠের সন্ধান প্রথমে পেয়েছেন সম্মোহক চিকিৎসকের কাছে। পরে নির্জ্ঞান মনের অবস্থিত কামনাবাসনার পরিচয় পেয়েছেন স্বপ্নপ্রতীকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। অধিকাংশ প্রতীকের সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক স্থাপন ফ্রয়েডের স্বকীয় বিশিষ্ট অবদান। ফ্রয়েডের অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতি পুরোপুরি সাবজেকটিভ।

অপর দিকে, পাভলভ মন সম্পর্কে কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণার বশীভূত না হয়ে তাঁর বৈপ্লবিক 'ক্রনিক' পদ্ধতিতে স্নায়ুপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তার পর শর্তাধীন পরাবর্তের সাহায্যে মস্তিষ্কের কিছু সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম আবিষ্কার করেছেন। ক্লিনিকে মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও পশুমস্তিষ্কের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে মনন-ক্রিয়ার সূত্র ও তত্ত্বে পৌঁছেছেন। সামান্যীকৃত সূত্র ও তত্ত্বকে আবার নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করেছেন। নতুন ঘটনা বা তথ্য যখন তত্ত্ব বা সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়নি, তখন সূত্র ও তত্ত্বকে আবার নতুন করে সংশোধিত করেছেন। পাভলভের অনুসন্ধান ও গবেষণাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবজেকটিভ বা বিষয়মুখীন। সব কিছু মননক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য তিনি কোনো বিশুদ্ধ চরম (absolute) তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি। এ-পর্যন্ত এই দুই তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা খুব বেশী হয়নি। দুজনের অনুসন্ধানপদ্ধতি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, বক্তব্য পৃথক। স্বকীয় পরিভাষায় তাঁরা নিজেদের গবেষণার ফলাফল বিবৃত করেছেন। আমরা শুধু কতকগুলি মৌলিক মননক্রিয়া সম্পর্কে দুই পৃথক জাতের গবেষকের বিভিন্ন মতামত দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করছি। তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল একই—কাজেই তাঁদের বক্তব্য বা অভিমত পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মননক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আকৃষ্ট করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ফ্রয়েডের অভিমতের এবং তাঁর ও পাভলভের তত্ত্ব প্রণয়ন পদ্ধতির অতি সংক্ষিপ্তসার এখানে পরিবেশিত হল। পরের অধ্যায়ে পাভলভের সঙ্গে তাঁর মতামতের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করবার আগে ফ্রয়েডের শেষ জীবনের বেদনা-দায়ক ইতিহাস সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার।

ফ্রয়েডের সব অভিমতই হিটলার সুবিধামত কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু সম্মানের বদলে—ইহুদী বলে—বৃদ্ধ বয়সে ফ্রয়েড হিটলারের কাছে লাঞ্ছনা পেয়েছেন। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নাৎসীরা ফ্রয়েডের সব সম্পত্তি সায় তাঁর প্রকাশনালয় পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে। তাঁকে বন্দী করে ঘেটোতে রাখা হয়, আন্তর্জাতিক সাইকো-এ্যানালিটিক সংস্থা ফ্রয়েডের মুক্তির জন্য তীব্র

আন্দোলন আরম্ভ করে। কয়েক লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে নাৎসীরা বৃদ্ধ ফ্রয়েডের পরিবারকে লণ্ডনে আসার অনুমতি দান করে। ঐ সময় ফ্রয়েড দুরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগছিলেন। ফ্রয়েডের চার বোনকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়। বছরখানেকের মধ্যে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগের পর লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়।*

লিবিডো ও ইডিপাস

ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত এই দুটি কথার সঙ্গে ইংরিজি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় পরিচিত। পাভলভ ও ফ্রয়েডের অভিমত ও তত্ত্বের বৈপরীত্য ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে 'লিবিডো' ও 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' সম্পর্কে আরো কিছু বলা দরকার।

মনোবিকারের চিকিৎসায় অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি, স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন যে শৈশবের যৌনাভিলাষ অবদমন থেকে সব রোগের উৎপত্তি। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যৌনমানস সম্পর্কে এক পুস্তিকায় তিনি যৌনতার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কিত এক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বরতিবাদ (pansexuality)। সর্বরতিবাদ অনুসারে শৈশবের সব কিছু ইচ্ছা ও আচরণই যৌনতামূলক। কিন্তু যৌনাঙ্গের সঙ্গে সেই ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক থাকতেই হবে, এমন নয়। সব রকম ভালবাসার উৎসই কামেচ্ছা এই বৈপ্লবিক ঘোষণা করে তিনি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মানসিক শক্তি বা সাইকিক এনার্জির কল্পনা সম্পর্কে আগেই কিছু বলা হয়েছে। এই সাইকিক এনার্জির বিশেষ ও প্রধানতম অভিব্যক্তি ফ্রয়েড খুঁজে পেলেন যৌনতামূলক সহজাতপ্রবৃত্তির মধ্যে। যৌন-প্রবৃত্তিমূলক শক্তিকেই ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় বলা হয় 'লিবিডো।' জড়জগতে যে-সময় বিজ্ঞানীরা তাপশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তির সন্ধান ও চর্চায় রত, সেই সময় ফ্রয়েড মানসলোক-পরিচালক এই 'লিবিডো' শক্তির আবিষ্কার করেন। খাদ্যবস্তু রূপান্তরিত হয়ে যেমন সব রকম দৈহিক ক্রিয়া-কলাপের শক্তি জোগায়, ফ্রয়েডের মতে লিবিডোও তেমনি সবরকম মানসিক ক্রিয়ার শক্তি জোগায়। খাবার ইচ্ছে বা ক্ষুধার সঙ্গে লিবিডোকে ফ্রয়েড তুলনা

---

* এই অধ্যায়ের অনেক তথ্যের জন্য এইচ. কে. ওয়েলসের নিকট ঋণী।

করেছেন।* তাঁর এই তুলনার মধ্যে কিছুটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা আছে মনে হয়। সাইকিক এনার্জি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর মতে এই এনার্জিকে এক সহজাতপ্রবৃত্তি থেকে অন্য প্রবৃত্তিতে অপসরণ করা সম্ভব। তাঁর জটিল যুক্তিজাল খণ্ডনের চেষ্টা আমরা এখন করছি না। কেবলমাত্র লিবিডোতত্ত্ব ও ইডিপাস গূঢ়ৈষার প্রাথমিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ফ্রয়েডের এই 'লিবিডো' শুধু শৈশবের প্রেম-ভালবাসার বা যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ধর্ষকাম (sadism), মর্ষকাম (masochism) ইত্যাদি পরিণত বয়সের বিকৃত আচরণের মধ্যেও ফ্রয়েড শৈশব-যৌনতার প্রসার ও বিস্তার খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তির প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রয়াস অথবা দাসত্ব ইচ্ছার মধ্যেও তিনি যৌনতার অভিব্যক্তি দেখেছেন।** শৈশব-যৌনতার বিকাশ ও ক্রম-পরিণতির মাধ্যমে 'সাইকো-এ্যানালিটিক' বা ফ্রয়েডের নক্সামাফিক ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে। এই ক্রমপরিণতির কয়েকটি স্তর নির্ণয় করেন ফ্রয়েড। প্রতিটি স্তরে লিবিডো ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে তৃপ্তি লাভ করে। এই তৃপ্তিলাভই (pleasure principle) 'লিবিডো'র প্রধান কাম্য। জীবনের প্রথম বছর মৌখিক স্তর (oral stage)। এই সময়ে 'লিবিডো' চুষে আনন্দ পায়। জীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে গুহ্যদ্বার পথে মলত্যাগে লিবিডো আনন্দলাভ করে। এই স্তরকে বলে পায়ু (anal) স্তর। পরে আসে (তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত) phallic স্তর। এই সময় যৌনাঙ্গ নাড়া চাড়া করা লিবিডোর আনন্দলাভের উপায়। এর পর কয়েক বছর চুপচাপ থাকার পর কৈশোর অন্তে উদ্ভূত যৌন স্তরে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মিলনে লিবিডো প্রগাঢ় আনন্দ লাভ করে।

---

* Almost all the energy with which the apparatus (mind —D. G.) is filled arises from its innate instinctual impulses. ......In every way analogous to hunger, libido is the force by means of which the instincts, in this case the sexual instincts as with hunger, the nutritional instinct, achieves expressions. (Freud, Introductory Lectures)

** Even the 'perversions' of adult life—for example, sadism —are simply continuations and elaborations of infantile responses. And even the dominating and submissive tendencies are regarded as aspects of sexuality. (Murphy : Historical Introduction to Modern Psychology, 1949, p. 317)

কোনো স্তরে যদি তৃপ্তি না পায়, তবে লিবিডো সেই স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকে; ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় একে বলা হয় 'ফিক্সেশন' (fixation)। এর ফলে ভবিষ্যতে নানাধরনের মনোবিকারের উপসর্গ প্রকাশ পায়। মৌখিক স্তরে যার লিবিডো অতৃপ্ত রয়ে যায়, সে অত্যধিক পানভোজনে আসক্ত হয়ে শৈশবের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করতে চায়। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ ফ্যালিক ষ্টেজ-এর প্রাধান্যই সর্বাধিক। এই স্তরে মায়ের প্রতি সন্তানের মনে কামেচ্ছা জাগে; এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে পিতাকে নিজের কামনাতৃপ্তির পথের প্রধান অন্তরায় মনে হয়। এই দুই প্রবৃত্তিকেই অবদমিত করা হয়। এই অবদমন ক্রিয়া যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয়, তবে ভবিষ্যতে স্ত্রী বা প্রেমিকার সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। পিতা সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক প্রথানুযায়ী সব থেকে সম্মানের ব্যক্তি। সন্তান পিতাকে ভয় করে, সম্মান করে; কিন্তু মায়ের ভালবাসার ব্যাপারে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ফ্রয়েড শৈশবের এই সঙ্কটাপন্ন মানসিক অবস্থার নাম দিয়েছেন ইডিপাস গূঢ়ৈষা (oedipus complex)।* থিব্‌সের-এর রাজা ইডিপাস-এর কাহিনীতে আছে তিনি পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করেছিলেন! অবশ্য পিতা-মাতার পরিচয় তাঁর জানা ছিল না।

লিবিডো অবস্থা-বিশেষে আবার শিশুর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই অবস্থায় ব্যক্তি বেশিমাত্রায় আত্মচিন্তায় ও আত্মপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থার নাম নারসিসিষ্টিক (narcissistic) স্তর। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের পূর্বে প্রায়ই সমকাম-স্তরের আবির্ভাব হয়। সমকামিতা (homosexuality) প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এই স্তরে দেখা যায় সমবয়সী সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলোর প্রতি গভীর আকর্ষণ।** এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের ব্যাপারটি যদি বাধা না পেয়ে স্বচ্ছন্দভাবে ঘটে যায়, তাহলে স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে; অন্যথায় মানসিক বিকার বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

কোনো একটি স্তরে লিবিডো যদি যথাযথভাবে তৃপ্তি না পায় অর্থাৎ শিশু যদি ঠিকমত নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে, তবে সে ফেলে-আসা স্তরে—

---

* Freud called the infantile pattern the oedipus complex, "Complex" being a general term for a constellation of effectively toned ideas which have been repressed. (Ibid p 318)

** In this 'homosexual' stage...children show strong attachment chiefly to playmates of their own sex. (Ibid)

যেখানে আনন্দ পেয়েছিল—সেই স্তরে ফিরে যাবার চেষ্টা করে। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এর নাম পশ্চাদ্‌গমন (regression)। মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটাবার আর একটি পদ্ধতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ফ্রয়েড। তাকে বলা হয়েছে উদ্‌গতি (sublimation)। উদ্‌গতির ফলে লিবিডোর তৃপ্তি ঘটে সমাজ-অনুমোদিত সম্মানজনক প্রতিকল্পকে আশ্রয় করে। বিজ্ঞান, শিল্প, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ লিবিডোকে বিকল্প আনন্দ দান করে। সমাজ-সভ্যতার গঠনে যৌনশক্তির ভিন্নমুখী গতি ও অবদানকে ফ্রয়েড প্রাধান্য দিয়েছেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সৃজনশক্তি ও জীবনী বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা ও উৎস তাঁর নির্জ্ঞানস্থিত উদ্ভট যৌন-কল্পনা (sexual fantasics)। বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসা শৈশবের যৌন-অনুসন্ধিৎসার পরিণত রূপ। সাইকো-অ্যানালিসিসের সাহায্যে ফ্রয়েড বিবাহ, পরিবার, পুরাণ, লোকগাথা, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রায় সব রকমের সাংস্কৃতিক কৃত্যের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-সবকিছুর এবং নিউরোসিসের মূলে তিনি খুঁজেছেন কামেচ্ছা অবদমন প্রয়াস-জনিত দ্বন্দ্ব। পাভলভও অনুসন্ধিৎসা পরাবর্তকে (Investigation Reflex) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ; কিন্তু যৌন-অনুসন্ধিৎসা থেকে এই রিফ্লেক্সের জন্ম—এরকম কল্পনা তাঁর মাথায় আসেনি।

জন্মমুহূর্ত থেকে দেহের বিভিন্ন সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন অংশের আনন্দ-অনুভূতিতে লিবিডোর তৃপ্তি সাধিত হয়। তিনটি বিশেষ অনুভূতিশীল অংশের (মুখ, মলদ্বার ও যৌনাঙ্গ) উল্লেখ করা হয়েছে। এই আনন্দ অনুভূতিতে বাধা পড়লে (সভ্যতার কাজ বাধাপ্রদান) শিশুর মনে চাপ পড়ে ; ফলে শিশু ব্যথা পায় ও পরোক্ষভাবে কিছুটা আনন্দ লাভ করে এই ব্যথার আংশিক উপশম ঘটায়। সভ্যসমাজে অনেকটা জোর করেই একটা বিশেষ বয়সে শিশুকে স্তন্যপানের তৃপ্তি (oral pleasure) থেকে বঞ্চিত করা হয়, হস্তমৈথুনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, কঠোর-ভাবে মলত্যাগ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। জৈব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে শিশু মাতাপিতার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে—কেননা তাঁরাই শিশুকে সামাজিক করার প্রয়াস করেন।

ইডিপাস কমপ্লেক্স সম্পর্কে আর দু'একটি কথা বলে এখনকার মত ফ্রয়েড প্রসঙ্গ শেষ করব। সাধারণ জৈবতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত শিশু মাতাপিতা উভয়ের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করে বটে, কিন্তু সে ভাবের তীব্রতা খুব বেশী নয়। কিন্তু মাতার প্রতি ভালবাসায় পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে শিশুমনে যে পিতৃবৈরিতা জাগে, তার তীব্রতা ও পরবর্তী জীবনে তার প্রতিক্রিয়া—ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ইডিপাস ও ইলেক্‌ট্রা (পিতার প্রতি কন্যার ভালবাসা ও মাতৃবিদ্বেষ) গূঢ়ৈষা নানাভাবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে,—তাই এই দুই গূঢ়ৈষা নিয়ে অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখা

হয়েছে, শিল্প-সাহিত্যে, গণ-মানসিকতায়, সামাজিক-মনস্তত্ত্বে এর ভূরি ভূরি নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামী শিষ্যবৃন্দ।

মাতৃপ্রেম সন্তানকে একদিকে পিতৃবিদ্বেষে প্ররোচিত করে, আবার শক্তিশালী পিতার শাস্তিবিধানের ক্ষমতার কথা ভেবে সে পিতার সঙ্গে একাত্মীভবনের চেষ্টা করে। তাই পুত্রদের মধ্যে আমরা যেমন পিতৃদ্রোহীর সন্ধান পাই, তেমনি আবার পিতাকে নানাভাবে তোষণকারী পুত্রেরও সাক্ষাৎ মেলে।

সম্মোহক ও রোগীর মধ্যে লিবিডো-ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার দরুণ সম্মোহক রোগীকে যে-কোনো ভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। তেমনি রাষ্ট্রনায়ক, দেশনেতারা সম্মোহকের মত, পরস্পরের সঙ্গে লিবিডো-বন্ধনে আবদ্ধ সমাজস্থ সাধারণ মানুষকে, তাঁদের খুশিমত পরিচালিত করতে পারেন। আবার নেতাকে পিতৃস্থানীয় বলেও মনে করা চলে। সাধারণ মানুষ অবোধ নিরুপায় শিশুর মত পিতার ন্যায় সর্বশক্তিমান নেতার নির্দেশে পরিচালিত হয়ে নিজের পিতৃবিদ্বেষজনিত ভয় ও পাপবোধকে দূর করার চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান, অবদমন ও লিবিডোতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার পরিবেশনের পর আমরা এবার পাভলভের শর্তাধীন মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নির্জ্ঞান ও অবদমনের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করব। তার আগে মানবমন সম্পর্কে ফ্রয়েডের ধারণা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের দু'একজন মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসকের অভিমত জানা দরকার।

আজকের মনস্তত্ত্ব ও ফ্রয়েডের ধারণা

ফ্রয়েড-পূর্ব কালে মনস্তত্ত্ব দর্শনের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিল; অথবা বলা চলে, দর্শনের একটি উপশাখা হিসেবে গণ্য হবার ফলে মনস্তত্ত্বের কোনো বিশেষ কদর ছিল না। তাই মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার সকলেরই ছিল। নিজের মন দিয়ে অন্যের মন বোঝবার চেষ্টা সকলেই করতেন, এখনও করে থাকেন। দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু অনুধাবনের ও ব্যাখ্যানের প্রয়াস। সাহিত্যিক ব্যক্তিজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মনের দ্বন্দ্ব খুঁজতেন। অন্য দিকে আবার, এই সময় থেকেই পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের বেশ কিছু অগ্রগতি ঘটেছে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অনেক কিছু পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রীয় সম্পর্ক অনেকখানি জানা গেছে। মস্তিষ্কে চেষ্টীয় (motor) ক্রিয়াকলাপের স্থান নির্ণীত হয়েছে। জার্মানী ছিল তখন এই সব পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রাণকেন্দ্র; কিন্তু মন বা মননক্রিয়া সম্পর্কে কোনো তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। ফ্রয়েড দার্শনিক পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তত্ত্ব প্রণয়নে ব্রতী হয়ে মনস্তত্ত্বকে বিশেষ সম্মানের আসনে তুলে ধরবার

চেষ্টা করলেন। দার্শনিকদের মধ্যে বেশির ভাগই ঈশ্বর, ঐশ্বরিক বিধান ও আত্মা ইত্যাদির সাহায্যে মননক্রিয়া ব্যাখ্যা করতেন; পরে 'ইলান ভাইটাল', প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি ইত্যাদি কথার আমদানি হয়। মননক্রিয়া বুঝাতে নৃবিদ্যা, পৌরাণিক কাহিনী, অতিকথা ইত্যাদি প্রয়োগের গৌরব ফ্রয়েডেরই প্রাপ্য। ফ্রয়েডই প্রথম তাঁর মনোবিদ্যার তত্ত্ব প্রয়োগ করে সমকালীন সামাজিক ঘটনা ও অবস্থার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেন। এদিক থেকে তিনি অভিনবত্বের দাবী করতে পারেন। মার্কসীয় অর্থনীতি—'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হবার পর সমাজ ও রাজনীতি ব্যাখ্যার এক নতুন দিক খুলে গিয়েছিল; ফ্রয়েড সেদিকে না গিয়ে তাঁর লিবিডো ও ইডিপাস তত্ত্ব দিয়ে সামাজিক সব কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। সেদিন মনস্তত্ত্বের পক্ষে এই প্রচেষ্টা অনধিকারচর্চা ছিল। আজ আর তা বলা চলে না। আজ মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অপরিহার্য মনে করছেন অনেকেই। মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অর্বাচীন হলেও, আজ সমাজ ও ব্যক্তির বহু সমস্যা নিরসনে মনোবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। মনের রোগের ও অপরাধের প্রাদুর্ভাব প্রাচুর্যের দেশে বেড়েই চলেছে বলে যে মনোবিদ্যার এত কদর—তা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে।* আজ দার্শনিকদের অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা মনোবিদের কাছে উপস্থাপিত করা হচ্ছে; আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের আশায় সামাজিক সংঘর্ষ ও সমাজবিমুখিনতার প্রশ্নে মনোবিদ্যাসম্মত উত্তর খোঁজা হচ্ছে। উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থায়—প্রযুক্তি-বিদ্যার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে, যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য শিল্পপতিরা ও রাষ্ট্রপ্রধানরা আজ মনস্তাত্ত্বিকের দ্বারস্থ হয়েছেন—প্রশিক্ষণে, জনশিক্ষায়, শিল্পায়নে, সংগঠন ও পরিচালনায়, ছাত্রবিদ্রোহে—প্রায় সব ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের গবেষকদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল

---

* Economic opulence goes hand in hand with a peak of mental illness, some 50 percent of hospital beds being occupied by mental patients. It goes hand in hand with a continuous rise in the rate of crime, specially juvenile delinquency. And the psychotherapists tell us, beside the classical neurosis caused by stress, tension and psychological trauma, a new type of mental sickness has developed for which they have even had to coin a new term—existential neurosis, mental illness arising from the meaninglessness of life, the lack of goals and hopes in a mechanised mass society. (Ludwig Von Bortalanffy—quoted in Coleman's Psychology & Effective Behaviour 1971 p 53)

সাইকলজি, ইনডাষ্ট্রীয়াল সাইকলজি, এডুকেশনাল সাইকলজি, ম্যানেজমেণ্ট সাইকলজি এবং আরও অনেক নামে মনোবিদ্যার নানা •উপবিভাগের উদ্ভব হয়েছে। একদিকে যেমন 'আমি কে এবং কেন'—এই ধরনের দার্শনিক ও অস্তিত্ববিষয়ক প্রশ্নে মনস্তাত্ত্বিকরা তাঁদের নিজস্ব অভিমত জ্ঞাপনে সোচ্চার, তেমনি আবার বৈষয়িক সব ব্যাপারেও মনস্তত্ত্বের গবেষণায় সব দেশের গবেষকরাই তৎপর।

কালের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে কালের গতি বিপরীতমুখী করা যাবে না। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, স্ব-স্বভাব থেকে বিচ্যুত করেছে বলে এই যন্ত্রসভ্যতাকে আমরা বর্জন করতে পারি না। সহজাত প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সভ্যতা মানুষকে মনোবিকারগ্রস্ত ও অসুখী করেছে—ফ্রয়েডের এই অভিমত তাই ফ্রয়েডবাদী ছাড়া আর কেউ নির্বিচারে মেনে নিতে চান না। এমনকি, আধুনিক সাইকোঅ্যানালিষ্টরা ক্রুপদী ফ্রয়েডবাদকে সংস্কৃত করে এই যন্ত্রসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার মনস্তত্ত্বসম্মত পন্থা আবিষ্কার করতে তৎপর।* এঁদের কথা আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বলব। আগেই লিখেছি, ফ্রয়েড মানুষকে হিংস্র বন্যপ্রাণীর সামিল বলে মনে করেছেন এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশার কথা বলতে না পারার জন্য দুঃখ বোধ করেছেন।** কিন্তু মার্গারেট মীড আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে বহুদিন অতিবাহিত করে এমন গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন যারা আদৌ হিংস্র নয়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদে অনভ্যস্ত।*** মাস্‌লো এমন আর এক গোষ্ঠীর কথা লিখেছেন যারা ১৫ বছরে পাঁচটি মুষ্টিযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের হিংস্রতা প্রকাশ করেছে। তারা স্বভাব দুর্বল বা স্বভাবভীরু

---

* Man is the only animal who finds his own existence as a problem which he has to solve and from which he cannot escape. (Fromm : The Sane Society, 1958)

** ...men are not gentle, friendly creatures, wishing for love, who simply defend themselves if they are attacked but...a powerful measure of desire for aggressiveness has to be reckoned as part of their instinctual endowments. (Civilization and Discontents, 1930)

***The Arapesh, a primitive tribe living in the mountains of New Guinea were found by the anthropologist Maragaret Mead to be a peaceful people who thought that "all human beings...are naturally unaggressive, self-denying......". (Coleman : Psychology & Effective Behavior)

নয়। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক কার্ল রজার্স একজন বিখ্যাত মানবতাবাদী। তিনি নিজের রোগীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে ও তাদের চরিত্র অধ্যয়ন করে মানুষের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাও ফ্রয়েডের ধারণার বিপরীত।* গর্ডন অ্যালপোর্ট আরও জোরালো ভাষায় বলেছেন,—স্বাভাবিক মানুষ সর্বত্রই যুদ্ধবিগ্রহ এবং ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করে চলতে চায়। এই প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। তারা বন্ধু ও প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করে থাকতে চায়। মানুষ ভালবাসা চায়, মানুষ ভালবাসতে চায়। যুদ্ধ পৃথিবীময় চলছে তবুও মানুষ মনে প্রাণে শান্তির অভিলাষী। (Gordon Allport : The Nature of Prejudice, 1954)

মানুষ সহজাত হিংস্রপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় ও সভ্যতার পালিশের তলায় এই প্রবৃত্তি অবদমিত হয়ে অবস্থান করে সুযোগ সুবিধার ছিদ্রপথে বেরিয়ে এসে ধ্বংসাত্মক হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপে মানুষকে উৎসাহিত করে—অর্থাৎ মানুষ স্বভাববর্বর—এই ফ্রয়েডীয় অভিমত রজার্স, এ্যালপোর্ট-এর মত মানবতাবাদী মনস্তাত্ত্বিকের মত আরও অনেকেই খণ্ডন করেছেন। ব্যবহারবাদীরা তো মনে করেন মানুষের স্বভাবগত কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। সে নির্জ্ঞানে অবস্থিত জৈবশক্তির দাস নয়; সে নিষ্ক্রিয় কাদার তালের মত জড়—ছাঁচে ফেলে, (কণ্ডিশনিং করে) মানবমন ও চরিত্রের যে-কোনো রূপ দেওয়া সম্ভব। পাভলভের মতবাদের সঙ্গে এই যান্ত্রিক ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যবহার-বাদ যুক্তরাষ্ট্রে আজ ফ্রয়েডবাদের অপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়; স্কিনারের 'অপারেন্ট কণ্ডিশনিং' রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত এবং এর প্রয়োগ আজ সর্বতোমুখী। অস্তিত্ববাদী মনস্তত্ত্বেও (existential psychology) নির্জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত নয়, অস্তিত্ববাদীরা মানুষকে মূলত হিংস্র বা অসৎ মনে করেন না।

আরো দুটি ফ্রয়েডীয় ধারণা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার। প্রথমটি যুক্তিবাদ, দ্বিতীয়টি নিয়তিবাদ সম্পর্কিত। ফ্রয়েডের মতে মানুষ যুক্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এ-সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্য এইরকম: মানুষের বেশির ভাগ চিন্তা ও আচরণ নির্জ্ঞানপ্রভাবিত এবং যুক্তিহীন। অবদমিত কামতাড়না এবং নির্জ্ঞান মনের বৈরিতা, অভিক্ষেপ (projection) ও যুক্ত্যাভাস (rationalization) ইত্যাদি বিশ্লেষণান্তে ফ্রয়েডবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানুষের আচরণ স্বভাবত আত্মবঞ্চনাকারী ও যুক্তিহীন।** এদিক

---

* The basic nature of human being, when functioning freely is constructive and trustworthy. (Carl Rogers : A Therapist's View of Psychotherapy, 1961)

** In his 'Psychopathology And Everyday Life', Freud

থেকে ব্যবহারবাদীরাও প্রায় একই মত পোষণ করেন; যদিও মনে করেন যে 'কণ্ডিশনিং'-এর প্রভাবে মানুষকে যুক্তিবাদী করে তোলা যায়। আবার কার্ল রজার্স তাঁর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন: মানবপ্রকৃতির অন্তরে নিহিত আছে বাস্তবজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও প্রগতির অভিলাষ।* প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব, গণমাধ্যমে বিকৃত সত্যের প্রচার ও বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভ সঞ্চার মানুষকে নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন প্রক্ষোভ-তাড়িত জীবে পরিণত করতে পারে; মানুষ মাঝে মাঝে পাশবিক আচরণ করে উন্মাদের মত উল্লসিত বোধ করে—এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গোঁড়া ফ্রয়েডানুরক্ত ছাড়া আর কোনো দলের মনস্তাত্ত্বিক মানুষের যুক্তিহীন বর্বর আচরণকে তার অন্তরে নিহিত স্বভাবধর্ম মনে করেন না। তাছাড়া, বিজ্ঞান আজও নানাদিকে প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও, সব কিছু প্রাকৃতিক ও মানসিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অনেকের মনে তাই নানাবিষয়ে কুসংস্কার ও অর্থহীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস ও মোহ আজও বিদ্যমান। সেই কারণে যুক্তিহীন বিশ্বাস পোষণ ও অর্থহীন আচরণ করতে আজও মানুষকে দেখা যায়। এ থেকে কিন্তু ফ্রয়েডীয় ধারণা প্রমাণিত হয় না।** বিজ্ঞানের ক্রমঅগ্রগতি ও মানুষের বিজ্ঞাননির্ভরতা

---

emphasized the unconscious and irrational influences that, are evident in much of our thinking and behaviour" Reading of "repressed sex drives", of "unconscious hostility and of "rationalization and projection" many come to the seemingly obvious conclusion that man's behaviour is inherently and inevitably self-deceptive and irrational. In fact, according to Freud's view, even man's finer sentiments and aspirations are only sublimations of animal instincts which lurk just beneath the surface of his civilized veneer. (Coleman : Psychology and Effective Behaviour. 1971, p 21)

* One of the most revolutionary concepts to grow out of our clinical experience is the growing recognition that the innermost core of man's nature...is basically socialized, forward moving, rational and realistic. (Rogers : A Therapist's View of Psychotherapy, 1961, p 90-91)

** The achievements of modern science, nevertheless, indicate man's capacity and inclination for dealing with his problems in rational ways. His unremitting efforts to probe the secrets of the universe and to make sense of the world, to obtain accurate information and sound values for dealing with his problems, and to establish order in both

দেখে অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মানুষ শুধুই যে বিজ্ঞাননির্ভর ও যুক্তিবাদী হবার চেষ্টা করছে তা নয়; যুক্তিধর্মিতা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর অন্যতম।

নিয়তিবাদ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। গ্রীক ট্রাজেডীতে ও ক্যালভিনের মতবাদ অনুসারে মানুষের ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। জন্মলগ্নে গ্রহাদির সমাবেশে ব্যক্তি জন্মক্ষণ থেকে এক নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য— ভারতীয়দের অনেকেই এই ধারণায় আচ্ছন্ন। এর সঙ্গে বিজ্ঞানীদের নিমিত্তবাদ ও পূর্বসিদ্ধান্তের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা কার্যকারণতত্ত্বে বিশ্বাসী। প্রাকৃতিক নিয়ম অনড়, সব ঘটনাই নিয়মের অধীন; অবশ্য সব নিয়ম এখনও বিজ্ঞান আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক জটিল যন্ত্র; সব নিয়ম-কানুন জানা গেলে ভবিষ্যতের যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে মানুষ আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারবে। এই ধরনের যান্ত্রিক মতবাদে সব বিজ্ঞানী কিন্তু বিশ্বাসী নন। তেমনি আবার পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণার আচরণে অনেক সময়ই কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে না এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না বলে আর একদল বিজ্ঞানী আবার কার্যকারণতত্ত্বকে উড়িয়ে দিতে চান। অন্য এক দলকে মধ্যপন্থী বলা চলে। মানুষের যা খুশি করবার ক্ষমতা নেই বটে, সে শর্তাধীন; কিন্তু শর্তাধীনতা সত্ত্বেও তার নিজের ভালমন্দ বাছাই করার, নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার, নিজের ইচ্ছানুযায়ী পদ্ধতিতে কাজ করার স্বাধীনতা আছে। সীমা ও শর্তের মধ্যে, বিশেষ পরিমণ্ডলের মধ্যে, সে মুক্ত। প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজের সাময়িক সীমাবদ্ধতা ও আরোপিত শর্ত লঙ্ঘনের অবাধ স্বাধীনতা তার নেই বটে; কিন্তু নিজের বুদ্ধিযুক্তি প্রয়োগ করে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সে নিয়ত প্রকৃতিকে ও সমাজকে পরিবর্তিত করে চলেছে। পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করছে, মানুষও তেমনি প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্বপরিকল্পনামত পরিবেশকেও প্রভাবিত করছে। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতাড়িত মানুষের যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা নেই, কাজেই সে নির্জ্ঞানস্থিত অবদমিত জৈবশক্তির হাতের ক্রীড়নক। ব্যবহারবাদী স্কিনারও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মূল্য দিতে চান না।* মানবতাবাদী

---

his physical surroundings and social relationship all seem to indicate not only a potentiality for rational behaviour but a basic propensity for it. (Coleman : op. cit p 22)

* The hypothesis that man is not free is essential to the application of scientific method to the study of human behaviour. (B. F. Skinner : Seience & Human Behaviour, 1953)

রজার্সও এই বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু ফ্রয়েড ও স্কিনারের মতবাদ মানতে চাইবেন না।* মজার কথা এই যে, নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই আবার জোরগলায় তাঁদের নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ইচ্ছামত অধিকারের দাবী করেন: গণতন্ত্র, অবাধ নির্বাচন, বাক্-স্বাধীনতা ও অন্যান্য অনেক রকমের স্বাধীনতা নিয়ে বাদবিতণ্ডা চালান।** কোলম্যান দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী না হয়েও এ-ব্যাপারে প্রায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের মতই অভিমত প্রকাশ করেছেন।***

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের ধারণা কি?

এঙ্গেলস-এর মতে, স্বাধীনতা মানে স্বপ্নে প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন নয়। প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই জ্ঞানের প্রয়োগ-সম্ভাবনার মধ্যেই 'স্বাধীনতা' কথাটির তাৎপর্য নিহিত। বাইরের জগতের ও আন্তরজগতের (দেহ-মনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত নিয়ম) দুই জগতের বিধিনিয়মই এই পর্যায়ে পড়ে।****

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সমস্ত মননক্রিয়াকেই বিশেষ ধরনের বিষয়গত (objective)

---

* Each person believes that he is able to exercise some measure of control over his own destiny. He is capable of making decisions and of selecting alternative lines of action... Since men are capable of making choices, they are held accountable for their deeds. (Stibutani : The Structure of Personal Identity, 1964—quoted by Coleman)

** Our whole way of life, with its freedom of discussion, ballot boxes, democratic institutions and assumption of personal responsibility, is based on the concept of man's freedom for self-determination. And curiously enough, many of the most ardent advocates of strict determinism are among the most zealous fighters for democracy. (Coleman, op cit, p 23)

***While acknowledging that human behaviour is heavily influenced by the individual's background of experience, scientists adhering to this viewpoint are impressed with man's self awareness, with his ability to reflect and to re-interpret and reorganize his past experience, to be critical and evaluative of his own behaviour, and to formulate and weigh alternatives on the basis of both past satisfactions and probable outcomes. (Ibid p 24)

****F. Engels : Anti Duhring. (London, 1934 p 128)

নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন বলে মনে করে। পাভলভবাদীরা নিমিত্তবাদে (determinism) বিশ্বাসী ; কিন্তু তার মানে এই নয় যে মানুষকে তারা উদ্দেশ্যহীন বা যুক্তিহীন জীব বলে গণ্য করে। লেনিনের একটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।* সেচেনফ তাঁর সুবিখ্যাত "Reflexes of the Brain" পুস্তকে লিখেছেন যে মানুষের তথাকথিত স্বেচ্ছাক্রিয়তা স্বতঃস্ফূর্ততা (voluntary activities) কার্যকারণ সম্পর্কিত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন ও সীমাবদ্ধ। তাঁর মতে মানসজীবন কঠোর নিয়মের অধীন বলেই মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে।** পাভলভ আজীবন এই নিমিত্তবাদী (deterministic principle) তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁর শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলেন। ভাববাদী ও বস্তুবাদীদের মধ্যে এই নিমিত্তবাদ চিরকালই এক বিতর্কিত প্রসঙ্গ। ভাববাদী মনস্তত্ত্ব মানুষের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের অবাধ স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাসী। পাভলভ মানবমনের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি এ বৈশিষ্ট্যকে কোনোসময় কার্যকারণ অসম্পৃক্ত মনে করেননি। তিনি একদিকে যেমন Kӧhler ও Koffka-র মত গেস্টাল্টবাদীদের স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন ; অন্যদিকে তেমনি Watson প্রমুখ ব্যবহারবাদীদের যান্ত্রিক জড়বাদী তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছেন।***

---

* ...the idea of determinism which establishes the necessity of man's actions and rejects the absurd fable of free will, in no way destroys man's reason and conscience, nor his valuation of his actions. Quite the contrary, the determinist view alone makes a strict and correct judgement possible, instead of attributing everything one fancies to free will. (Lenin's Selected Works, XI, 439)

** ...he set himself the task of proving that both voluntary and involuntary movements were strictly determined,... His famous book "Reflexes of the Brain" concludes with the words : thus the question whether the most voluntary of voluntary acts is fully determined by internal and external conditions is answered in the affirmative. (Teplov : Psychology In The Soviet Union, Ed. Simon, p 247)

***Pavlov did not of course deny the peculiar nature of psychic phenomena, in other words, he was not a mechanist in this matter. But he held in full agreement with dialectical materialism that the peculiar nature of psychic phenomena provided no grounds for excluding them from the general interconnection of phenomena and for denying that they were subject to the laws of causation and the principle of determinism. (Ibid 248)

ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্ব অনেকটা নিয়তিবাদ প্রভাবিত ; বিজ্ঞানসম্মত নিমিত্তবাদের সঙ্গে সম্পর্করহিত।

ফ্রয়েড বনাম পাভলভ : ধারণা ও পদ্ধতিগত আলোচনা

পূর্বেই পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তথাপি মনে হয়, ফ্রয়েডের পদ্ধতি ও ধারণার পাশাপাশি আর একবার পাভলভীয় পদ্ধতি ও ধারণার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, দুই মনীষীর তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে আবশ্যক।

হ্যারি. কে. ওয়েলস দুজনের পদ্ধতির তুলনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন যে পাভলভ লালাগ্রন্থীর নালিপথে (salivary fistula) উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত অনুসন্ধান, চালিয়েছিলেন, আর ফ্রয়েড স্বপ্নের নালিপথে (dream fistula) মনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। সুকঠিন করোটির অভ্যন্তরে অবস্থিত মস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষগোচর হয় না, কাজেই পাভলভ 'ক্রনিক' পদ্ধতি আবিষ্কার করে জীবিত সুস্থ প্রাণীর মস্তিষ্কক্রিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করেন। মনের সবটাই প্রায় অজানা, ভাসন্ত তুষারস্তূপের (iceberg) মত দশ ভাগের নয় ভাগ অতল সাগরে অদৃশ্য—কাজেই ফ্রয়েড স্বপ্নের নালিপথে নির্জ্ঞান রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রয়াস করেন। তুলনা কিন্তু এখানেই শেষ। পাভলভ বিজ্ঞানের চিরাচরিত পন্থায় তাঁর অনুসন্ধান চালালেন। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহী অংশকে বাইরের বা দেহের ভিতরকার কোনো উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত করলে উদ্দীপনার তরঙ্গ স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে সাড়া জাগায় —এই কথা তাঁর জানা ছিল। পরাবর্ত (reflex) সম্পর্কে পূর্বসূরীদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি পাভলভ স্বীকার করে নিলেন, সেই সব তথ্যের সাহায্যে ও তাঁর অভিনব গবেষণাপদ্ধতি প্রয়োগ (লালাগ্রন্থীর নিঃসরক নলটিকে অস্ত্রোপচারের দ্বারা বাইরের চামড়ার সঙ্গে যুক্ত করে) করে নিঃসৃত লালাকে পাত্রে সঞ্চিত করে তার পরিমাণ ও গুণাবলী নির্ণয় করবার সুযোগ করে নিলেন। এইভাবে আবিষ্কৃত হল যুগান্তকারী শর্তাধীন পরাবর্ত-ক্রিয়া, জানা গেল তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ। শর্তহীন অর্থাৎ জন্মগত পরাবর্ত ও শর্তাধীন অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ পরাবর্তের পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে, মনোবিদ্যার বস্তুবাদী অর্থাৎ মস্তিষ্কভিত্তিক ও বিষয়মুখীন (objective) গবেষণার পথ প্রদর্শন করলেন। বিজ্ঞানের ঐতিহ্য পুরোপুরি মেনে চলে তিনি কোপারনিকাস, নিউটন

প্রমুখের মত যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।* ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে লালা নিঃসরণের সম্পর্ক স্থাপন প্রাথমিক পর্যায়ের অতি সরল মানসিক ক্রিয়ার মডেল সৃষ্টি—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। এখানে ঘণ্টা বাজানো—কারণ, সঙ্গে লালা নিঃসরণ-কার্য; কার্যকারণ সুনিশ্চিত ভাবে সম্পর্কিত—এই ভাবে নিমিত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। পাভলভ ও সহকর্মীরা সব ইন্দ্রিয়-মাধ্যমে শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন করেছেন, দেখেছেন মস্তিষ্কবল্কল (cortex) হীন প্রাণীর শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরী হয় না। হাজার হাজার এই ধরনের পরীক্ষা থেকে তাঁরা অজস্র উপাত্ত সংগ্রহ করে, সেগুলির যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে শর্তাধীন পরাবর্ত তত্ত্ব ও ঐ তত্ত্বভিত্তিক মনোবিদ্যা গড়ে তুলেছেন। শর্তাধীন পরাবর্ত উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্ট কল্পনা নয়, কঠোর পরিশ্রম ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সামান্যীকরণের ফলে এর উদ্ভব : রাতারাতি কয়েকটিমাত্র তথ্যকে কেন্দ্র করে চমকপ্রদ অনুমানের সাহায্যে গড়ে ওঠা কোনো তত্ত্ব নয়। যে-কোনো গবেষণাগারে যে-কোনো পরীক্ষক সব সময়ে একই ফল যদি পায় তবেই বুঝতে হবে পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি অবজেকটিভ ও নির্ভরযোগ্য। পাভলভের পরীক্ষালব্ধ তথ্য সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদ সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা করেন নি; যদিও তাঁদের অনেকেই তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাভলভের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

ফ্রয়েড কিন্তু প্রধানত দুটি পর্যবেক্ষিত তথ্যকে ভিত্তি করে তাঁর অনুমান ও দূরকল্পনানির্ভর মনস্তত্ত্ব গড়েছেন। রোগীদের বেদনাদায়ক ঘটনা ভুলে যাওয়া এবং সেই ভুলে যাওয়া ঘটনা ও ঘটনা-সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভকে স্মৃতিপথে আনার বিরোধিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কাঁচা ও দুর্বলভিত্তির উপর অনুমাননির্ভর বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছেন। তিনি অনুমান করেছেন যে মানুষের সহজাত মৃত্যুরতি প্রবৃত্তি তাকে প্রধানত পরিচালিত করে, যান্ত্রিক শক্তির মত মানসিক শক্তির (psychic energy) অস্তিত্ব আছে, অবদমনের ফলে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত সাইকিক এনার্জি নির্জ্ঞানের রাজ্যে নির্বাসিত হয়, সেন্সর বা পাহারাদার নির্জ্ঞান থেকে সজ্ঞানে আসার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে,—আর নির্জ্ঞানস্থিত অবদমিত বাসনা কামনা নানা বাঁকাচোরা পথে ছদ্মবেশে চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করার জন্যে নিয়ত সচেষ্ট।

এইসব অনুমান অসত্য বা অসার কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার কথা কেউ বলবেন না। বিজ্ঞানের সব তত্ত্বই রাশি রাশি পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—একথা বলা চলে না। বিমূর্ত 'গাণিতিক সঙ্কেতভিত্তিক

---

* প্রথম ও চতুর্থ খণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন

তত্বও আধুনিক বিজ্ঞানে কম নেই। কিন্তু সেই তত্বভিত্তিক গণনা সব সময়েই বিভিন্ন পরীক্ষকদ্বারা পরিচালিত হলেও প্রায় একই রকমের হয় এবং মিলে যায়। নতুন তথ্য বা উপাত্ত যদি কোনো পুরনো তত্বের সূত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করা না যায়—তবে তত্বকে পরিবর্তিত করা হয় অথবা পুরনো তত্বের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ফ্রয়েডের অনুমানসিদ্ধ প্রতীক সংকেতের অর্থ নির্বিচারে মেনে না নিয়ে স্বপ্নব্যাখ্যা বা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে মনোরাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এই প্রতীক-সংকেতের অর্থ ফ্রয়েড উদ্ভাবিত এবং কেবলমাত্র ফ্রয়েডবাদীদের দ্বারাই সমর্থিত।* ফ্রয়েডবাদের সমালোচকদের প্রধান ও প্রথম আপত্তি এই যে, ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষা-পদ্ধতির গোড়াতেই গলদ। তাঁর অনুসন্ধান পদ্ধতি, বিচার বিশ্লেষণ ও তত্বপ্রণয়নের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত বিধান লঙ্ঘিত। ফ্রয়েড প্রথমে নিউরোটিকদের ব্যবহারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একটি তত্ব প্রণয়ন করেন। পরে অন্য রোগীদের মধ্যে সেই রোগ-উপসর্গ ও ব্যবহার বৈশিষ্ট্য দেখে ভুল করে মনে করেন যে এর দ্বারা তাঁর তত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। ফ্রয়েডের অনুগামী অন্যান্য মনোসমীক্ষক ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণকেই শুধু নিজেদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থন করেছেন। তাঁর তত্ব প্রমাণের কোনো চেষ্টা করেন নি।** বাচ্চাদের আঙুল চোষা থেকে ফ্রয়েড যে তত্ব প্রণয়ন করেছেন, তাঁর সমর্থকরা আরও অনেক শিশুকে আঙুল চুষতে দেখে সেই তত্বের সমর্থন করেছেন। ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ নিঃসন্দেহে মনের রোগের বহু লক্ষণ ও উপসর্গ আবিষ্কার করে মনোরোগবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে কিন্তু তাঁর তত্ব অপ্রমাণিত ও রহস্যময় রয়ে গেছে। একথা শুধু বস্তুবাদী পাভলভ-পন্থীরা নন, আরো অনেকে, যাঁদের পাভলভের প্রতি বা বস্তুবাদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই—তাঁরাও বলেছেন।*** মানুষের আচরণ মূলত শৈশবের

---

* 'পাভলভ পরিচিতি' ৪র্থ খণ্ডে স্বপ্ন-প্রতীক সম্পর্কে আলোচনা পাবেন

** Psycho analysis suffers from an absolute error in scientific methodology. The analysts make certain observations about the behaviour of neurotic people. They draw a theory from these observations and then mistakenly believe that this theory is proven when they can make other observations of the same type and kind as the first ones on which theory was based. (Furst : The Neurotic, Citadel Press, New York 1954)

***...the psychoanalysts say that person's thoughts or behaviour arise from sources entirely within himself, or from some part of his mind which is "Unconscious" and

অবদমিত কামনা বাসনার (প্রধানত কামেচ্ছা) উপর নির্ভরশীল ; পরবর্তীকালের অন্য সব ঘটনা তুচ্ছ অথবা শৈশবের অবদমনের দ্বারা প্রভাবিত—এই তত্ত্ব যুক্তি-নির্ভর বলে অনেকেই ভাবতে পারেন না। পারিবারিক সমস্যা, মাতাপিতার সম্পর্ক, সন্তানের আচরণ ও মানসিকতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু সেই প্রভাব আজীবন তার সকল ক্রিয়াকর্ম ও চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রক—এই ফ্রয়েড়ীয় শিক্ষার সারবত্তা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতে বাধ্য। চার বছরের শিশুর মধ্যে যুবকের যৌনধর্মিতা আবিষ্কার করার মধ্যে নতুনত্ব আছে কিন্তু এ আবিষ্কারের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক নেই।* এই একরৈখিক মতবাদ অনেকের মতে অগ্রাহ্য। এই সব কথা নানা স্থানে উল্লিখিত হয়েছে ; পাঠকদের সুবিধার্থে এই খণ্ডের একস্থানে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তত্ত্বগঠনে বৃত্ততুল্যতা (circularity) ফ্রয়েডবাদের একটি গুরুতর ত্রুটি। শিশুর সব কিছু সমস্যা মাতাপিতার মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত, মাতাপিতার মানসিকতা আবার তাঁদের মাতাপিতার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতিদ্বারা নির্ধারিত—এইভাবে বিচার করলে সমাজব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলা যায় বটে, কিন্তু সঠিক কারণ নির্ধারণ করা যায় না। বিষয়ীগত দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মূলে যে বিষয়গত (objective) উপাদান আছে তাকে উপেক্ষা করলে মানসিকতার এবং নিউরোসিসের সমাজ-পরিবেশগত কারণের অনুসন্ধান ব্যাহত হয়। পরিবারের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ সেখানেই পারিবারিক নিয়মকানুন, বিধি-ব্যবস্থা, ন্যায়নীতির উৎস বিদ্যমান। ব্যক্তি হিসেবে মাতাপিতার মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কোন বিশেষ ধরনের নীতি-আদর্শ ও

---

thereby shut off from influence emanating from the world of reality outside the brain. This trend leads into pure mysticism...the antiscientific nature...is perhaps most clearly seen when psychiatrists...overlook all economic and political causes of world tension, claiming instead that social problems are created by improper methods of raising children. (Saul in Psychoanalytic quarterly Vol. 18 No. 2, 1949)

* Freud conceived of people only in one way, namely that after the age of three or four they are driven by adult sexuality—consciously or unconsciously—as the main motivation in life. It is only this philosophically static viewpoint which would permit Freud to visualize children as miniature adults or to conceive of adults as enlarged children. (Furst : The Neurotic, 1954, p 103)

আচরণ তাঁরা শিশুমনে অনুপ্রবিষ্ট করছেন—তাঁর গুরুত্বই বেশী।* বয়ঃসন্ধিকালের (ফ্রয়েডের পরিভাষায় phallic stage) যৌনসমস্যা সহজ প্রবৃত্তিগত জৈব সমস্যা নয় ; সমাজে প্রচলিত নর-নারীর সম্পর্ক ও সমাজসংগঠনের সঙ্গে এই সমস্যা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যৌনতা সম্পর্কিত কুসংস্কার, রহস্যময়তা, সমাজে পুরুষ প্রাধান্য, বিবাহের ও বিবাহ-বিচ্ছেদের বিশেষ আইনকানুনের সঙ্গে যৌনসমস্যা জড়িত। একজন আমেরিকান মনোরোগবিদ মন্তব্য করেছেন যে, সমাজে নরনারীর সমমর্যাদা বিদ্যমান থাকলে এবং পরিবারের সংগঠন পরিচালনা আরো স্বাস্থ্যকর হলে, •যৌনসমস্যার জটিলতা অনেকখানি হ্রাস পেতে বাধ্য।** ফ্রয়েড প্রেমের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা মেনে নিলে বা তার দ্বারা প্রভাবিত হলে নর-নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক ও প্রেমের মধ্যে পরস্পরকে ভলেবাসা বা পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর মতে স্ত্রী স্বামীর মধ্যে পিতাকে পেতে চায় বলে তাকে ভালবাসে, অথবা তার নিজের লিঙ্গহীনতা গূঢ়ৈষার (castration complex) দরুণ হীনমন্যতা দূর করতে স্বামীর বা প্রেমিকের উপর নির্ভর করে।*** পুত্রসন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার মূলেও ঐ একই মানসিকতার প্রতিফলন আবিষ্কার করেছেন ফ্রয়েড। মাতৃস্নেহ, ফ্রয়েডের মতে, পুরুষ-বিদ্বেষের (তাদের যৌনাঙ্গের প্রতি ঈর্ষা) উদ্‌গতির ফল।

এই লিবিডোভিত্তিক ধারণার পাশাপাশি পাভলভের পরাবর্তভিত্তিক ধারণা উপস্থাপিত করা যাক। শৈশবে মাতাপিতার ও পারিবারিক প্রভাব ও শৈশব যৌনতা সম্পর্কে পাভলভের বক্তব্য বুঝতে হলে শৈশবে শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মানবশিশু, পাভলভের ধারণা অনুযায়ী, প্রধানত দুটি শর্তহীন পরাবর্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—আত্মরক্ষামূলক পরাবর্ত ও প্রজাতি-সংরক্ষণ পরাবর্ত। আত্মরক্ষামূলক শর্তহীন কতকগুলি সহজাত শারীরবৃত্তিক ধর্ম প্রথম থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা যায়, যথা—চোষা, গেলা, মলমূত্র ত্যাগ, প্রাথমিক আত্মরক্ষামূলক চেষ্টা (চোখের কাছে আঙুল নিয়ে গেলে চোখ

---

* The Key question is not the psychology or behaviour of the parents as individuals. The Key question is the nature of the aspects of capitalist morality, ideology and practice which the parents transmit to the child. (Ibid p 132)

** Would sex be a serious problem if the relations between men and women were on an equal basis and if the organisation and maintenance of family life had a sounder footing than at present ? (Ibid p 140)

*** Freud, S. : New Introductory Lectures on Psycho-analysis p 174-175

বন্ধ করা, খোঁচা দিলে হাত সরিয়ে নেওয়া,—ইত্যাদি), অবস্থান নির্ণয় (orientation reflex), বন্ধনমুক্তি চেষ্টা (freedom reflex)। কিন্তু এ সবগুলিই সংবেদন সাপেক্ষ। অর্থাৎ ঠোঁটে কিছু ছোঁয়ালে শিশু চোষার চেষ্টা করবে, হাতে খোঁচা মারলে হাত সরিয়ে নেবে ও ব্যথা পেলে কাঁদবে। সংবেদন ছাড়া শর্তহীন পরাবর্ত চালু হতে পারে না ; সংবেদন ছাড়া শর্তাধীন পরাবর্ত বা নতুন অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মালেও বাইরের জগতের বা দেহের ভিতরকার কোনো না কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত না করলে শর্তহীন পরাবর্ত (সহজাত প্রবৃত্তিক্রিয়া) সক্রিয় হয় না। শর্তাধীন পরাবর্ত বা নতুন অভ্যাস তো পুরোপুরি সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। এ সব সিদ্ধান্ত পাভলভের অনুমান নয়, ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ উপাত্তভিত্তিক ধারণা। মলমূত্র ত্যাগের ব্যাপারে ও মলদ্বারে বা মূত্রাশয়ে সঞ্চিত মলমূত্রের চাপ সংবেদন সৃষ্টি করে বলেই মলমূত্রত্যাগের মত সহজাতক্রিয়া সচল হয়। এই সব ক্ষেত্রেই সংবেদন স্নায়ুতন্তুবাহিত হয়ে মস্তিষ্কত্বকের সংশ্লিষ্ট কোষে পৌঁছে সাড়া জাগায় বলেই প্রাথমিক শারীরবৃত্তিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে পাভলভ প্রাথমিক সহজাতক্রিয়াগুলির ওপরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা শর্তাধীন পরাবর্তিক ক্রিয়া বা মননক্রিয়ার বিষয়মুখীন গবেষণার পথ নির্দেশ করলেন ; মনস্তত্ত্বকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করবার বৈপ্লবিক পদ্ধতি সহকর্মী ও উত্তরসূরীদের কাছে তুলে ধরলেন। মনোবিদ্যার গবেষণা পাভলভের নির্দেশিত পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের প্রয়োজন—অনেক গবেষকের মধ্যে তার অভাব থাকার দরুনই পাভলভ নির্দেশিত পথ তাঁর দেশেও সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি এবং মানুষের পবিত্র আত্মাকে ল্যাবরেটরীর গবেষণার বিষয়বস্তু করার অপরাধে তিনি অনেকের দ্বারা নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়েছেন এবং লেনিনের সরকার গঠিত হবার পূর্বে গবেষণাকার্যের জন্য উপযুক্ত উৎসাহ ও অর্থসাহায্যের অভাবে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি ক্রমশ বুঝতে পারলেন কিভাবে সংবেদন থেকে প্রত্যক্ষণ, এবং প্রত্যক্ষণ থেকে ধারণা গড়ে ওঠে। এই ব্যাপারে স্নায়ু ও মস্তিষ্কের অর্থাৎ মননক্রিয়ার অধঃস্তরের ভূমিকা নির্ণয়ই পাভলভীয় গবেষণার বিশিষ্ট অবদান এবং এখানেই ফ্রয়েডের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য।

পাভলভের পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে কথা বলার আগে পর্যন্ত শিশুর অভ্যাস গঠন ও উচ্চপ্রাণীর অভ্যাস গঠন প্রায় একই ভাবে হয়ে থাকে। এই অভ্যাসের ফলশ্রুতিই শিশু-মানসিকতার প্রথম পর্যায়। প্রায় একই ভাবে গড়ে উঠলেও শিশুমনে তার সামাজিক পরিবেশের প্রভাব এই প্রাথমিক পর্যায়েও শিশুমনকে পশুমন থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সামাজিক পরিবেশের প্রভাব কিন্তু নগণ্য নয়। এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে

মানবশিশু প্রাথমিক মানবিক ধর্ম আয়ত্ত করে—যা পশুদের অলভ্য। শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক—দুই ক্ষেত্রেই নতুন গুণাবলীর বিকাশের পক্ষে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মজন—এক কথায় পরিবার,—সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। বৃহৎ সমাজে একই সময়ে বহু রকমের সাংস্কৃতিক ধারা, রীতিনীতি, নিত্যকৃত্য, মূল্যবোধ প্রচলিত থাকতে পারে। একটি পরিবার সাধারণত সে সমাজের একটি বিশেষ ধরনের ভাবধারা ও রীতিনীতির বাহক। অবশ্য পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি মূল্যবোধের অনুগামীও হতে পারেন। সকল শিশুর মানসিকতা গঠনে পরিবারের—তথা সমাজের সেই সব প্রভাবই কার্যকর হবে, যেগুলির সঙ্গে শিশু সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত। তবে, মোটামুটি একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, সমাজের বহু করণীয় ও অকরণীয়, বাঞ্ছনীয় ও অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে শিশুমনে বাক্‌শক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধারণা জন্মায়। বেশির ভাগ সমাজেই শিশুচর্চার ভার মা-ঠাকুমা-দিদিমা নিয়ে থাকেন। যে-সমাজে ছেলের মূল্য বেশি, মেয়ের মূল্য কম; সেখানে স্বভাবতই পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের লালন ও চর্যার ব্যাপারে মা-ঠাকুমার ব্যবহারের কিছুটা পার্থক্য দেখা দিতে পারে। ব্যবহারের বৈষম্য আদরযত্নের ত্রুটি বা আধিক্য বাক্‌স্ফূর্তি ও অন্যের কথা বোঝার ক্ষমতা আয়ত্ত করার পর শিশু অন্তত কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়। বাক্‌স্ফূর্তির পর থেকে শিশুর শিক্ষার ও নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করার ক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের সামান্যীকরণ ও বিমূর্ত-করণের ফলে কিভাবে বাক্‌ভিত্তিক শর্তাধীন পরাবর্ত গঠনের অজস্র সম্ভাবনা দেখা দিয়ে থাকে, সে সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।* শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের লোক ছাড়া বাইরের অনেকের সাহচর্য পায়। অনেক কিছু শুনে, অনেক কিছু দেখে, কিছু কিছু জ্ঞান সে পাঠ্যপুস্তক ও খেলার সাথী বা শিক্ষকদের কাছ থেকে লাভ করে। এ সব ব্যাপারে বাক্‌শক্তির ভূমিকাই প্রধান।** নতুন যা-কিছু শিখছে, নতুন যে

---

* 'পাভলভ পরিচিতি' প্রথম খণ্ডে এই আলোচনা আছে

** The problem raised by Pavlov of the second signalling system and the highly important question of the inter-relation between the first and the second signalling systems are of exceptional significance for the physiology of the higher nervous activity, as well as for psychology, pedagogies and clinical medicine...Pavlov's concepts of two signalling systems in man will undoubtedly play an

অভ্যাস গড়ে উঠছে, সবই তার শর্তাধীন পরাবর্তকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও শর্তাধীন পরাবর্ত তার শর্তহীন পরাবর্ত—সহজাত প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত ও সংস্কৃত করছে। সে পশুশিশু থেকে ধীরে ধীরে মানবশিশু হচ্ছে, সমাজের উদ্দীপক তাকে ক্রমশ সামাজিক জীবে পরিণত করছে। পশুসুলভ জৈব প্রবৃত্তি শৈশব থেকেই ক্রমোন্নত মানবসুলভ সামাজিক ধর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে। পশুপ্রবৃত্তির উপর চুনকাম ও পালিশ করে তাকে চকচকে করে তোলা হচ্ছে না, সহজাত প্রবৃত্তিকে সামাজিক প্রয়োজনের শর্তদ্বারা গঠিত পরাবর্তের সাহায্যে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করা হচ্ছে। যে সমাজে ফ্রয়েডের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে, সেই সমাজে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়ছে, বুর্জোয়া সভ্যতার পত্তন চলেছে; পরিবৃত্তিকালীন নানা সংকটের উদ্ভব ও সমাধানসূত্রের সন্ধান একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। একদিকে ইহুদী বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর শৃঙ্খলহীন অবাধ কামক্লিন্ন জীবনযাপন, প্যারী-কমিউনের পতনের দরুণ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মনে হতাশা সিনিসিজম (eynicism); আবার অন্যদিকে মার্কসবাদ-প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের ক্রমবর্ধমান দাবীদাওয়া ও আশাবাদী বুদ্ধিজীবীর আমূল পরিবর্তনের সপক্ষে নানানধরনের প্রচার। সমাজের নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক দিকটির প্রতি ফ্রয়েডের নজর পড়ল। তিনি সমাজের বিশেষ শ্রেণী ও ব্যক্তির মধ্যে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বকে মানুষের স্বভাবে-নিহিত ধর্ম বলে মনে করলেন; সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অলস সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর যৌনবিকারগ্রস্ত রোগীদের গোটা সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় জ্ঞান করলেন। এদের চরিত্র ও মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করে স্বাভাবিক মনের ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব প্রণয়ন করলেন.। লিবিডোতত্ত্ব ও ইডিপাসতত্ত্ব দিয়ে তিনি তদানীন্তন পচনশীল সমাজের সব-কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেলেন। কঠিন করোটির আড়ালে অবস্থিত মস্তিষ্কের ক্রিয়াকাণ্ডের অধ্যয়ন বা বিশ্লেষণের কোনো উপায় না পেয়ে, তিনি নির্জ্ঞানভিত্তিক মনস্তত্ত্ব গঠনে তাঁর দুর্লভ প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেন। সমাজ বিশৃঙ্খলার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে তাঁর দূরকল্পনাভিত্তিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যা ও সমাধানের চেষ্টা করলেন। লিবিডোকে আদ্যাশক্তি কল্পনা করে শিশু থেকে বয়স্ক মনের সুস্থ অসুস্থ সব-রকম কার্যকলাপ লিবিডোরই খেলা মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। অপরপক্ষে, পাভলভ শিশুমনের বিকাশে ও নতুন ধর্মের উন্মেষে মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করলেন, মানবমস্তিষ্কের

---

important part in the complex branch of science... problems of linguistics. (Koshtoyants : Selected Works of I. P. Pavlov, P 14)

বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন, শিশুর মানসিকতা গঠনে মস্তিষ্ককোষের উত্তেজনা-নিস্তেজনা-ধর্মের সাহায্যে পরিবেশের উদ্দীপনাসঞ্জাত শর্তাধীন পরাবর্তের ভূমিকা নির্ণয় করলেন।* কিন্তু কখনও স্নায়ুতন্ত্রের শারীরবৃত্ত আর মনস্তত্ত্বকে এক মনে করলেন না, তাদের সমীকরণ করলেন না। মস্তিষ্ককে মানসিকতার অধঃস্তর হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ফ্রয়েডের লিবিডোভিত্তিক মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, এর ত্রুটি বিচ্যুতি নানাভাবে প্রদর্শন করেছেন ;—তার কিছু কিছু আমরা স্থানান্তরে বিবৃত করেছি। পাভলভ ও ফ্রয়েডের তুলনামূলক বিচারের অন্য এক বিশেষ দিক আছে—বলেছেন হ্যারী. কে. ওয়েলস। পাভলভই প্রথম মস্তিষ্কাশ্রিত মনোবিদ্যা গঠনের পথ প্রদর্শন করেন। এই পথের অভাবেই সাইকোএ্যানালিসিস-এর মত অনুমানভিত্তিক মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল।** আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের এক বিশেষ শূন্যতা পূরণ করে পাভলভ বিজ্ঞানীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ফ্রয়েড বিষয়মুখীন বিজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে বিপরীতমুখী পথে চলেছেন; মস্তিষ্কক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল মননক্রিয়াকে মস্তিষ্কবিজ্ঞান ছাড়াই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মন দিয়ে মনকে জানবার এই বিষয়মুখীন ভাববাদী প্রচেষ্টাকে মেটাসাইকোলজি বলে অভিহিত করলেও তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে 'নির্জ্ঞানের বিজ্ঞান' বা "the science of unconcious mental activity" বলতে কুণ্ঠিত হননি।*** উইলিয়াম ইউনিয়াম জেম্‌স সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী কোনো বিষয়ের অজ্ঞতার দরুণ, সেই অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টার পরিবর্তে যদি অতিকথা, রহস্যময়তা দিয়ে অজ্ঞতাকে দুর্জ্ঞেয় করে তোলেন, তা হলে তাঁদের অসাধারণ

---

* পাভলভ পরিচিতি ৪র্থ খণ্ডে পাবেন

** It is undoubtedly true, that a similar confrontation of Freud's psychology by almost any other experimental approach would provide a contrast sufficient to render a verdict against psychoanalysis. Still the confrontation of Freud by Pavlov has one over-riding advantage. The latter's science of higher nervous activity has at least began the crucial task of filling the gap in human knowledge which historically made possible the Freudian type of speculative psychology. (Wells, H. K. : Pavlov & Freud, Vol. 2, 1960, p 176)

*** Freud : An Autobiographical Study, p 129

মনীষা ও কল্পনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা দাবী করতে পারেন না।*

পরিবারের পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠবে, সেটা—পাভলভের মতে, নির্ভর করছে সমাজের কোন ধরনের উদ্দীপক পিতামাতা ও সন্তানকে প্রভাবিত ও শর্তায়িত করছে তার ওপর। এ সম্পর্ক সহজকামজ প্রবৃত্তি নির্ধারিত নয়। সন্তানের শৈশবের জৈবিক ও মানসিক প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও ব্যবস্থা, সমাজ ও পরিবারের কতটা পরিমাণে আছে এবং কি উপায়ে প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে—তার সঙ্গে সম্পর্কিত। লিবিডোর মৌখিক তৃপ্তি না ঘটলে পরিণত বয়সে ব্যক্তি খাদ্যলোলুপ হবে—এ কথা কি ঠিক ? পরিবর্তে যদি বলা হয় যে বাচ্চার ক্ষুন্নিবৃত্তি না হলে সে পেটুক হবে, তবু তার মধ্যে কিছুটা যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তাও সব সময় ঘটে না ; অনেকদিন ধরে অনশনে অর্ধাশনে থাকলে খাদ্যের প্রতি, এমন কি জীবনের প্রতিও আকর্ষণ চলে যেতে পারে। খাদ্যের সংকেত করে কয়েকবার যদি খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, তবে কুকুর সংকেতে আর সাড়া দেয় না, খাদ্যপাত্র তাকে আর আকৃষ্ট করে না—এটা পরীক্ষিত সত্য। অনেকেই জানেন যে, প্রথম বৎসরের মৌখিক বা চোষার চাহিদা ভালভাবে মেটা সত্ত্বেও অনেক শিশু আঙুল চোষায় অভ্যস্ত হয়। এর কারণ, শিশুকে শান্ত রাখতে স্তন বা পরিবর্তে অন্য কিছু চুষতে শিশুকে অভ্যস্ত করা হয়েছে। সমাজের ব্যক্তি-সম্পর্ক পরিবারের ব্যক্তি-সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয় না,—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেই রকম মনে হতে পারে। আসল পারিবারিক সম্পর্ক সমাজের আর্থনীতিক সংগঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যৌনতার প্রশ্নে পাভলভপন্থীরা বলেন যে শিশু যৌনরিফ্লেক্সের সব কিছু উপাদান নিয়েই জন্মগ্রহণ করে ; কিন্তু যৌনগ্রন্থি ও যৌনাঙ্গের ক্রম-পরিণতির সঙ্গে যৌনতার বিকাশ ঘটতে থাকে। পরিবারের মধ্যে যৌনব্যাপারে সমসাময়িক সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিকতা, ন্যায় অন্যায় বিচার প্রতিফলিত

---

* There may have been an excuse for Freud, as for his contemporaries, including William James, in the absence of this science. Although in the field of seience itself, ignorance, even objective ignorance cannot constitute ground for nullification of the scientific method and for resort to conjecture...At any rate, our conclusion is that Freud's science of unconscious Mental activity appears as a mythical substitute for the science of higher nervous activity ; to the temporary lack of which psychoanalysis owes its very existenee. (Wells, op cit, p 178)

হতে বাধ্য। শিশুমনে যৌনতার প্রভাব সমকালীন সামাজিক প্রভাবেরই এক বিশেষ রূপ। যুগে যুগে এর পরিবর্তন ঘটে। ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরিজী সাহিত্যে শিশুদের যৌনক্রিয়া ও সমস্যার বিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডোত্তর সাহিত্যে ও মনস্তত্ত্বের পুঁথিতে শিশুদের কামেচ্ছা অথবা ভালবাসার ইচ্ছা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব আলোচনায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজে পুরুষ প্রাধান্য, পারিবারিক কলহ, দারিদ্র্য ইত্যাদির উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি। সব কিছু ঠিকমত বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ছেলে মেয়ে সকলেরই সাধারণত মায়ের প্রতিই বেশী ভালবাসা ও আকর্ষণ থাকে। কারণ মা তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করেন এবং বেশির ভাগ সময়েই বাড়ীতে থাকেন। আজকাল মায়েরাও কাজে বেরুচ্ছেন; তাই বিশেষ করে, যৌথ পরিবারের বাইরে শিশুরা ঝি চাকরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, মা বাবাকে অল্প সময়ের জন্য পাবার দরুণ তাঁদের প্রতি অভিমান ও চাপা বিতৃষ্ণা পোষণ করে। যেখানে মা চাকরী করেন, বাবা কোনো কারণে বেকার হয়ে বাড়ীতে থাকেন, সেখানে শিশু—ছেলে মেয়ে দুজনই—বাবার নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই সব দেখেশুনে ফ্রয়েড শেষের দিকে তাঁর ইডিপাস তত্ত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কন্যার মায়ের প্রতি আসক্তির নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। এ-সম্পর্কে ফার্স্টের মতামতের গুরুত্ব আছে, কেননা তিনি অনেকবছর ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছিলেন।* তাঁর মতে পিতা-পুত্রী ও মাতা-পুত্রের ভালবাসার ও পরস্পর নির্ভরতার মধ্যে ফ্রয়েড বর্ণিত যৌনতার সম্পর্ক নেই। দু'একটি অতি বিরল ঘটনার উল্লেখ হয়তো করা যায়, কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সে ঘটনা সহজাত প্রবৃত্তির নিদর্শন

---

* It is important to note that children of both sexes generally tend to seek re-assurance from the person who most constantly takes physical care of them. Childern also become overconcerned with and over-attached to their father if he stays at home...when Freud found that both boys and girls generally became fixated to their mother, he deserted his early formulations and pristine simplicity of his theory was marred by an extensive secondary hypothesis...observations demonstrate that the child's overconcern with parents almost never shows the sexual manifestations which Freud ascribed to them. Sexual fixations to parents do not arise except in the extremely rare instances when the parents have made unequivocally sexual advances to the child. (Furst, op cit, pp 111-112)

নয় ;—সে ঘটনার মূলে আছে মাতাপিতা কর্তৃক সন্তানকে যৌনকার্যে প্ররোচিত করা অথবা উৎসাহ দেখানো।

ইডিপাস ও শৈশব-যৌনতার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এবার ফ্রয়েডের অবদমন ও নির্জ্ঞানতত্ত্বের পাভলভীয় বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যাক।

মানবচেতনা সম্পর্কে ফ্রয়েড ও পাভলভ

ফ্রয়েডের প্রকোষ্ঠভিত্তিক মনস্তত্ত্বের ত্রুটী প্রধানত দুটি। এক : 'সাইকিক এনার্জি' বা মনের চালিকাশক্তি সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা এবং মনোযন্ত্রের সংজ্ঞার্থের অভাব। দুই : মনের প্রকোষ্ঠে,—বিশেষ করে—নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে এই শক্তির অবস্থিতির প্রমাণাভাব। বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও স্নায়বিক প্রক্রিয়ার স্থানিক অবস্থান নির্ণয় সম্ভব, এবং এ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বেশি স্পষ্ট। কিন্তু মানসিক প্রক্রিয়ার অবস্থানের বিশেষ প্রকোষ্ঠ বলতে কি বুঝেছেন ফ্রয়েড, তা তাঁর একান্ত অনুগামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হবে। পাভলভ যখন মননক্রিয়ার অধঃস্তর—স্নায়ুপ্রক্রিয়ার কথা বলেন, তখন আমরা স্পষ্ট কিছু ধারণা করতে পারি। আর এই সম্পর্ক যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হয়, তখন ধারণা দৃঢ়প্রত্যয়ে পরিণত হয়। তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তি, তাপ শক্তি, স্নায়বিকশক্তি ইত্যাদির অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার ; কিন্তু মানসিক শক্তি সেই আগেকার 'ইলান ভাইটাল' বা প্রাণশক্তির মতই অনুমেয় মাত্র ও অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। বস্তুবাচক বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে তিনি মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াকে বিশেষ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, ফলে, তাঁর প্রতিশব্দগুলি অর্থব্যঞ্জক না হয়ে অর্থহীন হয়ে পড়েছে।* 'সাইকিক এনার্জি' শুধু প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে তাই নয় ; বৈদ্যুতিক শক্তির মত প্রকোষ্ঠ থেকে অন্যপ্রকোষ্ঠে যাতায়াতও করে। অবদমিত ইচ্ছা আবার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষের মধ্যে

---

* It makes sense to speak of an electrical a mechanical... nervous apparatus or compartment, but what does mental apparatus or compartment denote ? It makes sense to speak electrical, mechanical...nervous energy, but what can be denoted by psychic energy ? Freud combines perfectly clear and scientific terms denoting material objects and processes with the term 'mental' or 'psychic', thereby conjuring up an absolutely contradictory and meaningless concept. (Wells, op cit, p 96)

সংক্রমিত হয়ে থাকে। মানসিকতার সঙ্গে মস্তিষ্কের ও স্নায়ুপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা না করে, তিনি মানসিক প্রক্রিয়াকে ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকল্প (hypothesis) তৈরীর ক্ষেত্রে এ-ধরনের তুলনা চলতে পারে, কিন্তু এই তুলনা যদি চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে, তবে তার ফলে অলীক যুক্তিহীন ধারণার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা।* ফ্রয়েড কিন্তু তাঁর প্রকোষ্ঠ-ভিত্তিক তত্ত্বের সমর্থনে বলেছেন যে, এই কল্পনার মধ্যে নতুনত্ব বা উদ্ভটত্ব কিছু নেই ; মস্তিষ্কের শারীরস্থানিক জ্ঞান থেকে এই প্রকোষ্ঠভিত্তিক কল্পনা তিনি গঠন করেছেন।** করোটির গঠন আবরণ ভেদ করে বহির্বাস্তবের উদ্দীপনা গুরুমস্তিষ্ক-ত্বকে প্রবিষ্ট হতে পারে না ; কিন্তু লঘুমস্তিষ্ক থেকে জৈবপ্রবৃত্তিজাত উদ্দীপনা অনায়াসে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়ে আলোড়ন ঘটাতে পারে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-পথে বাইরের জগতের কিছুটা মাত্র আভাস পাওয়া যায়, বহির্বাস্তবকে জানা বা বোঝা যায় না ; জাহাজের কেবিনে বন্দী কোনো যাত্রী পোর্টহোলের ফোকর দিয়ে তাকিয়ে যেমন আকাশ ও সমুদ্রের অংশবিশেষ দেখতে পায়,—মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানও তেমনি সীমিত, বিশেষভাবে পরিমিত।*** ফ্রয়েডীয় সংজ্ঞান বা চেতনা মূলত অন্তরলোকজাত সহজাতপ্রবৃত্তির তৃপ্তি অতৃপ্তির গ্রাহীক্ষেত্র, বহির্জগতের আবছা আংশিক ধারণা হয়তো সংজ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে,—এইমাত্র। জৈবমস্তিষ্ক-জাত সহজ প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রমাণই ফ্রয়েডের উদ্দেশ্য।

পাভলভের মতে চৈতন্য ইন্দ্রিলব্ধ অনুভূতি-প্রত্যক্ষণ-প্রত্যয় দ্বারা গঠিত। ফ্রয়েডের সহজাত জৈবপ্রবৃত্তির—যাকে পাভলভ শর্তহীন পরাবর্ত বলে অভিহিত করেছেন,—এই চৈতন্য গঠনে ভূমিকা আছে বটে, কিন্তু শর্তাধীন ইন্দ্রিয়ভিত্তিক পরাবর্তের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে মানুষের জৈবপ্রবৃত্তি গুণগত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত—মানবিক হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই মূলত চৈতন্যের জনক। দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক

---

* Reasoning by analogy has a useful but highly restricted place in the formation of hypothesis, but when it dominated thought the outcome can only be irrational and fantastic. (Ibid. pp 96-97)

** It will be seen that there is nothing daringly new in these assumptions ; we have merely adopted the views on localization held by cerebral anatomy, which locates the 'seat' of consciousness in the cerebral cortex—the outermost enveloping layer of the central organ. (Freud—quoted by Wells on 'Pavlov & Freud,' Vol 2 p. 86)

*** ....feelers which are all the time making tentative advances towards the external world and then drawing back from it. (Freud : Collected Papers, Vol. IV, p 23)

স্তরভিত্তিক সামাজিক পরাবর্ত প্রধানত চৈতন্যের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক, মানবচৈতন্য নির্জ্ঞানস্থিত অবদমিত কামশক্তি পরিচালিত নয়। প্রায় বিপরীত এই প্রকল্প গঠনে পাভলভ ল্যাবরেটরী ও ক্লিনিক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এই সব উপাত্ত প্রকৃতিবিজ্ঞান অনুমোদিত পরীক্ষানিরীক্ষা লব্ধ—কাজেই বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য। তিনি প্রথমে উচ্চপ্রাণীর চৈতন্য-উন্মেষের বিষয়মুখীন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পরে মানবচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য-অর্জনের প্রকল্প নির্ধারণ করেছেন। প্রাণীর ক্ষেত্রে জন্মদত্ত ও অর্জিত পরাবর্ত একীভূত (fusion) হয়; শিশু পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার—আত্মরক্ষা ও প্রজাতি সংরক্ষণের,—ক্ষমতা আয়ত্ত করে। এই একীভবনের (fusion) ফলে প্রাণী গতিশীল সক্রিয় বাঁধাধরা কতকগুলি আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পাভলভের পরিভাষায় একে বলা হয়েছে—dynamic stereotype। বাঁধাধরা মানে কিন্তু এই নয় যে আচরণগুলো অপরিবর্তনীয়। পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্দীপকের প্রভাবে নতুন আচরণ অভ্যাস গড়ে ওঠে। আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার মত নতুন পরাবর্ত গঠন যদি অসম্ভব হয় তবে প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে; এমন কি, এর ফলে প্রজাতি বিলোপেরও সম্ভাবনা থাকে। মানবশিশুর বেলায় ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শর্তাধীন পরাবর্ত বাক্‌শক্তি স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে আরো সুসংহত সুগঠিত হয় ও বিস্তার লাভ করে। পশুশাবক ও মানবশিশুর মধ্যে গুণগত মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ ভাষাভিত্তিক চৈতন্যের বিকাশ হতে থাকে। এই দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের অধিষ্ঠানও মস্তিষ্কত্বক। ভাষায় বিমূর্তায়নের ক্ষমতা বাইরের জগতের নির্দিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করে ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে বিশেষ সহায়তা করে। এই সময় থেকে বাক্‌ভিত্তিক চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটে। মানব শিশুর বেলায় শর্তহীন পরাবর্ত ও শর্তাধীন অনুভূতিমূলক ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও ভাষার সাহায্যে গঠিত শর্তাধীন পরাবর্তের মিলন মিশ্রণ ও একীভবনের ফলে মানবমনের বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়; সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির অধিকারী মানুষ বাইরের জগৎকে ভালভাবে বুঝতে ও জানতে শেখে; এর ফলে প্রকৃতির নিয়মকানুন অধ্যয়ন অবধারণ করতে পারে। এইভাবে জগৎ সম্পর্কে চেতনার উদ্ভব হয়।

ফ্রয়েডীয় সংজ্ঞান (চেতনা) ও পাভলভীয় চেতনার বিকাশ ও তত্ত্বের বিকাশপদ্ধতি যেমন স্বতন্ত্র, দুজনের চৈতন্য সম্পর্কিত ধারণাও তেমনি আলাদা। সামগ্রিক চৈতন্য ও কোনো বিষয়ে সাময়িক মনঃসংযোগের মধ্যেকার সীমারেখা অনুধাবন করা গেলে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও অবদমনের তাৎপর্য কিছুটা বোঝা যেতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় প্রাণী সাধারণত কোন নির্দিষ্ট সময় মস্তিষ্কে বহির্জগৎ থেকে আগত সব থেকে শক্তিশালী সংকেতে উদ্দীপ্ত হয়, সেই দিকে তার

সমগ্র মন নিবদ্ধ হয় ; অন্য সব মৃদু সংকেত সাময়িকভাবে নিস্তেজিত (inhibited) হয়ে যায়। বলা চলে, অন্য সব কিছু এই সময় সে ভুলে যায়, তার স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়।

পাভলভের পরিভাষায় বলা চলে : শর্তহীন ও শর্তাধীন (বাক্‌ভিত্তিক ও অনুভূতিক) পরাবর্তের একীভবন ও সংযোজনের ফলে জৈবচৈতন্যের উদয় হয়, এই চেতনার সাহায্যে বহির্জগতের ধারণা গড়ে ওঠে, বহির্বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তাৎক্ষণিক জোরালো উদ্দীপক বা সংকেতচেতনা সেই উদ্দীপক অনুষঙ্গিত বিষয়ে সাড়া দেয় বা অভিনিবিষ্ট হয়, সমকালীন অন্যান্য মৃদু সংকেত অনুষঙ্গিত বিষয় তখনকার মত বিস্মৃত বা অবদমিত থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে 'চৈতন্য' কথাটি ব্যবহার করার পরিবর্তে পরিবেশের সঙ্কেতে প্রাণীর সাড়া বা প্রতিক্রিয়া—বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।* কেননা, মানবচৈতন্য, আমরা জানি, মনুষ্যেতর প্রাণীর চৈতন্য অপেক্ষা অনেকখানি উন্নত পর্যায়ের। তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা অনেক বেশী। জোরালো উদ্দীপক হলেই সাড়া দেবে বা অন্যসব ভুলে উদ্দীপক অনুষঙ্গিত বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে পড়বে—এ কথা মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। তার ভাষা-ভিত্তিক চিন্তার সাহায্যে বিশেষ ধরনের চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আছে, এবং মানুষের ব্যবহার ও কাজকর্ম সাধারণত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উদ্দেশ্য-পরাবর্ত মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে সক্রিয়। মানুষ যুক্তিবিজ্ঞানের কেতাব না পড়েই যুক্তিপ্রয়োগে সক্ষম ও অভ্যস্ত। যুক্তির ধারা সঠিক না হতে পারে, যুক্তিপ্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত মানুষ গ্রহণ করে—সে সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে ; কিন্তু তা সত্বেও মানুষ যুক্তিবাদী।**

---

* Rather than speaking of animal consciousness—however it would be scientifically more correct, perhaps, and less confusing to speak of the animal's acquired ability to react to or adapt to, its conditions of lives. Reactivity or adaptability is possibly better suited as a term for such animal phenomena. (Wells, op cit, p 92)

** Consciousness thus includes emotions and ideas and the acquired ability to make logical linkage or association. The latter comprises the essence of thought. Thinking is the following through of a chain of associations according to rules of logical induction and deduction. The latter are themselves conditioned temporary connections composing stereotypes which are acquired in the course of life without any academic training in logic. (Ibid, p 93)

কাজেই তার সাময়িক বা তাৎক্ষণিক মনঃসংযোগ সঙ্কেতের শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ; তার জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ, সামাজিক বিধিনিষেধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানুষ কাজ করার আগে বা সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাবনা চিন্তা করে। অবশ্য প্রক্ষোভতাড়িত অথবা মাদক দ্রব্যের প্রভাবাধীন মানুষ (এই অবস্থায় গুরুমস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে) পশুর মত আচরণ করতে পারে। তাৎক্ষণিক উদ্দীপক পরিচালিত হয়ে সামগ্রিক চেতনার অনেকখানির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার ফলে মানুষ যুক্তিহীন অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।

মানুষ সাময়িকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যখন কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করে, তখন এই মনোনিবেশের পরিপন্থী উদ্দীপক নিরুদ্ধ বা নিস্তেজিত করে রাখে। সম্যক মনোনিবেশের জন্য আংশিক চেতনা সক্রিয় থাকে, বেশির ভাগই থাকে স্তিমিত বা নিষ্ক্রিয়। অন্য চিন্তা-ভাবনা আমরা তখন চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করতে দিই না, অর্থাৎ—যে-সব উদ্দীপক অন্য সব চিন্তাভাবনার সঙ্গে অনুষঙ্গিত, সেগুলিকে গুরুমস্তিষ্কে অনুপ্রবিষ্ট হতে দিই না। এই কাজের প্রধান সহায়ক, মনে হয়, সূক্ষ্মজালতন্ত্র (recticular system)—যেখানে উদ্দীপক বিশ্লেষিত হবার পর গুরুমস্তিষ্কের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবেশাধিকার লাভ করে। এই সাময়িকভাবে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত ঘটনাকে অবশ্য ফ্রয়েডীয় অবদমনের সঙ্গে পুরোপুরি তুলনা করা চলে না। তবে ফ্রয়েডীয় অবদমন সাময়িক বিস্মৃতির সঙ্গে কিছুটা যে তুলনীয়—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে চেতনা সম্পর্কে দুই মহারথীর ধারণা বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে, সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় নি। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। অবদমন তত্ত্ব ও নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না নিলে 'অবদমন' বা 'নির্জ্ঞান' বোধগম্য হতে পারে না। এখানে প্রধানত সামগ্রিক চৈতন্য ও তাৎক্ষণিক মনঃসংযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে।* এ থেকে পাঠক ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান ও

---

* ...the distinction is not between consciousness and unconsciousness, but between consciousness as a vast conglomeration of possible but currently inactive associations of conditioned connections (based on the whole past but still potentially opperative experience of the iudividual) and a small part of this consciousness which is at the moment in active operation. The contrast is thus between consciousness as a whole on the one hand and conscious attention on the other. (1bid p 94)

অবদমনের কিছুটা আভাস পেতে পারেন। পাভলভের মতে শিশুর বাচন-ক্ষমতা আয়ত্তের পর থেকে দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তর অনুভূতিভিত্তিক—অর্থাৎ প্রথম সাংকেতিক স্তরের সব পরাবর্ত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কাজেই কোনো অভ্যাস অনুভূতি বা প্রক্ষোভ আমাদের অজ্ঞাতসারে গঠিত হতে পারে না। নির্জ্ঞান অথবা অবচেতন মনের অস্তিত্ব তাই পাভলভীয় মনস্তত্ত্বে অস্বীকৃত। তবে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—গভীরভাবে সম্মোহিত অবস্থায় (যে অবস্থার কথা সম্মোহিত অবস্থা কেটে গেলে ব্যক্তির মনে থাকে না) নতুন পরাবর্ত গঠিত হতে পারে। এই পরাবর্ত বা অভ্যাস সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন নয়। এই ধরনের পরাবর্ত ব্যক্তির চেতনার বাইরে থেকে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। এইভাবে গড়ে-ওঠা মানসিকতাকে 'অবচেতন' বলা চলে—এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ক্রাসনোগোরস্কি।* কিন্তু ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান বা অবচেতন মন এভাবে গড়ে উঠেছে বলে তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি।

ফ্রয়েডের 'অবদমন' ও 'নির্জ্ঞান'-এর সঙ্গে স্মৃতিবিস্মৃতি সম্পর্কিত কয়েকটি লাইন অন্য খণ্ড থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি: স্মৃতি-বিস্মৃতি দুই-ই জীবনধারণের পক্ষে অতি আবশ্যিক ধর্ম। জীবনের দুঃখ বেদনার ইতিহাস ভুলতে না পারলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ...অনেকের মতে আমরা কিছুই ভুলি না, সময়বিশেষে অনুষঙ্গ সমাবেশে অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা মনে এসে পড়ে। আমরা আসলে বাছাই করে মনে রাখি, বাছাই করে ভুলে যাই। বলা চলে, প্রক্ষোভ উদ্রেককারী ঘটনা মনে রাখার ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে পক্ষপাত প্রভাবিত। ভুলে থাকা ঘটনা, নির্দিষ্ট অনুষঙ্গ প্রভাবিত হয়ে মনে পড়তে পারে, কিন্তু মনে পড়লেই যে সংশ্লিষ্ট অবদমিত, নির্জ্ঞান কোঠায় অবস্থিত 'সাইকিক এনার্জি' নির্গত হয়ে পড়বে এবং রেচকের কাজ করবে এবং ফলে নিউরোটিক রোগ উপসর্গের

---

* It is worth noticing that the new conditioned reflexes could be formed in the hypnotic trance only when there was full amnesia. Then, however, the new reactions did not enter into the general synthetic activity of the brain, but remained sub-conscious. Children gave intensive conditioned reactions, whithout in the least realizing this, whereas actions connected with reflexes formed when the brain was in a sound state were well motivated.
(Krasnogorsky, N. I. : Basic Cortical Mechanism in Children ; Moscow ; 1939, quoted by D. B. Elkonin in Psychology in the Soviet Union, edited by Simon, London, 1967, p 167-68)

উপশম ঘটবে—এই মতে বিশ্বাসী চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। গোঁড়া নির্জ্ঞানবাদীরাও মনের রোগের চিকিৎসায় অকৃপণহস্তে আধুনিক 'ট্রাংকুইলাইজার' ও 'য়্যান্টিডিপ্রেসান্ট' ব্যবহারের নির্দেশ বিতরণ করে চলেছেন। অবশ্য, দেহ মন সমান্তরালবাদের কথা তুলে তাঁরা বলতে পারেন যে মস্তিষ্ককে ওষুধ দিয়ে প্রভাবিত করলে মনও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

সাইকোএ্যানালিসিসের সমর্থকদের মতে নিউরোটিকের অবদমিত প্রক্ষোভ নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে ঝাঁপিতে-পোরা বিষধর কেউটের মত দিনরাত গর্জন করছে, আর নিউরোটিক অনবরত ঝাঁপির ঢাকা সামলাতে ব্যস্ত রয়েছে। এই অনুমান-ভিত্তিক রহস্যঘেরা প্রকল্পের সাহায্য ছাড়াই কি নিউরোটিকের প্রক্ষোভাধিক্যের ব্যাখ্যা চলে না? পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে না পারলে নিউরোটিকের মনে প্রক্ষোভাধিক্য থাকবেই—কোনো 'নির্জ্ঞান' প্রকোষ্ঠের কল্পনা ছাড়াই একথা বলা চলে। প্রক্ষোভ অনেকের মতে মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান, বুদ্ধি, মূল্যবিচারের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। নির্জ্ঞানে কোনো প্রক্ষোভের অবস্থিতি কল্পনা করা যায় না; বোধশক্তি, বুদ্ধি থেকে বিচ্যুত বা সম্পর্কহীন প্রক্ষোভের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না।* ধারণা (intellect) ও প্রক্ষোভ (emotion) দুই-ই মানবচৈতন্যে সমন্বিত। "সব ধারণার মধ্যেই প্রক্ষোভিক উপাদান কিছু কিছু থাকবেই। ধারণা ছাড়া প্রক্ষোভ তৈরী হয় না, আবার প্রক্ষোভ বিহীন ধারণাও থাকতে পারে না। এই হচ্ছে প্রক্ষোভ সম্পর্কে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা।"** প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ বা প্রক্ষোভ পরিবর্তন করতে হলে ধারণারও পরিবর্তন দরকার। কেননা সব প্রক্ষোভই কোনো না কোনো ধারণাভিত্তিক। নিউরোটিকের ধারণায় ভুলভ্রান্তি অথবা ধারণাশক্তির স্বল্পতা থাকতে পারে। সেই ভুলভ্রান্তি বা স্বল্পতা দূরীভূত না হলে, সংশ্লিষ্ট প্রক্ষোভের পরিবর্তন বা দূরীকরণ সম্ভব নয়। যখন ভয়কে অবদমিত করা হয়,

---

* However we believe that the neurotic's emotions remain active not from some inherent and mysterious dynamic of their own, but because the neurotic's real problems remain unsolved and active...there can be no such thing as an emotion which exists in the "Unconscious". Emotions are the conscious response of people to their understanding and value judgements of a fact, or a reality situation as they see it. Hence there can be no such thing as an emotion disembodied from intellectual content, an emotion without understanding. (Furst : Op cit. p 157)

** 'পাভলভ পরিচিতি' প্রথম খণ্ড

অর্থাৎ বহির্বাস্তবের ভয়ের উৎস অথবা পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা না করে ব্যক্তি ভয়কে নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে নির্বাসিত করতে সক্ষম হয়—তখন বুঝতে হবে, সে ভয়ের উৎস বা পরিস্থিতি সম্পর্কে তার আগেকার ধারণা বদলে ফেলেছে। ধারণার পরিবর্তনের ফলেই ভয় দূর হয়েছে।* ফ্রয়েডীয় অবদমনের ক্ষেত্রে ধারণার পরিবর্তন সম্ভব নয়। শৈশবে অবদমন ঘটে; সেই বয়সে ধারণার পরিবর্তনে বড়দের সাহায্য অপরিহার্য। শিশু মাতার প্রতি ভালবাসা (কামেচ্ছা) ও পিতৃবৈরিতার মনোভাব বড়দের জানিয়ে নিজের ধারণা পরিবর্তনে তাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে— এমন কথা শোনা যায় না। ফ্রয়েডও এ ধরনের কথা বলেন নি। প্রক্ষোভ যে ধারণা ছাড়া গঠিত হয় না – বাস্তববাদীদের এই বিশ্বাসও তিনি পোষণ করতেন না। তাঁর অবদমনতত্ত্বও তাই বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণীয় মনে করেন না।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে জৈব উপাদানের প্রভাবকেই ফ্রয়েড প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে সব সময়ে, সব দেশের সব মানুষই বস্তুত একই ধরনের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের অধিকারী। আচরণের ব্যক্তিগত বহিঃপ্রকাশ স্বতন্ত্র হলেও, মানসিকতা মূলত একই উপাদানে গঠিত, মূলত সব মানুষই জন্মসূত্রে পাওয়া আদিম ও প্রাচীন (archaic heritage) সহজাত জৈবপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানত পরিচালিত। জন্মের পর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই পারিবারিক সংস্পর্শে, সভ্যতার চাপে জৈবপ্রবৃত্তির অবদমনের ফলে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ছক তৈরী হয়ে যায়। এদিক দিয়ে, আমরা আগেই বলেছি, শিশুর প্রথম চার বছরের গুরুত্ব অপরিসীম। এই চার বছরের মধ্যে শিশুর জাতিজনিক (phylogenetic) বিকাশের সমগ্র গতিপথটি পরিক্রমার মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ চরিত্র ও মানসিকতাগঠনের পূর্বাভাস নির্দিষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে।** প্রাগৈতিহাসিক

---

* ...If the understanding is changed, the emotion will change when a disturbing emotion such as fear is successfully "repressed", i.e. when the fear is dispelled by internal, psychological manipulations, instead of by the neurotic's tackling the external situation, what actually happens is that the neurotic changes his conception and judgement of the fear producing situation. (Furst : Op cit, p 157)

** Each individual repeats in some abbreviated fashion during childhood the whole course of the development of the human race. (Freud : Introductory Lectures of Psychoanalysis)

নরভুক মানুষের প্রবৃত্তি থেকে সুরু করে পরবর্তী কালের বহুরকমের প্রজাতিক জৈবপ্রবৃত্তি অবদমনের ইতিহাসই ব্যক্তিচরিত্র গঠনের ইতিহাস। যে মৌখিক স্তরের (oral stage) কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেই স্তরটি ফ্রয়েডের মতে স্বগোত্র ভোজনকারী (cannibalistic) মানসিকতার অভিব্যক্তি-স্তর। শিশুর চোষণ ও ভোজনের মধ্যে স্বগোত্রভোজনের প্রয়াস খুঁজে পেয়েছেন ফ্রয়েড। পরবর্তী স্তরে শিশুকে যখন মলমূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ শেখানো হয়, তখন সে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া হিংস্রতা ও উগ্রতা অবদমনের শিক্ষা পায়। পরিণত বয়সে এই দুটি স্থান—মুখ ও মলদ্বারকে কেন্দ্র করে যে কামবিকার (sexual perversion) দেখা দেয়, ফ্রয়েডের মতে, সেই কামবিকার স্বগোত্রভোজন ও হিংস্রতা উগ্রতার প্রতিকল্প পরিতৃপ্তির পথ। ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে শৈশবের প্রাক্-যৌনপর্বের এই দুটি জন্মসূত্রে পাওয়া আদিম প্রবৃত্তির অবদমন-উদ্গমনের (repression and sublimation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পায়ু স্তরকে (anal phase) ফ্রয়েড ধর্ষকামিতার (sadism) সঙ্গে যুক্ত করে বিশেষ অর্থবাহী করে তুলেছেন। এই স্তরের অবদবন উদ্গমন ক্রিয়া সম্পর্কে অনেক মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের বক্তব্যকে নানা দিক থেকে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই স্তরটি সম্পর্কে আলোচনা ফ্রয়েডের চরিত্র-গঠনতত্ত্বকে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করে।

এই 'পায়ু-ধর্ষকামী' স্তর কাটিয়ে উঠতে যাদের বেশী সময় লাগে, তারা ভবিষ্যতে নিয়মানুবর্তী, কৃপণ ও জেদী স্বভাবের অধিকারী হয়। কিভাবে? মলত্যাগ বেশী সময় নেবার অর্থ ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা যৌনতৃপ্তি লাভ। তারা মায়ের অনেক তাগিদ সত্ত্বেও পায়খানা থেকে বেরুতে চায় না, অবাধ্যতা ও জেদ প্রকাশ করে। পরে মলত্যাগজনিত যৌনতৃপ্তির প্রতিকল্প হিসেবে জেদ ও অবাধ্যতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।* কৃপণ হবার কারণ ব্যাখ্যায় ফ্রয়েড বলেছেন যে, এই স্তরে আবদ্ধ শিশু (anal-fixated) মলকে বিশেষ মূল্যবান মনে করে, তাই মলত্যাগ করতে তারা অনিচ্ছুক বা বেশী সময় নিয়ে থাকে। ফ্রয়েড অতিকথা পৌরাণিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার সাহায্যে

---

* As infants, they seem to have been among those who refuse to empty the bowel when placed on the chamber, because they derive an incidental pleasure from the act of defecation. ...From these indications, we infer that the erotogenic significance of the anal zone is intensified in the innate sexual constitution of these persons. (Ibid)

(অবশ্য তাঁর উদ্ভাবিত প্রতীকের ব্যবহার করে) সিদ্ধান্ত করেন যে অর্থ আর জীবদেহ বিনির্গত ক্লেদের (মলমূত্র) সঙ্গে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।* শৈশবে মলত্যাগের মাধ্যমে যৌনানন্দ বড় হয়ে আর তৃপ্তি দিতে পারে না, তাই উদ্‌গতির ফলে মুদ্রা মলের প্রতিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রা অর্জন ও সঞ্চয় এদের কাছে যৌনতৃপ্তির আনন্দের সামিল। ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সর্বরতিবাদে বিশ্বাসীদের পক্ষে গ্রহণীয় হলেও, যুক্তিবাদী অনেকের কাছেই এই ব্যাখ্যা যুক্তিহীন উদ্ভট মনে হবে। মল ও মুদ্রার এই সম্পর্ক নাকি আদিম যুগ থেকে প্রবহমান প্রজাতি-বৈশিষ্ট্য—সহজাত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।**

নিয়মানুবর্তিতার ব্যাখ্যায় আবার অন্য ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মলমূত্র ত্যাগ মানে শরীর থেকে অপরিচ্ছন্ন অবাঞ্ছিত ক্লেদপদার্থ মুক্ত করা—দেহমনকে পরিচ্ছন্ন করা। মলমূত্র ত্যাগে শিশুর বিশেষ আপত্তি, মলমূত্র সে মূল্যবান মনে করে, নিজের দেহের মধ্যে জমিয়ে রাখতে চায়—এই বলে ফ্রয়েড কার্পণ্যের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতার বেলায় ঠিক উল্টো কথা বললেন কি করে? এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি 'সাইকোএ্যানালিসিসের' অন্য একটি সূত্র—প্রতিক্রিয়া-প্রক্রিয়া (reaction formation) প্রয়োগ করেছেন। যে জিনিসের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি, সেই সম্পর্কে বিরাগ সৃষ্টিকে 'প্রতিক্রিয়া-প্রক্রিয়া'র সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। অবাঞ্ছিত ক্লেদমুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তি উদ্‌গতির পর নিয়মানুবর্তিতা—অতিমাত্রায় শৃঙ্খলাবোধের রূপ নিয়েছে।***

---

* In reality, wherever archaic modes of thought predominate or have persisted—in ancient civilizations, in myths, in fairytale and superstition, in unconscious thoughts and dreams and in the neuroses—money comes into the closest relationship with excrement. (Ibid)

** Freud's main point is that this connection is innate as part of the archaic heritage from primitive times. Money and faeces are connected, he maintained, in the racial unconscious, as revealed, in the translation symbols found in dreams and myths. Contact with money serves only to awaken the inborn unconscious archaic connection between the two. (Wells, op cit)

***Freud attempts to establish a connection between orderliness and the anal-sadistic phase temporarily fixated in anal eroticism by means of a "reaction formation" against things that are unclean and intrusive and ought not to be on the body. Sublimated, this becomes general orderliness in petty matters. (Ibid p 148)

ব্যক্তিত্ব-গঠন ও চরিত্র-গঠন সম্পর্কে পাভলভের অভিমত প্রথম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে।* পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে মস্তিষ্কের টাইপ ও পরিবেশের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পাভলভীয় ধারণা গড়ে উঠেছে পাভলভ ও তাঁর উত্তরসূরীদের হাজার হাজার পরীক্ষানিরীক্ষা-লব্ধ উপাত্তকে ভিত্তি করে। সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতির পার্থক্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে পার্থক্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সামাজিক সংগঠন আবার উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বণ্টন-ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। সব দেশের, সব সমাজের সুস্থ শিশু একই ধরনের স্নায়ুসংস্থা ও শেখার ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেও, সুযোগ ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা সকলে সমানভাবে পায় না। সেই কারণে বিভিন্ন দেশে ও সমাজে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। একই সমাজে সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মনের রোগ : ফ্রয়েড ও পাভলভ

মনের রোগ নিয়ে ফ্রয়েড ও পাভলভের ধারণার বৈপরীত্য সম্পর্কে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করা হয়, বোধ হয়, ১৯৫০ সালে মস্কোতে বিজ্ঞান পর্ষদ ও চিকিৎসাবিদ্যা পর্ষদের যুগ্ম উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পাভলভের স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সভায়। বিকফ ও ইভানভ স্মলেন্‌স্কী প্রদত্ত ভাষণে পাভলভের পরীক্ষানিরীক্ষা-ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ও ফ্রয়েডের অনুমানভিত্তিক কাল্পনিক ধারণার পার্থক্য বিশেষ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। এর কিছু আগে ওর্টিস-এর লেখা **'Soviet Psychiatry'** ইংরিজি জানা চিকিৎসক মহলে কিছুটা আলোড়ন এনেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মস্তিষ্ক ও অঙ্গহানির চিকিৎসায় নিযুক্ত ডাক্তাররা পাভলভের মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের প্রকল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবিদ্যা মনের রোগের চিকিৎসায় ফ্রয়েডীয় ভাবধারার প্রাধান্য প্রায় সব দেশেই বজায় ছিল। সোভিয়েত দেশের নামকরা গবেষণা সংস্থাগুলি পরিচালিত গবেষণায় পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না,—১৯৫০ সালের মস্কোর সভায় এই ধরনের সমালোচনা উপস্থাপিত করা হয়।** এরপর থেকে ফ্রয়েডের পরোক্ষ প্রভাব

---

* 'পাভলভ পরিচিতি', প্রথম খণ্ড

** The trend was greatly accelerated after the scientific session, called jointly by the Academy of Sciences in 1950,

থেকে সোভিয়েত মনস্তত্ত্বকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রীতিমত অভিযান শুরু হয়ে যায়।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মনোরোগ চিকিৎসায় ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিটিক তত্ত্ব প্রয়োগের প্রথম কঠোর সমালোচনা বোধ হয় প্রকাশিত হয় নিউইয়র্কে সিটাডেল প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দি নিউরোটিক' নামক পুস্তকে।* এই পুস্তকের লেখক জোসেফ ফার্স্ট বহু বৎসর ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার পর এই পদ্ধতির অসারত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেই কারণে তাঁর মতামতের প্রতি অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর পুস্তকে পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত ও লেনিনের প্রতিফলনতত্ত্বের ভিত্তিতে ফলপ্রসূ মনোরোগবিদ্যা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু পাভলভীয় মনোবিদ্যা বা চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।** এর পর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হ্যারী. কে. ওয়েলস দু-খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকে পাভলভ ও ফ্রয়েড-এর তুলনামূলক বিচার সম্বলিত আলোচনা প্রকাশ করে রুশভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। (Pavlov and Freud : International Publishers, New York, 1960) আমরা এই পুস্তক দুটি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি এবং বহুস্থানে এঁদের পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

ওয়েলস্ মার্কসবাদীর দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ফ্রয়েডীয় ও পাভলভীয় তত্ত্ব বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রয়েড সম্পর্কে তার আলোচনা ফার্স্ট এর মত কঠোর নয়। বিষয়মুখীন আলোচনায় সাধারণত তিক্ততা কম থাকে। তিনি চিকিৎসক নন, দার্শনিক। চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে তিনি বেশী চিন্তা করেছেন;

---

when two main contributions were made by Pavlov's pupils, K. M. Bykov and A. G. Ivanov Smolensky. (Psychology in the Soviet Union : Ed Simon, London, 1957, p 10)

* Joseph B. Furst : The Neurotic, Citadel Press, New York, 1954

** The situation as regards the treatment of neurosis is so bad that not only is there no agreement as to theories but even none as to result : almost no attempts have been made to verify the results in a scientific manner. ...The pre-requisites of a truly scientific basis for psychiatry are already in existence. These, include...reflection theory of knowledge and objective approaches to mental phenomena. (Ibid VIII)

ফলাফল নিয়ে বেশী মাথা ঘামাননি। তবু একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা সাফল্য লাভ করেনি। ফ্রয়েডের তত্ত্ব ও চিকিৎসাপদ্ধতি আলোচনান্তে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন : নিজ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, 'সাইকোঅ্যানালিসিস' বিজ্ঞান বিরোধী এবং এই পদ্ধতির আর কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই।* ফ্রয়েডবাদকে নানা দিক থেকেই অপবিজ্ঞান বলে সপ্রমাণ করা যায় এবং করাও হয়েছে। কিন্তু পাভলভীয় তত্ত্বের মুখোমুখী দাঁড় করালে 'নির্জ্ঞান' তত্ত্বের উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ যত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অন্য কোনো ভাবে ততটা যায় না। অন্যান্য যাঁরা ফ্রয়েডের তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন; তাঁদের মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তের জ্ঞান ছিল সীমিত, কাজেই তাঁদের সমালোচনায় গুরুত্ব আরোপ করা যায় না কিন্তু পাভলভীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে ফ্রয়েডের মনোরোগতত্ত্ব ও চিকিৎসাপদ্ধতির দৈন্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে।** কেননা, শারীরবৃত্তকে ও মস্তিষ্কের এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে যে মননক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্ভব—পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনোরোগবিদ্যার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ঘটলেই সেটা বোঝা যায়। পাভলভীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে ফ্রয়েডের সঠিক ও সম্যক পর্যালোচনা ও যুক্তিসম্মত সমালোচনা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না কোনো ঘটনার বা মানসিক বিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক ব্যাখ্যা জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ সাধারণের অজ্ঞতার ও রহস্যময়তার ও অলৌকিকতার

---

* There can be little questions that in essence, Freudian psychoanalysis with its limitless psychotherapeutic variations has by and large dismally failed its practical mass test in the United States as an effective cure of functional illness. Freud's 'Unconcious', evil wish, demon theory of neurosis has little in common with science, medicine or psychiatry, that it is in fact anti-scientific and constitutes essentially a road block in the path of further development. (Wells, op cit, p 218)

** The confrontation by Pavlov, however, has the signal advantage of lying bare the prime historical condition for the genesis of such psychical-force theories—namely the absence of psychology and pathophysiology of the cerebral hemispheres as a whole. By at least laying a basis for filling the gap in cerebral physiology, the science of higher nervous activity removes the reason for existence of any purely mental approach. (Ibid, pp 218-219)

প্রতি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে-কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা যাক না কেন—সাধারণের পক্ষে তা মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক। জ্যোতির্শাস্ত্র (astrology) ও কিমিয়াবিদ্যার (alchemy) একসময় ইয়োরোপে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়েছে। গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানানুযায়ী জাতকের ভাগ্যফল নির্ধারণ আজও অনেকের কাছে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বলে মনে হয়, যদিও কিমিয়াবিদ্যা রসায়নবিদ্যার কাছে পরাভব স্বীকার করেছে। মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সঠিক বিজ্ঞান আজও গড়ে ওঠেনি। মনে হয় এ ধরনের বিজ্ঞান গড়ে ওঠবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সমষ্টির গড় আয়ু আজ বলা যায়, পরিকল্পনার সাহায্যে আর্থিক সামাজিক উন্নয়নের একটা ভবিষ্যৎ নির্দেশ দেওয়া যায়, কিন্তু ব্যক্তির অনেক কিছুই বলা যায় না ; কাজেই অদৃষ্টবাদ এখনও টিকে থাকবে। মনের রোগের মধ্যযুগের ভূতে-পাওয়া ও ধর্মীয় তত্ত্বকে নস্যাৎ না করে ফ্রয়েড বিজ্ঞানের কিছু কথা ও নিজস্ব পরিভাষা দিয়ে সেই ভূতুড়ে ধর্মভিত্তিতত্ত্বকে বিংশতকে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন—কারণ, মানুষের স্নায়ুতন্ত্র—যা মননক্রিয়ার অধঃস্তর—সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। ফ্রয়েড নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছেন।* পাভলভ যখন মনোরোগ সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের আবহাওয়া দূর করে শারীরবৃত্তিক বিকারতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত, ফ্রয়েড তখন মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মার্জিত সংস্করণ সংরক্ষণে উৎসাহী। আদিম ও মধ্যযুগের ভূতপ্রেত বাইরে থেকে এসে মানুষের আত্মাকে অধিকার করত আর ফ্রয়েডের ভূতপ্রেত ব্যক্তির জ্ঞান থেকে এসে তার চৈতন্যকে প্রভাবিত করছে—এই মাত্র তফাৎ।

ওয়েলস্ মন্তব্য করেছেন যে এতদিন পরে ফ্রয়েডের প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নমুখী তার কারণ কিন্তু এই নয় যে,—পাভলভীয় বা অন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রয়েডবাদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। ফ্রয়েডীয় চিকিৎসকদের অজস্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা, অসংখ্য মনোবিশ্লেষণের কাহিনী প্রকাশ সত্ত্বেও রোগ নিরাময়ে এই চিকিৎসার ফলপ্রসূ কোনো ভূমিকা নেই—এই কারণে ফ্রয়েডবাদ পিছু হঠছে।** এ কথাগুলো ওয়েলস লিখেছেন প্রায় ১৬।১৭ বছর আগে। গত

---

* All that would have been required was to replace the terminology of those dark and superstitous times by the scientific use of to day. (Freud : Collected Papers Vol. 1, p 20)

** To day, at long last, the Freudian psychoanalytic approach to functional mental illness is facing a rapidly rising

পনেরো বছরে মনের রোগের চিকিৎসায় ও আচরণ পরিবর্তনে ব্যবহারবাদী চিকিৎসা—(স্কিনারের অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং)—কার্যকর ·পরাবর্ত গঠন পদ্ধতিতে চিকিৎসা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কয়েক বছর হলো, পাভলভীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে অল্পসংখ্যক মনোরোগবিদ্ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। জৈব-রসায়ন ও ভেষজ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে মনের রোগের বহু ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে; মনের রোগে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক পরিবর্তনের সন্ধান পাওয়া গেছে; এর ফলে বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের মননক্রিয়ার অধঃস্তর সম্পর্কিত ধারণা ঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মনের সব সূক্ষ্ম ও জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, এ দাবী করার এখনও সময় আসেনি। মনের রোগের সব সমস্যার সমাধান পাভলভীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে সম্ভব—এত কথাও পাভলভ-অনুরাগীরা মনে করেন না। তবে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে অনায়াসে বলা চলে যে মননক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও মনোরোগচিকিৎসায় ও গবেষণায় পাভলভ বিজ্ঞানঅনুমোদিত পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং একথা আজ বলা চলে যে,—আত্মা, অতীন্দ্রিয়বাদ, রহস্যময়তা, অধিমনোবিদ্যা জাতীয় অনুমানভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্য ছাড়াই সবরকমের মননক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও জটিলতম মনের অসুখের নিরাময় ও নিরসন অদূরভবিষ্যতেই সম্ভব হবে। অজ্ঞতার দরুণই আজকের সমাজে দৈবচিকিৎসা, জাদুচিকিৎসা, মাদুলী, কবচ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির প্রভাব প্রতিপত্তি। মস্তিষ্কবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব লোপ পেতে বাধ্য। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত অত দ্রুততালে না হলেও মনোরোগবিদ্যারও অগ্রগতি ঘটছে, অজ্ঞতা অপসৃত হচ্ছে।*

---

challenge. ...The stubborn fact that psycho-analysis inspite of its claims has been totally incapable of checking, much less reversing, the fantastically high incidence of functional mental illness in its host nation, the United States. A search is now in progress for other, for medical means of treating and preventing neurotic and psychotic disorder. (Ibid p 217)

* The science of higher nervous activity, Physiology and psychopathology of the cerebral hemispheres is already sufficiently developed to say the ghost of any and all psychic-force theories of functional mental illness. The latter cannot much longer cling to their former priveleged position. Ignorance was their precondition, and the ignorance is giving way to the relentless on-march of science. (Ibid, pp 219-220)

ফ্রয়েডীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে অবাধ অনুষঙ্গের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। এই অবাধ অনুষঙ্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছেন ফাষ্ট তাঁর পূর্ব-উল্লিখিত 'দি নিউরোটিক' পুস্তকে। এখানে তাঁর মন্তব্যের কিছুটা তুলে ধরা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন, এমন অনেকেও অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগে চিকিৎসা করেন। এ্যাডলার, ইয়ুং হর্নিও এই পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। আমরা ফ্রয়েডীয় অনুষঙ্গের কথাই শুধু বলব। ধ্রুপদী অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে রোগীকে অবাধে মনের চিন্তা বলে যাবার নির্দেশ দিয়ে চিকিৎসক রোগীর দৃষ্টির আড়ালে, সাধারণত পেছনে অবস্থান করেন। যতই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য মনে হবে না কেন, রোগীকে সব কথাই বলতে হবে, কোনো কিছু সে গোপন করবে না—এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়। ফাষ্ট মনে করেন যে চিন্তা সব সময়েই পূর্বাপর সম্পর্কিত না-ও হতে পারে। পূর্বাপর সম্পর্কশূন্য আকস্মিক চিন্তা বা মননক্রিয়াও যে থাকতে পারে—এ কথা ফ্রয়েড স্বীকার করেন না। ফ্রয়েডের মতে মানুষ যুক্তিহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে, কিন্তু তার প্রতিটি কাজ ও চিন্তা নির্জ্ঞান-প্রেষণা পরিচালিত অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিষ্টিরিয়া থেকে শুরু করে স্কিজোফ্রেনিয়া পর্যন্ত সব মানসিক রোগ এবং অন্ত্রক্ষত, রক্তচাপবৃদ্ধি ইত্যাদি সব উপসর্গ নির্জ্ঞান ইচ্ছার ফল বা বহিপ্র্রকাশ। কারখানায়, রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনায় আহত হয় যারা, তাদেরও নাকি আহত হবার ইচ্ছে থাকে বলেই তারা দুর্ঘটনা ঘটায়। এই ধরনের তত্ত্বকথার মারাত্মক দিকটির কথা না ভেবে ফ্রয়েডবাদীরা সরল বিশ্বাসে এই সব তত্ত্ব প্রচার করে চলেছেন। অতিরিক্ত শ্রম, কারখানার অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ, দ্রুত কাজ করার জন্যে তাগাদা, আলোর অভাব, যন্ত্রপাতির জীর্ণদশা বা ত্রুটি—দুর্ঘটনার ব্যাপারে এ-সবের নাকি কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুবাদীরা নিমিত্তবাদে বিশ্বাসী, কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করেন; কিন্তু আকস্মিকতা বা আপতনকে অস্বীকার করেন না। আকস্মিকতা বা আপতনেরও কারণ আছে। যখন দুটি ভিন্ন ঘটনার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধে তখন যে প্রক্রিয়া ঘটে তাকেই আপতন বলা হয়।* মানুষের, বিশেষ করে,

* An accidental occurence is not one that has no causes ; rather the accident to the result of what happens when

নিউরোটিকের মনে পরস্পর-বিরোধী চিন্তা থাকে, তার ফলে আকস্মিক কোনো চিন্তা বা কাজ করা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। কাজ করতে ভুলে যাওয়া বা কারুর নাম মনে আনতে না পারা—তার মধ্যে কারণ সব সময়েই ইচ্ছাকৃত বা ঐ কাজ বা মানুষটিকে আমাদের পছন্দ হচ্ছে না—এই সিদ্ধান্তে আসার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।* অন্য কোনো বেশী দরকারী বিষয়ের দিকে মনোনিবেশকালে আমরা সাময়িকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত কোনো কাজের কথা ভুলে যেতে পারি।**

অবাধ অনুষঙ্গের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য এই রকম: চিকিৎসাধীন রোগী মনে করতে বাধ্য হয় যে তার প্রতিটি কাজের চিন্তার জন্য যে সে-ই শুধু দায়ী, তার জীবনে যা ঘটেছে বা ঘটছে—সব কিছুর দায়িত্ব বুঝি তার; তাকে জানানো হয় না যে বহির্বাস্তবের, সামাজিক পরিবেশের শক্তি তার জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে; তার নির্জ্ঞানস্থিত অবদমিত কামেচ্ছা ও অন্যান্য সহজপ্রবৃত্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে সে ক্রমশ নিজেকে আরো বেশী অপরাধী ও অসহায় মনে করতে থাকে। নির্জ্ঞান শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই বলেই তার মনে হয়। নিজেই নিজের দুর্ভাগ্য ও অসুস্থতা ডেকে এনেছে মনে হবার ফলে তার আত্মগ্লানি বৃদ্ধি পায়।***

সব কথা বা চিন্তারই গুরুত্ব আছে—এই ধারণায় পরিচালিত হয়ে চিকিৎসক কোন ব্যাপারে বেশী মনঃসংযোগ করবেন বুঝতে পারেন না—ফলে অনেক ক্ষেত্রে অযথা সময় নষ্ট হয়। ফলে এই চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী হতে

---

one line of necessity or development meets and conflicts with another line of development. ....It is the problem of chance versus causality and it has been troubling the philosophy for centuries. (Furst, The Neurotic, p 216)

* Thus if a neurotic fails to perform an act, it does not necessarily follow, that his forgetting was strictly determined by an unconscious sequence aimed to produce the result. Nor does it necessarily follow that he wished to forget. (Ibid)

** ...but the forgetting may also have arisen from the necessity of attending to other and more important circumstances, which arose and intruded themselves into his life. (Ibid, p 214)

***I have often heard Freudian-treated patients express a deep feeling of helplessness in the face of their unconscious. (Ibid p 215)

বাধ্য।* এই কারণে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসার নানারকমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও আজ যুক্তরাষ্ট্রে স্কিনারের অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং-এর প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফাষ্ট´-এর মতে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি বুদ্ধি ও যুক্তিবিরোধী প্রক্রিয়া। সমস্যার যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ ও আলোকপাতের কোনো চেষ্টা এই পদ্ধতিতে নেই।**

তা বলে, ফাষ্ট´ মনে করেন না যে মনের চিকিৎসায় রোগীর রোগ ইতিহাস বিবৃতির কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক সময় রোগী চিকিৎসার প্রথম দিকে, প্রয়োজনীয় কথা অপ্রয়োজনীয় মনে করে ডাক্তারের কাছে খুলে বলা আবশ্যক মনে করে না। তাই তাকে ছোট-বড়, দরকারী-অদরকারী, যুক্তিহীন উদ্ভট—সব চিন্তা ও কথা অবাধে বলে যাবার নির্দেশের মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। রোগী অনেক সময় যৌন-ইতিহাস বা ঐধরনের লজ্জাজনক কাহিনী প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত বোধ করতে পারে ; সেই ব্যাপারকে সেন্সরের বাধা না ভেবে, সোজাসুজি অথবা পরোক্ষভাবে তাকে প্রশ্ন করলে অনেক সহজেই ইতিহাস জানা যেতে পারে।

ফাষ্ট´-এর আর একটি বক্তব্যও প্রনিধানযোগ্য। কোচের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়ে আত্মকথা বলতে গিয়ে রোগী অনেক সময় নিজের কথা ভুলে গিয়ে অন্যদিকে তার মনকে চালিত করতে পারে। বাস্তববিমুখ অনেক অলীক কল্পনা তার মনে জাগতে পারে ; এবং ডাক্তারের অফিসের বাইরেও সেই অলীককল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে সে আরো বাস্তববিমুখ হয়ে উঠতে পারে।

ইডিপাস ও ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার ইঙ্গিত বা উল্লেখ অনেক সময় রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্ক বিষাক্ত করে তোলে। ফ্রয়েডীয় চিকিৎসক অবশ্য এই বৈরিতাকে রোগীর নির্জ্ঞান মনের বাধা মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু এই কারণে বহু রোগী চিকিৎসা বন্ধ করে অন্য ধরনের চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

ফাষ্ট´ সব শেষে মন্তব্য করেছেন যে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি বলে কিছু থাকতে

---

* Thus the use of free association technique is enormously time-wasting. (Ibid, pp 215-17)

** ...free-association is an expression of the anti-intellectual currents which are embodied so fully in psycho-analysis. The method of free-association is the very antithesis of a rationally controlled and scientific discussion of problems. (Ibid).

পারে না। এই পদ্ধতি মনের প্রকোষ্ঠভিত্তিক কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নির্জ্ঞানতত্ত্বই অসার ও অবাস্তব, সুতরাং অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিও অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয়।*

নয়া ফ্রয়েডবাদ : হর্নি, ফ্রম ও অন্যান্য

নয়া ফ্রয়েডবাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ক্যারেন হর্নি ও এরিক ফ্রমের নাম সর্বজনবিদিত। এ্যাডলার ও ইয়ুং ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিবাদে সাইকো-এ্যানালিষ্ট আন্দোলন ছেড়ে নিজ নিজ তত্ত্বনির্ভর মনোবিদ্যার পত্তন করেন। তাঁদের প্রভাব—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এখন অন্তত চিকিৎসাক্ষেত্রে খুবই সীমিত—নেই বললেই চলে। হর্নি-অনুগামী বেশ কিছু সমীক্ষক যুক্ত-রাষ্ট্রে বিদ্যমান। ফ্রম মনোরোগের এলাকার বাইরে বহু বিষয়ে,- বিশেষ করে সমাজবিদ্যা ও রাজনীতির্তে অভিমত প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তার পাঠক সব দেশেই আছে, প্রগতিবাদী বলে অভিহিত বহু ব্যক্তি ফ্রমের অভিমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমরা প্রথমে হর্নি ও পরে ফ্রমের অভিমত নিয়ে আলোচনা করছি।

হর্নি জার্মানীতে জন্মেছিলেন (১৮৯৫), কিন্তু ১৯৩২ থেকে নিউ ইয়র্কে বসবাস ও চিকিৎসা শুরু করেন। গোড়ার দিকে তিনি এ্যাড্লার ও ইয়ুং এর মত গোঁড়া ফ্রয়েডবাদী ছিলেন। ফ্রয়েডের মতবাদের বিরূপ সমালোচনা প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর The Neurotic Personality of Our Times নামক পুস্তকে (১৯৩৭)। এর পর যথাক্রমে প্রকাশিত হয়: New Ways in Psychoanalysis (1939), 'Self Analysis' (1942) ; Our Inner Conflicts (1945) এবং Neurosis and Human Growth (1950)। তাঁর ফ্রয়েড বিরোধিতার দরুণ এ্যাডলার ইয়ুং এর মত ফ্রয়েডের ধ্রুপদী সাইকো-এ্যানালিটিক সোসাইটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নতুন একটি উপদল গঠন করেন। তিনিই দলের মধ্যে প্রথম ফ্রয়েডের সহজাত প্রবৃত্তি তত্ত্বকে সরাসরি আক্রমণ করেন ও পরিবেশের ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করেন। তিনি নারী হবার দরুণই বোধ হয় ফ্রয়েডের নারী মনস্তত্ত্ব ও

* The unnatural, unhelpful and downright inhuman conduct of the psycho-analysis free-association technique appears bound to create resentment and hostility in many patients. (Ibid)

পুরুষপ্রাধান্য-তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। জার্মানীতে থাকতে তিনি সেখানকার রোগীদের উপসর্গ ও মানসিকতার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আমেরিকায় ঠিক সেরূপ দেখলেন না।* দুদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির পার্থক্যের প্রভাবকে স্বীকার করে না নিলে এই দুই ভিন্ন রূপের ব্যাখ্যা চলে না। নারী মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন যে নারী পুরুষের মানসিকতার পার্থক্য বিচারে ফ্রয়েড সমাজ সংস্কৃতির প্রভাবকে উপেক্ষা করে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।** ক্রমশ ফ্রয়েডের তত্ত্বের মৌলিক সবকিছুকেই তিনি পরবর্তীকালে অস্বীকার করেন। একবার ফ্রয়েডের মৃত্যুরতিবাদ ও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পূর্ব-পুরুষের মানসিকতার প্রভাবকে স্বীকার করে নিলে মননক্রিয়া সম্পর্কে সাইকোএ্যানালিটিক তত্ত্বের সব কিছুকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।*** পনেরো বছরের বেশী ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার ফলে ফ্রয়েডের ভ্রান্তি ও গোঁড়ামি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের ভিত্তিভূমির উপাত্ত যদি আলাদা-আলাদাভাবে দেখা যায় তবেই তাঁর তত্ত্বের অসারত্ব ধরা পড়ে।

হর্নি ফ্রয়েডের ভ্রান্তি ও গোঁড়ামির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

---

* When I came to the States in 1932, I saw that the attitudes and neuroses of persons in this country differed in many ways from those I had observed in European countries, and only the differences in civilization could account for it. (Horney : Our Inner Conflicts, p 12)

** Freud's postulates in regard to feminine psychology set me thinking about the role of cultural factors. Their influence on our ideas of what constitues masculinity or femininity was, obvious, and it became just as obvious to me that Freud had arrived at some erroneous conclusions because he failed to take these into account. (Horney)

***The system of theories which Freud has gradually developed is so inconsistent that when one is once entrenched in them it is difficult to make observations unbiased by his way of thinking. It is only through recognizing the debatable premises on which this system is built that one acquires a clearer vision as to the sources of error contained in the individual theories. (Horney : New Ways in Psycho-analysis, p 11-12)

নিঃসন্দেহে, ইডিপাস-ইলেকট্রা গূঢ়ৈষা সর্বরতিবাদের প্রভাব কিছুটা খর্ব করেছেন ; কিন্তু তা বলে ফ্রয়েডবাদ খণ্ডন করেন নি—খণ্ডন করার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না ; সমকালীন সমাজে প্রচলিত ধারণার স্রোতকে বর্জন করে ফ্রয়েডবাদ যাতে অন্ধ-গলিপথে প্রবেশ করে পথ না হারায়, বা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত না হয়—এই উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রয়েডবাদের সংস্কারসাধন করতে চেয়েছিলেন।* তাঁর মতে সহজাত প্রবৃত্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত সাইকোঅ্যানালিটিক পদ্ধতি দ্বারাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মননক্রিয়ার স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব। তিনি ফ্রয়েডবাদের নির্জ্ঞান প্রেষণাকে অস্বীকার করেননি ; যদিও লিবিডোতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। মৃত্যুরতিবাদ খণ্ডন করে তিনি তার পরিবর্তে এই মত স্থাপনের চেষ্টা করেছেন যে মানুষ নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তি চায়, তার মানসিকতা জৈব ও সামাজিক প্রবণতার সংমিশ্রণে গঠিত হয়।** এই জন্মদত্ত ও সমাজদত্ত প্রবণতার কোনটি বেশি শক্তিশালী, এই শক্তির তারতম্য ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি কোনো নির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেননি। তাঁর তত্ত্বে যুক্তিবাদী প্রেষণা, অথবা শর্তাধীন পরা-বর্তের কোনো উল্লেখ নেই। মানুষ মূলত প্রক্ষোভতাড়িত জীব এবং তার মনে প্রধানত প্রতিশোধমূলক ভীতির (retaliation fear) অবস্থান।*** ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা পদ্ধতিকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন বা পুনরুজ্জীবন করেছেন বলা যেতে পারে।

সব স্কুলের সাইকোঅ্যানালিসিস নির্জ্ঞান শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। সে শক্তির সবটাই জন্মদত্ত, অথবা আংশিকভাবে পরিবেশ থেকে অর্জিত—এই মতবিরোধ বা বৈষম্য ফ্রয়েডবাদের মৌলিক তত্ত্বকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করে না। কিছুটা পরিশুদ্ধ বা পরিমার্জিত করে মাত্র। মানবপ্রকৃতি ও আচরণ প্রক্ষোভতাড়িত, না সহজাত প্রবৃত্তি নির্ধারিত—এই বিতর্কে অংশগ্রহণ না করেও বলা চলে যে

---

* It is easy enough to modify, but it takes geniuses to be the first to visualize the possibilities. ...My main gratitude goes to Freud because he has provided us with the foundation and tools to work with. (Horney : The Neurotic Personality of Our Times p XII)

** Man is ruled not by the pleasure principle alone but by two guiding principles : safety and satisfaction. (Horney : New Ways in Psycho-analysis, p 173)

***How far the retaliation fear is a general characteristic ingrained in human nature, how far it arises from primitive experiences of sin and punishment, how far it pre-supposes a drive for personal revenge ; I leave as an open question. (Ibid, p 71)

ফ্রয়েডবাদের মত হর্নির প্রকল্প, বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অযৌক্তিক এবং আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়। হর্নির নিরাপত্তা ও পরিতৃপ্তিমূলক প্রক্ষোভ দুটি, তিনি বলেন, পরস্পরবিরোধী। পরিতৃপ্তি পেতে গেলে নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকবেই; এদের একের অবদমন না ঘটলে অপরের বিকাশ সম্ভাবনা থাকতে পারে না। একের বিকাশের জন্য স্বাভাবিকভাবে অপরটি অবদমিত হয়। এইভাবে তিনি ইদ্-ইগো-সুপার ইগোর সাহায্য ছাড়াই অবদমনের ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি সংশ্লিষ্ট সামাজিক পরিবেশের বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেন নি; ক্ষমতা ও প্রতিযোগিতাভিত্তিক সামাজিক শক্তির উল্লেখ করেছেন মাত্র। সোপেনহাওয়ার ও এ্যাডলার এ-সম্পর্কে প্রায় ঐ একই কথা তাঁর আগেই বলে গেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের মনোরোগের উৎপাদক উপাদান সম্বন্ধে তিনি নীরব। প্রধান গুরুত্ব প্রদান করেছেন আন্তরমানসিক শক্তির উপর। তাঁর শেষ বইটিতে (Neurosis and Human Growth) সমাজের বিষয়গত বাস্তব পরিবেশ ও সামাজিক সম্পর্কের কোনো উল্লেখ নেই।

এরিক ফ্রম, কারেন হর্নির মত জার্মানীতে জন্ম ও শিক্ষালাভ করেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে এসে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনিও জাতিজনিক (phylogenetic) স্মৃতি ও মনের প্রকোষ্ঠভিত্তিক সংগঠনের পরিবর্তে সমাজ ও সংস্কৃতির উপাদানের প্রভাবকে বড় করে দেখাতে চান। তবে হর্নির মত সমাজের উল্লেখ করে বা বিমূর্ত সংস্কৃতির কথা বলে তিনি থেমে থাকেননি। তাঁর লেখায় অর্থনীতি সমাজবিদ্যা রাজনীতি ও ভাষাদর্শগত আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। এই আলোচনায় তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের অবতারণা করে ফ্রয়েডবাদকে একেবারে নতুন সাজে সজ্জিত করার চেষ্টা করেছেন। মার্কসবাদ দিয়ে ফ্রয়েডবাদ সংস্কার করার এই প্রয়াসের জন্য প্রগতিবাদী মহলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন ফ্রম। 'Escape From Freedom' ও 'The Sane Society' এরিক ফ্রমের দুইটি বহুপঠিত পুস্তক।

ফ্রমই প্রথম ফ্রয়েডবাদী মনস্তাত্ত্বিক যিনি মানসিকতা গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা স্বীকার করলেন। মানব প্রকৃতি, মানুষের আবেগ ও আকুতি, তার ভয় ও ভাবনা, তার হর্ষ ও বেদনা,—এ সবই তার সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত। তিনি আরও বললেন: সমাজ সম্পর্কে ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্যদের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। সহজ প্রবৃত্তি ও সভ্যতা কর্তৃক প্রবৃত্তির অবদমনকে ভিত্তি করে মনস্তত্ত্ব গঠনের প্রয়াস অত্যন্ত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। সমাজের গঠনাত্মক ভূমিকার দিকে ফ্রয়েডের নজর যায়নি, কিন্তু শুধু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও দমনাত্মক ভূমিকার দিকে নজর দিয়েছেন। ফ্রম তাঁর সমকালীন মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের মানবচরিত্রের সঙ্গে অনেক পার্থক্য আবিষ্কার

করলেন। এই পার্থক্যের কারণ নিহিত রয়েছে উনিশ শতকের ধনতান্ত্রিক সমাজ ও বিশশতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর একচ্ছত্র ধনতান্ত্রিক সমাজের সংগঠনের ও অন্যান্য পার্থক্যের মধ্যে।*

উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধ (ব্যক্তিসমাজ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি নির্ণায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ) গড়ে উঠে এবং ব্যক্তিচরিত্র নির্ধারিত হয়। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কয়েকজন শোষক ও অগণিত শোষিতের অস্তিত্ব ছিল। জনসাধারণ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলেও সমাজে তাদের নির্দিষ্ট মূর্ত ভূমিকা ছিল, আর্থিক প্রয়োজন মানবিক প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি, আন্তর্মানবিক সম্পর্কের মধ্যে শোষণ থাকলেও মমত্ববোধ, দরদ ও সহানুভূতির অভাব ছিল না। এক কথায় বলা চলে যে ব্যক্তি বস্তু এবং অন্য ব্যক্তি থেকে আজকের মত পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। প্রকৃতির সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, গোষ্ঠী ও পরিবারের সঙ্গে তার সংযোগ পুরোপুরি বিনষ্ট হয়নি। আদিম সমাজের প্রাথমিক বন্ধনের কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে।** ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি প্রকৃতি, গোষ্ঠী ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং যন্ত্র-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের যুগে ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্যক্তিমানসিকতায় আমরা তার প্রতিফলন দেখছি ও সমাজব্যক্তি বৈরিতায় এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বে সেই মানসিকতা অভিব্যক্ত হচ্ছে।

ব্যক্তি এ-যুগে নিঃসঙ্গ ও বিযুক্ত। ধনতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে মানুষ নিজেকে অনেক বেশী মুক্ত ও স্বতন্ত্র মনে করেছে; ব্যক্তি-সমতা স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু নিরাপত্তার অভাব, শক্তিহীনতা, সন্দেহ, উৎকণ্ঠা ও নিঃসঙ্গতাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করেছে। অর্থ ও পণ্যবাজার মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে— যার ভয়ে ব্যক্তিমানুষ সতত উদ্বিগ্ন। সকলেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী, অথবা সে জানে না ঠিক কে তার শত্রু।*** ফ্রম আরো অনেক কথা বলেছেন যা

---

* Why is the character structure of man in monopolistic capitalism different from that in the nineteenth century ? (Fromm : Escape From Freedom, New York, 1941)

** "Man was still related to the world by primary ties." (Primary ties are said to be those natural and social connections that exist in primitive society, pre-capitalist history, and early childhood)...before the process of individualization has resulted in complete emergence of individual. (Ibid)

***By losing his fixed place in a closed world, man loses the

যে-কোনো প্রগতিবাদী চিন্তাশীল মানুষকে আকৃষ্ট করবে। যেমন : ব্যক্তি এ-যুগে স্বাধীন—মানে, অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন; এ স্বাধীনতা নেতিবাচক—এর অর্থ অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা ও সংযুক্তির অভাব, এর অর্থ বিযুক্তি; আর্থিক লাভকে জীবনের পরম সাফল্য ও চরম চরিতার্থতা মনে করে এ যুগের মানুষ; নিজের সুখ স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য যন্ত্রসভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এখন ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে যে সে বিরাট যন্ত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র চাকার ক্ষুদ্রতম দাঁতে পরিণত হয়েছে; বিত্তবান পূজিত ও সম্মানিত, বিত্তহীন নিগৃহীত, কিন্তু সকলেরই চাকার সঙ্গে ঘোরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।* তার নঙর্থক মুক্তি তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি, দিয়েছে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও সন্দেহ।

প্রথম শুনলে মনে হবে ফ্রমের কথাগুলো বুঝি সবই সঠিক ও তিনি বুঝি মার্কসবাদ প্রচারে আসরে নেমেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে যে, তিনি শুধু ফ্রয়েডবাদ সংস্কারে ব্রতী নন; মার্কসবাদকেও নিজের মনোমত করে সংস্কার করতে চান। ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি বিত্তহীন শ্রমিকদের ও বিত্তবান মালিকদের ওপর আরোপ করে দেখাতে চান যে ধনতন্ত্রে দুই বিরোধী শ্রেণীর মানসিকতায় কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চায়, নিঃসঙ্গতা দূর করতে চায়, একথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু একথাও বলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীও মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মতই বিচ্ছিন্নতা ও উৎকণ্ঠাপীড়িত। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে, যে-কোনো ঐতিহাসিককালে, সেই কালের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর চিন্তাধারা, মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্য সব শ্রেণী প্রভাবিত হতে বাধ্য। আরো বলেছেন, উনিশের শতকে তবু ব্যক্তির সদর্থক ও নঙর্থক

---

answer to the meaning of his life, the result is that doubt has befallen him concerning himself and the aim of life. He is threatened by powerful supra-personal forces, capital and the market. His relationship to his fellow men, with everyone a potential competitor, has became hostile and estranged; he is free—that is, he is alone, isolated, threatend from all sides. (Ibid)

* In capitalism, economic activity, success, material gains, become ends in themselves...Man became a cog in the vast machine—an important one if he had much capital, insignificant one if had none—but always a cog to serve a purpose outside himself. (Ibid)

স্বাধীনতার মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য বজায় ছিল, কিন্তু বিশের শতকে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের উন্মেষের পর্বে সেই ভারসাম্য আর বজায় নেই। কাফকার উপন্যাসে ফ্রমের বিশ্লেষণের অনুরণন শোনা যায়।* পুঁজিবাদের প্রথম পর্বের মালিক শ্রমিক সম্পর্ক একচ্ছত্রপর্বে পরিবর্তিত। মালিক বা শোষক এখন বিমূর্ত ও অদৃশ্য। বিরাট বিরাট কারখানায়, শ্রমিকরা ইউনিয়নের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ, কিন্তু সেখানেও সে অসহায় ও শক্তিহীন; প্রতিষ্ঠানের চাকার একটি ছোট দাঁতে পরিণত। ট্রেড ইউনিয়নের কর্তাও একজন শ্রমিকের কাছে অদৃশ্য ও বিমূর্ত। পণ্যের বাজারে পর স্বাধীনতা থেকেও সে পরাধীন—বিজ্ঞাপনের অভিভাবনে সম্মোহিত ব্যক্তির মত তার আচরণ। তার পছন্দ অপছন্দ গণমাধ্যম নির্ধারিত। এখানেও সে যন্ত্রের চাকার মতই নগণ্য ও শক্তিহীন। শ্রমিক হিসাবে তার স্বকীয় উদ্যোগের কোন মূল্য নেই, ক্রেতা হিসাবেও তেমনি তার স্বকীয় উদ্যোগ ও পণ্য নির্বাচন অর্থহীন। সে একচ্ছত্র পুঁজি ও একচ্ছত্র প্রেসের ক্রীতদাস।

ফ্রমের মতে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ইতিবাচক দিকও আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচালিত উৎপাদনের প্রাচুর্য দুঃখ কষ্ট দূর করে নতুন সমাজে মানবিকতার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম। নেতিবাচক স্বাধীনতা ব্যক্তি মানুষকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে; সমাজতন্ত্রে এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ ইতিবাচক মুক্তির স্বাদ পেতে পারে। এ অবধি ফ্রমের বক্তব্যের মধ্যে যে-সব অসঙ্গতি ও সূক্ষ্ম মার্কসবাদ বিরোধিতা আজ তা পাঠকের কাছে খুব বেশী স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কিভাবে সমাজতন্ত্রের পত্তন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্রম যে পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন—তা পড়লে ফ্রমের উদ্দেশ্য বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। বেশ বোঝা যায় যে, তিনি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার করেও এই পুঁজিবাদকেই জীইয়ে রাখতে চান, পুঁজিবাদের সংস্কার চান, যেমন তিনি সংস্কার চান ফ্রয়েডবাদের। ফ্রমের আর একটি বক্তব্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তিনি ফ্রয়েডবাদ দিয়ে মার্কসবাদকে শোধন করতে চান।** তিনি

---

* The man in a plant which employs thousands of workers, is in a different position. The boss has become an abstract figure—he never sees him; the management is an anonymous power with which he deals indirectly and toward which he as an individual is insignificant. (Ibid)

** Marx had underestimated the complexity of human passions He did not recognize the irrational forces in man which make him afraid of freedom, and which begets his lust for power and his destructiveness. (Ibid)

সাইকোএ্যানালিসিসের সাহায্যে ব্যক্তি মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করে সমাজতন্ত্র আনতে চান।

শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতা এই পুঁজিবাদী সমাজে বিষাক্ত ও স্বার্থপরতাদুষ্ট। মার্কস, ফ্রমের মতে, মানবচরিত্র অধ্যয়নে ভুল করেছেন। মানুষকে যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব ভেবে তিনি 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' লিখেছিলেন। তিনি ফ্রয়েডের আবিষ্কার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে এ ভুল করতেন না। মানুষ আসলে যুক্তিহীন, নির্জ্ঞানপ্রেষিত প্রাণী। এই সত্য জানা থাকলে তিনি উৎপাদনের উপাদান ও যন্ত্রের সামাজিকীকরণকে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে গণ্য করতেন না ; এবং শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের অগ্রদূত বা প্রথম সারির সৈনিক ভাবতেন না।* মানুষ মাত্রেই বাধ্যকারী নির্জ্ঞানশক্তি চালিত (driven by unconscious compulsive motivation)। মার্কসীয় পদ্ধতির বিপ্লব এক বাধ্যকারী নির্জ্ঞানতাড়িত নিউরোটিক শ্রেণীর পরিবর্তে অন্য এক বাধ্যকারী শক্তির ক্রীড়নক শ্রেণীর আধিপত্য। মার্কস-এর মানবমন সম্পর্কে ও বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা অতি সরল, অতি আশাবাদী এবং অজ্ঞতাপূর্ণ।** সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত গণ-মানসের পরিবর্তন—ফ্রম কর্তৃক বিশোধিত ফ্রয়েডীয় সাইকোএ্যানালিসিসের সাহায্যে। এই নতুন পদ্ধতির সাইকো-এ্যানালিসিসের নাম—মানবতাবাদী (Humanistic) সাইকোএ্যানালিসিস। ফ্রমীয় মনস্তত্ত্বের বিচারে তার বিপ্লবের তত্ত্ব অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। ফ্রমকে

---

* According to Fromm, Marx was tragically mistaken in his view of man as a rational being. He did not know the "great truth" discovered by Freud : that man is an irrational animal, that he is driven by compulsive neurotic strivings which determine his thoughts, acts, and feelings. Had Marx known this, he would not have stressed the socialization of the means of production as the primary factor for transformation of capitalism into socialism, nor would he have viewed the modern working class as the prime moving force in the socialist revolution...The socialization of the means of production would only substitute one compulsively motivated class for another, the working class for the capitalist class. (Wells : The Failure of Psycho-analysis, New York, 1963, pp 130-31)

** Marx maintained an oversimplified overoptimistic rational picture of man. (Fromm : The Sane Society, New York, 1964, p 263)

যারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মনে করেন তাঁদের কাছে ফ্রমীয় মনস্তত্ত্ব বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত মনে হতে পারে। মার্কসবাদ সমর্থক বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরে তাকে বিপ্লবী প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। আমরা সে-রকম মনে করি না, তাই মানবতাবাদী সাইকোঅ্যানালিসিসের সাহায্যে মার্কসবাদকে বিশোধিত করে বিশুদ্ধ বিপ্লব ঘটাবার তত্ত্বের অসারত্ব দেখাতে হল। সমাজের প্রতিটি মানুষের নিউরোটিক বাধ্যকারী প্রেষণা দূর না করা পর্যন্ত বিপ্লবের চিন্তা করা মূর্খতা—এই হচ্ছে এরিক ফ্রমের বক্তব্য। ফ্রমের 'সুস্থ সমাজ' (Sane Society) গড়ার পরিকল্পনা আর আকাশে ফুলের চাষ করার মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ আছে কি ?

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে রাজনীতি, পরিবেশ, পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ, নিরষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি নানা কথা বললেও শেষ পর্যন্ত ফ্রম ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক ধারণার যেটুকু শোধন করতে চান, তার ফলে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির ক্রীতদাস না হয়ে পুঁজিবাদী সমাজের অদৃশ্য শক্তি-পরিচালিত, আত্ম-নিয়ন্ত্রণশক্তি-বঞ্চিত হতভাগ্য অটোমেটন। সমাজের সকলেই নিউরোটিক। মার্কসের মতে কিন্তু মানুষ মূলত যুক্তিবুদ্ধিবাদী সামাজিক জীব এবং সুস্থ মানসিকতার অধিকারী। পাভলভও তাই মনে করেন। পুঁজিবাদী সমাজের অস্বাস্থ্যকর উদ্দীপকের প্রভাবে সাময়িকভাবে অসুস্থ পরাবর্ত গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু বেশীরভাগ অসুস্থ মানুষকেই সুশিক্ষার মাধ্যমে, স্বাস্থ্যকর উদ্দীপকের সংস্পর্শে সুস্থ করে তোলা যায়। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকার দরুণ পুঁজিবাদী সমাজের অনেকেই নিজের চেষ্টাতেই সুস্থ থাকতে পারেন, এবং এই সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতে ও বলতে পারেন। সুস্থ সমাজ (Sane Society)-এর লেখক এরিক ফ্রম নিজেই সেই পরিবর্তনকামী মানুষের একজন।

তাঁর তত্ত্ব প্রণয়নে ফ্রমও ফ্রয়েডের মতই টটলজির (tautology) আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সাইকোঅ্যানালিটিক পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন, আবার সেই পদ্ধতির সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করে মৌলিক তত্ত্বকে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বাধ্যকারী নির্জ্ঞান প্রেষণাতত্ত্ব ফ্রয়েডীয় ধ্রুপদী পদ্ধতির প্রয়োগ করে গড়ে তুলেছেন। অথচ সেই পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন—আবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির সপক্ষে ওকালতিও করেছেন।*

---

*Although psychoanalysis does not live up to the ideal which was for many years the ideal of academic psychology,

পুঁজিবাদী সমাজের অসহ্য যন্ত্রণা এড়াতে নেতিবাচক বুর্জোয়া-মুক্তি থেকে অব্যাহতি পেতে, ব্যক্তি মানুষ মোটামুটি তিনটি নির্জ্জন বাধ্যকারী উপায় বা প্রবণতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রথমটিকে ফ্রম নাম দিয়েছেন—মর্ষকাম-ধর্ষকাম প্রবণতা। এই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে বেশির ভাগ মানুষ অপরের কাছে আত্মসমর্পণ করে পুঁজিবাদী সমাজের স্বাধীনতা—মানে নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা ও শক্তিহীনতা থেকে উদ্ধার পেতে চায়। এই আত্মসমর্পণের ফলে কিন্তু তার সমস্যা মেটে না। সাময়িকভাবে যন্ত্রণা কমলেও সে বাধ্যকারী শক্তির ক্রীড়নক হয়েই থাকে, তার সন্দেহ ভয় দূর হয় না।* এ হল মর্ষকামের আচরণ। ধর্ষকামী আচরণ বিপরীত ধরনের। ধর্ষকাম তার বুর্জোয়া যুক্তির যন্ত্রণা লাঘব করতে অপরের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে চায়। শক্তিমান সর্বাধিনায়ক অথবা ঈশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করে তার যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হলেও, নির্জ্জন বাধ্যকারী শক্তির অধীনতাশৃঙ্খল থেকে সে মুক্তি পায় না। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ধর্ষকামী প্রবণতার অভিব্যক্তি।**

ফ্রয়েডের 'মৌলিক-লিবিডো' ও 'পায়ুস্থ লিবিডো'র চরিত্র-লক্ষণ ফ্রমের এই দুই প্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। সারমর্ম একই আছে, নামের শুধু রদবদল হয়েছে।*** জৈব আখ্যার বদলে সামাজিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ফ্রমের দ্বিতীয় বাধ্যকারী শক্তির বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। এই ধ্বংসকামিতা পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত নয়। ফ্রমের মতে এ-ও অন্তরস্থিত যুক্তিহীন প্রবণতার নিদর্শন। পুঁজিবাদী

---

that is, the approximation of the experimental methods of natural sciences, it is nevertheless a thoroughly empirical method, based on the pains-taking observations of an individual's uncensored thoughts and fantasies. (Fromm : Sane Society, p 163-65)

* The irrationality of masochism, as of all other neurotic manifestations, consists in the ultimate futility of the means adopted to solve an untenable situation. (Escape From Freedom, p 180)

** The craving for power is the most significant expression of sadism. (Ibid, p 181)

***The content of the compulsive mechanism is the same, only the Freudian biological sexual organ theory of origin is exchanged for a theory of social genesis. (Wells : The Failure of Psychoanalysis)

সমাজের নেতিবাচক স্বাধীনতার অকল্পনীয় যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের মানসিক প্রক্রিয়া প্রবণতা। ফ্রয়েডের মৃত্যুবাদ থেকে এর পার্থক্য আমাদের মত সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

তৃতীয় বাধ্যকারী শক্তি দ্বারা সমাজের অধিকাংশ মানুষ প্রভাবিত ও চালিত। এর নাম দেওয়া হয়েছে অটোমেটন কনফরমিটি (automaton conformity) বা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক অনুরূপতা। গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তি তার বুর্জোয়া স্বাধীনতার যন্ত্রণা লাঘব করতে চায়। এই প্রবণতাও ফ্রমের মতে যুক্তিহীন। জন-অরণ্যে মিশে গিয়ে আত্মবিলুপ্তির এই চেষ্টায় সমস্যার সমাধান হয় না। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রে এই অনুরূপতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। যে-কোনো শক্তিমান ব্যক্তি নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে এরা নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত।* হর্নি ও ফ্রম দুইজনেই ফ্রয়েডের পুরনো মদ তাঁদের নতুন বোতল ও লেবেলে পরিবেশন করেছেন।

এই তিন প্রধান প্রবণতার বিশদ বিবরণ পড়লে অনেকেই ফ্রমের আসল বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন; এই প্রবণতাগুলো প্রধানত একনায়ক রাষ্ট্রের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নির্জ্জন বাধ্যকারী শক্তি তাড়িত মানুষের অসহায়ত্ব ও ক্লীবত্বের যে ছবি ফ্রম এঁকেছেন, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই শুধু আসা যায় যে অপ্রতিরোধ্য একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সাধারণের করণীয় কিছু নেই—এই কথাই ফ্রম বলতে চেয়েছেন। ফ্রমীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হয়ে ইতিবাচক স্বাধীনতার অথবা বিপ্লবের জন্য লড়াই করার সামর্থ্য অর্জন করার পূর্ব পর্যন্ত পুঁজিবাদী সমাজকে এড়িয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই হল ফ্রমের বক্তব্যের সার কথা।

পাভলভের মত বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিক এর বিপরীত কথাই বলবেন: পলায়নী-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে যুক্তিবুদ্ধিকে আশ্রয় করে শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলাবার প্রয়াস করাই সর্বতোভাবে সব মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য।

ফ্রমের নৈরাশ্যবাদের চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় তাঁর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Psychoanalysis and Religion নামক বইটিতে। তিনি সাইকোঅ্যানালিসিস ও ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে জেন-বুদ্ধবাদ ও অস্তিত্ববাদের সহায়তায় পুঁজিবাদী যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন।

ফ্রম সম্পর্কে হার্ষ্ট লিখেছেন যে, অন্য এক পথ দিয়ে ফ্রম ফ্রয়েডের তত্ত্ববিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছেন। তিনি সমাজ সংস্কৃতির কথা বলেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক

* Thus he is ready to submit to new authorities which offer him security and relief from doubt. (Escape From Freedom)

ও সামাজিক শক্তিকে মনস্তত্বায়িত করেছেন। ফ্যাসীবাদের উদ্ভবের মূলে ব্যক্তি-মানসিকতার অস্বাভাবিকতা—এই বক্তব্য উপস্থাপিত করে আর্থ-সামাজিক শক্তিকে অবহেলা করেছেন। প্রধানত শ্রেণীদ্বন্দ্ব, অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম—এই সত্যকে বিকৃত করেছেন।*

কারেন হর্নি ও এরিক ফ্রমের মত ব্যাপকভাবে ফ্রয়েডবাদ শোধন পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আর কেউ করেন নি। কার্ডিনার, লিণ্টন, মীড প্রমুখ কৃষ্টিবাদী সাইকো-এ্যানালিষ্টরা ফ্রয়েডের বহু অভিমত খণ্ডন করেছেন, আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণা করে অনেক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন; আবার শুধুমাত্র কয়েকটি বাছাই করা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিজেদের গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখার ফলে তাঁদের অনেক তথ্যের উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে। কেবলমাত্র শিশুদের স্তন্যপান, স্তন্যপান ত্যাগ, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস ইত্যাদিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সামাজিক নৃবিদ্যা বা মনোবিদ্যার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রণয়ন করা যায় না।** এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সীমিত ক্ষেত্রে গবেষণা তাদের ফ্রয়েডবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। তারা মুখে লিবিডোতত্ত্বের বিরোধিতা করলেও কার্যত তাঁরা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক মনস্তাত্ত্বিক।

---

* Thus by another route Formm arrives at a point which is similar to Freud's. He talks about the influence of 'culture' on personality, but he too psychologises about history and social forces, for the entire thesis of his work is that primarily psychological forces account for the rise of fascism. (Furst, op cit, p 4)

** There is still another psychoanalytic trend in the study of neurotic and his environment. This is exemplified by the writings of Kardiner, Linton, Mead and others. These scientific workers have made studies of the culture of other people with the intention of correlating personality development and cultural forces.... These studies pay attention chiefly to nursing, weaning, toilet training and infant feeding . These oversights are not accidental. They are inherent in this psychoanalytic school which rejects the psychoanalytic school but actually follows it in practice. (Ibid)

পাভলভীয় ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য ও মূল্যায়ন

মননক্রিয়ার সংগঠন সম্পর্কে পাভলভ ও ফ্রয়েড বিপরীত অভিমত পোষণ করেন—একথা আমরা আগেই বলেছি। পাভলভের মতে, সুস্থ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে স্বাভাবিক মানসিকতা বিশেষভাবে সম্পর্কিত এবং চৈতন্যের প্রতিফলনতত্ত্ব পাভলভীয় মনোবিদ্যার প্রাথমিক ও প্রধান প্রকল্প। ঠিক এর বিপরীত ধারণা নিহিত রয়েছে ফ্রয়েডের মননক্রিয়া সম্পর্কিত নির্জ্ঞানপ্রেষিত যুক্তিহীন বাধ্যকারী প্রকল্পে। সংক্ষেপে বলা চলে: পাভলভের মনোবিদ্যা চৈতন্য তত্ত্ব ও ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা নির্জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে অবস্থিত প্রক্ষোভ ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা বোধশক্তির জনক, আর পাভলভীয় প্রত্যয় অনুসারে প্রক্ষোভ, চেতনার বা বোধশক্তিরই অংশবিশেষ। প্রক্ষোভ, ফ্রয়েডের মতে বাস্তবের প্রতিফলন নয়, বাস্তবের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার উপায় বিশেষে—অহংকে রক্ষা করাই প্রক্ষোভের প্রধান ধর্ম। প্রক্ষোভ সর্বজনীন ও যুক্তিহীন—সব মানুষকে তার বিরোধী সামাজিক পরিবেশের কঠিন নিষ্ঠুর আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রক্ষোভের জন্ম; যুক্তিহীন বলেই প্রক্ষোভ নির্জ্ঞানে অবস্থিত বলে পরিগণিত। যুক্তি বুদ্ধি থেকে প্রক্ষোভের স্বাতন্ত্র্যই প্রক্ষোভের যুক্তিহীনতার কারণ। এই যুক্তিহীন প্রক্ষোভ মানুষের বাস্তব সম্পর্কিত ধারণাকে নির্ণয় ও নির্ধারিত করে, কাজেই মানুষের ধ্যানধারণাও অযৌক্তিক। প্রক্ষোভ নির্জ্ঞানে অবস্থিত, প্রক্ষোভ চৈতন্যের নিয়ন্ত্রক, সেই কারণে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী সংজ্ঞান নির্জ্ঞান পরিচালিত ও নির্জ্ঞান নির্ধারিত। সমাজ সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় এবং পাভলভীয় ধারণার বৈপরীত্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ফ্রয়েড মনে করেন সমাজ সভ্যতা সহজপ্রবৃত্তির অদবমন ঘটিয়ে মানবমনকে অসুস্থ করে, হর্নি ও ফ্রমের মতে সমাজের নিষ্ঠুর আঘাত থেকে অহংকে বাঁচাতে নির্জ্ঞানে বাধ্যকারী অযৌক্তিক শক্তির সমাবেশ ঘটে এবং সেই শক্তিই মানুষকে তার অজ্ঞাতে পরিচালিত করে। অপরদিকে, প্রতিফলনতত্ত্ব অনুসারে সমাজ অভিজ্ঞতার উৎস, এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের চৈতন্যের উপাদান মানসিক গুণরাজির উন্মেষ ঘটে।*

---

* The general structure of "normal" mental activity based on healthy higher nervous functioning is a primary concern of the reflection theory of consciousness. This theory sharply confronts the psychoanalytic doctrine of universal unconscious, irrational and compulsive mental activity... Reformed psychoanalysis is a theory of consciousness, but the reflection theory is a theory of consciousness. (The Failure of Psychoanalysis, p 162)

দুই তত্ত্বের মৌলিক বৈপরীত্য দেখাতে একটা কথা নানাভাবে বলতে হল। দুই তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য এবং মৌলিক পার্থক্যকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য, বোধহয়, এই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল। এই মৌলিক বৈপরীত্যের কথা মনে রাখলে আমাদের পরবর্তী বক্তব্য উপস্থাপন—এই দুই তত্ত্বের মূল্যায়ন—সহজ হবে।

ফ্রয়েডের মূল্যায়নে অনেকে তাঁর পর্যবেক্ষণ তথ্য থেকে তাঁর অতিকথামূলক তত্ত্বকে আলাদা করে দেখতে চান। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার পরও অনেকে মনে করেন যে ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং সংগৃহীত তথ্যরাজি যথেষ্ট মূল্যবান। আবার আইসেন্ক (Eysenck)-এর মত বিজ্ঞানী ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বিশেষ সমালোচনা করে তাঁর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকল্প গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেছেন যে তিনি প্রমাণের তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রণালী অনুসরণ করেন নি—এইজন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের সাইকো-এ্যানালিসিসকে সামাজিকভাবে বর্জন করতে চান। আইসেন্ক তা চান না। ফ্রয়েডের উপাত্ত তথ্য এবং বক্তব্যের মধ্যে অনেক কিছু গ্রহণযোগ্য আছে, বিজ্ঞানের আলোতে ফ্রয়েডের পুনর্মূল্যায়ন করলে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব মানবকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।* আর হার্ট ও ওয়েলস—যাঁদের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি এই খণ্ডে দেওয়া হয়েছে,—মনে করেন যে ফ্রয়েডের উপাত্ত ও তথ্য তাঁর অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর কার্যপদ্ধতিকে তাঁর অধিমনোবিদ্যা থেকে আলাদা করে দেখা চলে না। পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্বের বিপরীতে ফ্রয়েডীয় সাইকোএ্যানালিসিসকে স্থাপিত করে ওয়েলস দেখিয়েছেন যে ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণজাত মূল্যবান অবদান তাঁর তত্ত্বের রঙে রঞ্জিত হয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে।** ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণের সাহায্য ছাড়াই মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে এবং গড়ে উঠেছে।

---

* There is much that is supremely important in Freud's contribution to psychology but there is also much that is bad...what is wrong with psychoanalysis ? Simply that psychoanalysis is unscientific. It is only by bringing to bear the traditional methods of scientific inference and experimentation that we can hope to reap all the benifits of the founder's genius. (Eysenck : quoted by Guha in 'Manabmon' Bengali, October 1974, p 294)

** As a matter of fact we found that the very observations themselves were determined by the concept of the hereditary mental apparatus specially by the assumption of an

ফ্রয়েডের জনপ্রিয়তার কারণস্বরূপ সাধারণত যে-সব ধারণা প্রচলিত আছে, ওয়েলস তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি নিজস্ব যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। আমরা তাঁর যুক্তিগুলি খুব সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

অনেকে মনে করেন, যৌনব্যাপারে নীতিবাগিশদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিয়ে ফ্রয়েড মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। একথা সত্যি যে ভিক্টোরিয়া যুগের নরনারীর বিবাহিত জীবনের নৈতিকতা সম্পর্কে ও দাম্পত্যজীবনের বহির্ভূত প্রেম সম্পর্কে বাধা-নিষেধের আধিক্য ও গোঁড়ামির অন্ত ছিল না এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই অতিশুচিতা, অতিনৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এর মূলে প্রধানত ছিল শিল্পায়ন, নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামন্ততন্ত্রের পতন, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব হ্রাস এবং নারীমুক্তি আন্দোলন। গল্পে উপন্যাসে বিবাহের চেয়ে বড় সম্পর্ককে মহিমান্বিত করার চেষ্টা চলেছিল। নরনারীর যৌন সম্পর্ক নিয়ে হ্যাভলক এলিস, বারট্রাণ্ড রাসেলের মত মনীষীরা খোলাখুলি আলোচনা শুরু করেছিলেন, যৌন ব্যাপারে ও নরনারীর মিলনের ব্যাপারে প্রাচীনপন্থীদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রচেষ্টাকে নানাদিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল। মিলনেচ্ছা ও যৌনকামনার শারীরবৃত্তিক অনেক কারণ আবিষ্কৃত হচ্ছিল। এইসব কারণ মিলে সমাজে যৌন-বিপ্লবের ঢেউ জেগেছিল এবং এ-সম্পর্কে তরুণদের ঔৎসুক্য উৎসাহ পুরানো আমলের ধারণার অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিল। ওয়েলসের মতে ফ্রয়েডের তত্ত্ব সুস্থ মানুষের প্রেম ভালবাসার ওপর বিশেষ কোনো আলোকপাত করেনি; বরং ইডিপাস, ইলেকট্রা, ধর্ষকাম-মর্ষকাম ইত্যাদি তত্ত্ব অস্বাভাবিক কামনাকে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে তরুণমনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং নতুন আন্দোলনের অগ্রগতিকে সাহায্য করার পরিবর্তে ব্যাহত করেছিল।*

---

innate archaic language of the unconscious in the form of stereotyped symbols inherited from primitive man... The working theory cannot be surgically removed from the speculative metapsychology. (Wells, Pavlov & Freud)

* His sexual theories were not so much concerned with normal sexlife and attitudes, as they were with aberrations and perversions. There is a real question whether the latter did not serve more to misguide the new movement rather than to give it a healthy, normal direction.... Freud led the newly liberated mind through an underworld labyrinth which was held to be biologically inherited from prehistory and inevitably enmeshing each and every individual life. Could such an approach have made an

বলা হয়ে থাকে, ফ্রয়েডের তত্ত্ব শিশুমনের বিকাশ ও শিশুশিক্ষাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এ সম্পর্কে ঐ একই কথা বলা চলে। অতিকথামূলক শৈশব যৌনতা তত্ত্ব দিয়ে শিশুমনকে বোঝা ও শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে না—বস্তুবাদী এবং যুক্তিবাদী মাত্রেই ওয়েলসের এই অভিমত সমর্থন করেন।*

আর একটি ব্যাপারেও সাধারণের ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন ওয়েলস। এ ধারণাটি মনোরোগবিষয়ক। নিউরোসিসের সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে অভিনন্দন করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অন্য সব কিছুর বিরোধিতা করেন। ওয়েলস ও অন্যান্য পাভলভপন্থীরা কিন্তু মনে করেন যে, ফ্রয়েডের নিদানতত্ত্ব তাঁর সর্বরতিবাদ, অবদমন ও লিবিডো-তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত—কাজেই ফ্রয়েডের অবদমন উদ্‌গমন তত্ত্বের বিরোধিতা করে ফ্রয়েডের নিদানতত্ত্বের সমর্থন চলে না। যৌনজীবন নিউরোসিসকে প্রভাবিত করে না, অথবা মনের রোগে যৌনবিকার ঘটে না—একথা পাভলভপন্থীরা বলেন না। তাঁদের আপত্তি যৌনতা ও কামেচ্ছা অবদমন নিউরোসিসের প্রধান বা একমাত্র কারণ—এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে।** তাছাড়া স্বপ্নব্যাখ্যা দ্বারা রোগের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টার কোনো অর্থই হয় না। যৌন অবদমন ও উদ্‌গমনকে

---

important positive contribution to the liberation of sex from puritanical hypocrisy ? (Wells : Pavlov & Freud, pp 222-223)

* Here again, however the same holds true. Did his myth permeat theory of infantile sexuality and the repression and sublimation of the aberrational phases help parents and teachers to understand and guide the child along healthy lines of development ? (Ibid p 213)

** It is likewise widely maintained that, granting the fantastic nature of his theories generally, Freud nevertheless made a genuine contribution to the understanding of the etiology of neurosis. But since he viewed etiology primarily as a sexual phenomenon, and since his theory of sex was permeated with myths of innate archaic heritage,... the psychoanalitical theory of etiology cannot help but be itself mythical and unscientific.... The contention here is that any such mechanical attempt completely disregards the organic character of psychoanalysis in which the archaic myths are an absolutely indispensable element, one might say the 'sine qua non' of all Freud's observations as well as his theories. (Ibid, p 224)

নিদানতত্ত্বের প্রধান স্তম্ভ বিবেচনা করা—কোনো যুক্তিবাদী চিকিৎসকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তত্ত্ব বা প্রয়োগ পদ্ধতি, কোনো দিক থেকেই ফ্রয়েডবাদের কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানসম্মত পাভলভীয় মনোবিদ্যা এখনও সব জটিল মানসিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না ; কিন্তু আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের পথে ধৈর্যসহকারে এগিয়ে গেলে একদিন সব না হোক অধিকাংশ মননক্রিয়ার বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা এখনও কি প্রকৃতির সব রহস্যের ব্যাখ্যা করতে পারি? অনুমানভিত্তিক কল্পনায় গড়া কোনো প্রকল্প সৃষ্টি করে সব কিছু রহস্যের আশু সমাধানের চেষ্টা মানবসমাজ ও বিজ্ঞান—উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

পাভলভ ও স্কিনার

হারভার্ডের মনস্তাত্ত্বিক বি. এফ. স্কিনার বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একজন বহু-আলোচিত ব্যক্তি। তাঁর প্রবর্তিত স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকর পরাবর্তের (operant conditioning) সাহায্যে ব্যক্তিমনকে পরিবর্তিত করে তিনি সমাজের সব দুর্নীতি দূর করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি 'Walden Two' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করে রাতারাতি বিখ্যাত হন। সেই উপন্যাসে এক ইউটোপিয়ান গোষ্ঠীর কথা লেখেন—যে গোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে শৈশব থেকে এমনভাবে পরাবর্ত গড়ে তোলা হত, যার ফলে তারা ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থকে অভিন্ন মনে করত। ব্যক্তির কোনো চাওয়া-পাওয়া গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিকূল হত না। এই গোষ্ঠীর স্থাপয়িতা উপন্যাসের নায়ক ফ্রেজিয়ারের মুখ দিয়ে স্কিনার তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। মানবজাতি এমন এক পূর্বপরিকল্পিত জগৎজোড়া সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম যেখানকার সর্বাধিনায়ক হবে নিষ্ঠুর অথচ সদাশয়। এই নিষ্ঠুর সদাশয় (benevolent tyrant) একনায়কের নির্দেশে ব্যক্তিকে হিসেবমত পুরস্কার দিয়ে নায়কের অভিপ্রেত কাজ করতে অভ্যস্ত করা যাবে। ফ্রেজিয়ারের অর্থাৎ স্কিনারের মতে, ব্যক্তিমাত্রেই যন্ত্রবিশেষ; তার আচরণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মত আগে থেকে নির্ধারিত নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। ব্যক্তির ভাবানুভূতি, উদ্দেশ্য, অন্তরাত্মা, সৃজনক্ষমতা, স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—সবই গল্পকথা বা কুসংস্কার।*

আলডু হাক্সলীর 'Brave New World' বইটিতে ব্যক্তিসত্তাবিলোপকারী সমাজব্যবস্থার বর্ণনা আছে। সেখানে ব্যক্তির টেষ্ট-টিউবে জন্মগ্রহণ থেকে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি কার্যকলাপ ওপরতলার মরজিমাফিক নির্দিষ্ট ও কঠোর

---

* Man—argues Frazier, is a mere machine whose behaviour is as simply predicted and controlled as a chemical reaction in test-tube ; the idea of an inner self with feelings, purposes, creativity and some capacity to take charge of its own destiny is held to be no more than myth or superstition. (Paul Gold : The Individual, p. 170)

ভাবে নিরূপিত। এমন কি প্রক্ষোভ প্রকাশ পর্যন্ত ওষুধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত। 'স্যাভেজ' চরিত্রটি শুধু ব্যতিক্রম। সে সমাজের বাইরে বিচরণ করে। তার সব ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। তাকে প্রতিদিন জীবনধারণের সংগ্রাম করতে হয়, তবে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। সমাজের নিয়ন্ত্রককে সে বলে: সে আরাম চায় না। সে ঈশ্বরকে চায়, সে বিপদে পড়তে চায়, স্বাধীনতা চায়, কবিতা পড়তে চায়, পাপ করতে চায়। নিয়ন্ত্রক বলে: সে অসুখী হবার স্বাধীনতা দাবী করছে। 'স্যাভেজ' অবজ্ঞাভরে জবাব দেয়: হ্যাঁ সে অসুখী হবার স্বাধীনতা দাবী করছে। আলডু হাক্সলী মনে করেন এই 'স্যাভেজের' ইচ্ছাই প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ইচ্ছা। সে তার সব কিছু গুণাবলীর পূর্ণবিকাশের জন্য চেষ্টা করার স্বাধীনতা চায়, সে এমন সমাজব্যবস্থা কামনা করে যেখানে গুণাবলী বিকাশের সকল সুযোগ সম্ভাবনা আছে।* স্কিনারের পরিকল্পিত Walden Two আর হাক্সলীর **Brave New World** একই ধরনের সমাজ; তবে এই সমাজ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পরস্পরবিরোধী ও বিপরীত।

'ওয়াল্ডেন টু' (১৯৪৮) নামক উপন্যাস এবং 'বিয়ণ্ড ফ্রিডম এ্যাণ্ড ডিগনিটি, (Beyond Freedom and Dignity, 1971) নামক আরো বেশী পরিচিত বইটি লক্ষ লক্ষ লোক পড়েছেন এবং পাঠকদের অনেকেই স্কিনারের অভিমত ও পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। বিরোধীদের মতে, তাঁর পরিকল্পনা শুধু যে অসার তাই নয়; বিপজ্জনক ও নীতিহীন।** সদাশয় সর্বাধিনায়ক (benevolent despot) কেবলমাত্র পুরস্কারের সাহায্যেই আচরণ পরিবর্তন করবেন,—শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন না—এরকম আমরা মনে করি না। স্কিনার অস্বীকার করলেও একথা সকলেই জানেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার গত কয়েক বছর ধরে স্কিনারপদ্ধতিতে আচরণ পরিবর্তনের ব্যাপারে শাস্তিমূলক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া, সমাজের কিসে

---

* The long trail in search of the individual leads finally to this "savage" natural desire in all people : to strive during their life time to develop fully the potential that is born in them ; to experience all the emotions that the range of human existence has to offer ; and always above all else, to be permitted to become the individual. (p 171)

** His grand—not to say grandiose—vision of the future has been denounced by philosophers and scientists. To detractors his scheme is unworkable, potentially dangerous and morally wrong. (Ibid)

মঙ্গল হবে সেটা নির্ধারণ করবে কে? স্কিনারের উপন্যাসের নায়ক ফ্রেজিয়ারের মত কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়—যে নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলী দেখতে পায় এবং একটু হেসে বলে যে একটি ব্যাপারে ঈশ্বরের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য—ঈশ্বর তার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ।*

স্কিনারের এই 'ইউটোপিয়া'র কঠোরতম সমালোচকদের অন্যতম অস্তিত্ববাদী সমীক্ষক রোলো মে** মনে করেন যে স্কিনার একজন 'অটোক্রাট'। স্কিনার তার সমালোচনার জবাবে বলেছেন যে ব্যক্তিকে যদি যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে সমাজ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।***

হার্ভার্ডের অন্য একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেন: অন্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক মানবতত্ত্বের চরম অপমান।**** ফ্লোরিডার একজন অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন যে স্কিনারের পরিকল্পনা স্বর্ণযুগের ব্লুপ্রিন্ট নয়, নরকসৃষ্টির পদ্ধতি।*****

এইবার স্কিনারের 'অপারেন্ট কণ্ডিশনিং'-এর উৎপত্তি আলোচনা করা যেতে পারে।

স্কিনারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে

স্কিনার একজন ব্যবহারবাদী মনস্তাত্ত্বিক। ব্যবহারবাদ আমেরিকায় নতুন নয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্যবহারবাদের গোড়াপত্তন হয়। বিশ শতকের প্রথম

---

* Frazier of 'Walden Two' speak of a point of similarity between himself and God and elsewhere says with a smile, "perhaps I must yield to God in point of seniority. (Ibid)

** Existential psychoanalyst Rollo May believes that Skinner is a totalitarian without quite realizing it. (Ibid)

*** Skinner's response to such charges of authoritarianism is : If you insist that individual rights are the "sumnumbonum", then the whole structure of society falls down. (Ibid)

****Harvard social psychologist Harbart Kolman sums the fears of his colleague by observing......any manipulation of the behaviour of others constitutes a violation of their essential humanity. (Ibid)

*****Richard Rubenstein observes that Skinner's Utopian projection is less likely to be a blue print for the Golden Age than for the theory and practice of hell. (Ibid)

দিকে ওয়াটসনের নেতৃত্বে ব্যবহারবাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। ওয়াটসন রুশ বিজ্ঞানী বেকটেরেফের গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হবার পর ব্যবহারবাদীরা 'কণ্ডিশনিং' কথাটি ব্যবহার করতে থাকেন। ওয়াটসন বেশ জোরের সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে মানসিকতা বা মননক্রিয়া একধরনের ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন্তাভাবনা গঠন ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অনুচ্চারিত কথাই চিন্তা। কথা বলা কতকগুলি বিশেষ পেশীর বিশিষ্ট ব্যবহার। অনুচ্চারিত কথা বা চিন্তাতে কথা বলার সঙ্গে সম্পর্কিত সবগুলি পেশী ব্যবহৃত হয় না।* চিন্তা মনের নিজের সঙ্গে কথা বলা। স্বরতন্ত্রী (ভোকালকর্ড) যদি কাজ না করে, কথা চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। পেশীর সঙ্কোচন ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন দ্বারা জীবজগতের ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি, আকুতি ইত্যাদি সব কিছুর ব্যাখ্যা করল ব্যবহারবাদ। ক্রমশ এঁদের কাছে মস্তিষ্কের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকল।** এই সব যান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে শর্তাধীন পরাবর্ত প্রক্রিয়া (কণ্ডিশন্ড রেসপন্স মেথড) যুক্ত হয়ে ব্যবহারবাদী শিক্ষা ও চিকিৎসা-পদ্ধতি গড়ে উঠল। ল্যাসলে*** খাদ্য দেখানোর সঙ্গে মানুষের লালানিঃসরণ কণ্ডিশনিং করলেন। আরো অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ব্যবহারবাদের সঙ্গে কণ্ডিশনিং কথাটির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হল। কণ্ডিশনিং কথাটি এঁরা ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু ব্যবহারবাদীদের,—বিশেষ করে স্কিনারের কণ্ডিশনিং ও পাভলভের কণ্ডিশনিং সমার্থবাচক নয়। পাভলভের পদ্ধতিকে ব্যবহারবাদীরা ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী পদ্ধতি নাম দিয়েছেন। একটি মাত্র বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে প্রাণীকে কণ্ডিশনিং করা হয়। ঘণ্টার শব্দ ও লালা পড়ার সঙ্গে পরাবর্ত স্থাপিত করতে হলে ল্যাবরেটরীতে ঘণ্টা বাজানোর সময় এমন ব্যবস্থা করা

---

* Watson's most important theoretical contribution was then and as time went on—the insistence that all phenomena of inner life are in reality the functioning of mechanisms which are as objective, though not as observable, as gross muscular contractions. (Murphy : Historical Introductions to Modern Psychology, London 1949 p. 262)

** Though the brain remains a connecting station, it is for the behaviorists no more intelligible to say that we think with the brain than to say that we walk with say, spinal cord...The centre of gravity moved, so to say, from the centre to the periphery. (Ibid 265)

***The Human Salivary Reflex and Its Use in Psychology, "Psycho Review". 1966, 23, 446-64

হয়, যাতে অন্য কোন উদ্দীপক ঐ সময় প্রাণীর কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত না করে। ব্যবহারবাদীদের একটি দল থর্নডাইক, হুল, স্কিনার, পাভলভের পরিভাষা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পাভলভের পরাবর্তগঠনের তত্ত্বকে গ্রহণ করেন নি। একজন লেখকের মতে পাভলভ ও ওয়াটসনের তত্ত্ব প্রায় অভিন্ন, এঁরা নাকি ধ্রুপদী কণ্ডিশনিং পদ্ধতির পক্ষপাতী ; অপরপক্ষে স্কিনারের দল নতুন ধরনের পরাবর্ত গঠনের পক্ষপাতী। এই নতুন পদ্ধতির নাম 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং' বা স্বতঃস্ফূর্ত (ভলাণ্টারী) কণ্ডিশনিং।* পাভলভীয় ধ্রুপদী পদ্ধতিতে পরাবর্ত গঠিত হয় পরীক্ষকের চেষ্টায়, এই কণ্ডিশনিং অনৈচ্ছিক (ইনভলাণ্টারি)। স্কিনার-এর 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং'-এর বেলায় ধ্রুপদী কোনো নির্দিষ্ট উদ্দীপক ব্যবহার করা যায় না। পরীক্ষক ও উদ্দীপকের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন। স্কিনারের সাহায্যকারী (রি-ইনফোর্সিং) উদ্দীপক আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়। 'পিউপিলারি রিফ্লেক্স'—চোখের ওপর আলো পড়লে চোখের মণির সঙ্কোচন—একটা ধ্রুপদী কণ্ডিশনিং-এর নিদর্শন আর টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা স্কিনারীয় 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং'-এর দৃষ্টান্ত। কিন্তু অনেকেই এই ধরনের কণ্ডিশনিং-এর পার্থক্য স্বীকার করেন না।** যাঁরা পাভলভীয় তত্ত্বের সঙ্গে সুপরিচিত তাঁরা জানেন যে খাঁচার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসা, কোনো লিভার বা গ্যাজেটের ওপর চাপ দিয়ে খাবার পেতে শেখা ইত্যাদি তথাকথিত স্কিনারীয়

---

* Those therapists who have followed the lead of Pavlov, Watson & Guthrie have been guided by conditioning or conditioned learning theory, have emphasised the fact that inter-relationships between situations and responses develop as a function of the manner in which the situational stimuli are presented. On the other hand, Thorndyke, Hull and Skinner, the leading proponents of reinforcement theory, have been notable in their exploration of the effects of different consequences, positive and negative, in determining which behaviour will ultimately be acquired, (Comprehensive Text Book of Psychiatry, Indian Edition, 1967, p. 219)

** This distinction between classical....and instrumental ...conditioning is not entirely accepted by many learning theorists on the ground that the criteria are too ambiguous. Psychophysiological interactions, for example, are not clearly differentiated into operant and respondent. (Comprehensive Text Book of Psychiatry, Indian Edition, 1967, p. 169).

কণ্ডিশনিং-এর হদিশ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পাভলভ জেনেছিলেন এবং ধ্রুপদী কণ্ডিশনিং-এর প্রকল্প দিয়ে পাভলভ তা ব্যাখ্যাও করে গেছেন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রথমে ল্যাবরেটরীতে ও পরে স্কুল জেলখানায় হাসপাতালে, স্কিনার অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন, অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রশিক্ষণবিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন; এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যেহেতু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, এ নিয়ে আরো দুচার কথা চলতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। কোনো বানরকে দিয়ে একটা লিভারে চাপ দিয়ে খাবার পেতে শেখাতে হলে স্কিনার কি করবেন? বানরটা যতক্ষণ না নড়াচড়া করছে ততক্ষণ পরীক্ষক তাকে খাবার দেবেন না। সামান্য নড়তে দেখলেই তাকে খাবার দেওয়া হবে, এর ফলে সে আরো নড়াচড়া করবে। এইভাবে সাহায্যকারী উদ্দীপকের সাহায্যে (খাবার দেওয়া) ক্রমশ তাকে সক্রিয় করে তোলা হবে। তারপর তখনই শুধু তাকে খেতে দেওয়া হবে, যখন সে লিভারের দিকে এগুতে থাকবে। এর পরে তার হাতের দিকে পরীক্ষক নজর দেবেন। হাতটা যখনই লিভারের দিকে এগুবে, তখনই সাহায্যকারী উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্য দিয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করা হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাত লিভারে চাপ দেবে। এরপর পরীক্ষক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উপর পরীক্ষার দায়িত্ব তুলে দেবেন। অর্থাৎ লিভার চাপলেই খাবার পাবে, অন্য কোনো উপায়ে পাবে না। এই হল মোটামুটি সদর্থক সাহায্যকারী উদ্দীপকের সাহায্যে 'অপারেণ্ট কণ্ডিশনিং' সৃষ্টির পদ্ধতি। এই কণ্ডিশনকে স্বতঃস্ফূর্ত বা ভলাণ্টারি বলা চলে কি?

মোট কথা, প্রাণীপ্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পাভলভের পদ্ধতির সঙ্গে স্কিনারের পদ্ধতির বিশেষ তফাৎ নেই। এই কারণেই বোধহয় ওয়াটসনপন্থী ব্যবহারবাদী ও থর্নডাইক-স্কিনারপন্থী ব্যবহারবাদীদের সঙ্গে পাভলভপন্থীদের একই গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছে। পণ্ডিত লোকদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যবান পুস্তকে পাভলভকে যান্ত্রিক জড়বাদীদের সঙ্গে সমগোত্রীভূত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে ভাবেই এটা ঘটুক না কেন,—এ-একটি মারাত্মক ভ্রান্তি। ব্যবহারবাদ মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রবৎ বিবেচনা করে; চেতনার বা যুক্তিবুদ্ধির, বিচার বিবেচনার স্থান নেই, মানুষের সামগ্রিক ব্যবহার বলে মনে করে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা যতই পরিবেশনির্ভর ও সীমিত হোক না কেন, নিজের পরিবেশকে বিশ্লেষণ করার স্বাধীনতা ও স্বপ্রয়োজনে পরিবেশকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা মানুষের আছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে আস্থাশীল পাভলভপন্থীরা এই রকম মনে করেন। পাভলভপন্থীরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, চেতনা, মানসিকতার বিচার বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী শেরিংটনের মত মনে করেন না যে,—এ-সব অপার্থিব বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি। পাভলভের মতে মানব চৈতন্য, তার চিন্তাভাবনা,

ধর্মীয় ও অন্যান্য উচ্চতর ধ্যানধারণা, অদর্শবাদ ইত্যাদি সবই পার্থিব ও প্রকৃতিসঞ্জাত।* এর মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তা নেই। আবার এইসব মানসিক গুণাবলী বস্তু নয় (mind is not material)। কিন্তু তা বলে, মানুষ পরিবেশের দাস নয়, মানুষ বিমূর্ত চিন্তার অধিকারী। নিজেকে জানবার বা বোঝবার ক্ষমতা, একান্ত মানবসুলভ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতা লক্ষ লক্ষ বছরের অভিযোজন ও ক্রমবিকাশের ফলে আয়ত্ত করেছে মানুষ। গুণগতভাবে মানব-মস্তিষ্ক পশুমস্তিষ্কের অলভ্য বহুতর নতুন গুণের অধিকারী। মানুষের চিন্তাভাবনা সমাজজাত শুধু নয়, সক্রিয়ও বটে; পশুদের মত সে অক্রিয় বা প্যাসিভ নয়। পাভলভের মতে, পশু শুধু নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে; মানুষ পরিবেশকে পরিবর্তন করে (অবশ্য এই পরিবর্তন খেয়ালখুশিমত করা যায় না, সমকালীন হাতিয়ার ও উৎপাদন শক্তির উপর পরিবর্তনের মাত্রা সবসময়েই নির্ভরশীল)। সে নিজের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এখানেই মানুষের বৈশিষ্ট্য, পশুদের সঙ্গে তার এখানেই পার্থক্য। পশুর মত তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কাজ করে না, প্রয়োজন মিটলে থেমে থাকে না। আবার নতুন প্রয়োজনবোধ তার মধ্যে জাগে এবং তার জন্য স্বল্প অথবা দীর্ঘমেয়াদী বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিকল্পনার সাহায্যে প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আত্মোপলব্ধি ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিকল্পিত ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী মানুষকে ব্যবহারসমষ্টির আধার কল্পনা করার ও খুশিমত তাকে ছাঁচে ফেলে গড়ে তোলার স্কিনারীয় পদ্ধতিকে অবাস্তব ও অশোভন মনে করেন পাভলভপন্থীরা। পাভলভ-তত্ত্ব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। মানবচেতনাকে কেবলমাত্র স্নায়ুপ্রক্রিয়া মনে করে না দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।** যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পার্থক্য যাঁরা অনুধাবন করতে সক্ষম, তাঁরাই

---

* Are not the movement of plants towards light and the search for the truth by mathematical analysis ; phenomena of the same order ? Are they not the last links in the almost endless chains of adaptations proceeding throughout the living world. (Pavlov, Twenty Years of the Experience in the Objective Study of Higher Nervous Activity (Behaviour) of the Animals. Moscow, 1951 p. 22 (Russian)

** The evidence of natural science is insufficient (as yet—D. G.) to fully define the essence of consciousness, because it is more than a physiological phenomenon and is not equivalent to mere nerve-processes. (G. Kursanov : Fundamentals of Dialectical Materialism, Moscow, 1967, p. 103)

শুধু পাভলভ এবং থর্নডাইক-স্কিনারদের তত্ত্বকথার বৈপরীত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। চেতনা শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের (বাক্‌ক্ষমতা) প্রক্রিয়া নয়, চেতনার উন্মেষ ও অভিব্যক্তি-পরিণতিতে সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে ·অনুভূত।* স্কিনারের স্বভাব বা ব্যবহারনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের কোনও কথা নেই, যদিও তাঁরা বলেছেন, ব্যবহার সমাজ-পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের, ঠিক ভাবে বলতে গেলে,—সমাজের স্বতন্ত্র উপাদান—যথা স্কুল, জেলখানা পরিবার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের উল্লেখই বার বার করেছেন। সমগ্র সমাজের পরিবর্তন ব্যতীত বিভিন্ন অংশের কিছুটা সংস্কার হয়তো করা সম্ভব, কিন্তু আমূল সংস্কার সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, আমরা সবাই সব সময়ে কোনও না কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। সন্তানকে নিয়ন্ত্রণ করছে পিতামাতা, ছাত্রকে শিক্ষক, শ্রমজীবীকে শ্রমের মালিক। কথাটা আংশিক সত্যমাত্র। নিয়ন্ত্রণ করছে না, বলা চলে, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তাদের খুশিমত বা স্বার্থসাপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না। গুরুদ্রোহিতা অনঙ্গামিতা আমেরিকার সমাজজীবনকে অস্থির করে তুলেছে। ছাত্রবিদ্রোহ, নিগ্রোবিদ্রোহ, নারীবিদ্রোহের দাপটে রাষ্ট্রনায়করা চিন্তিত ও সমাজনায়করা ব্যতিব্যস্ত। ব্যবহারবাদীদের সাহায্যে ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগে স্কিনার ভেঙ্গে পড়া সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। অন্তত সেই রকমই ভাবছেন উইলার্ড গেইলিন।**

ব্যবহারবাদীরা পাভলভের 'কণ্ডিশনিং' কথাটির ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন। এঁরা মনে করেন, ইঁদুর পায়রা, কুকুর ইত্যাদিকে যেমন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বশ মানানো যায়, মানুষকেও তেমনি যাবে। কিন্তু পাভলভের মস্তিষ্কবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারবাদের কোনো তত্ত্বগত মিল নেই, প্রয়োগগত পার্থক্যও যথেষ্ট।

---

* Consciousness is therefore, from the very beginning a social product and remains so as long as men exist at all. (Marx and Engels. The German Ideology, Moscow, 1964, p. 42).

** He (Skinner) is disturbed "that students no longer respond in traditional ways to educational environment, they drop out of school, possibly for long periods of time, they take only courses they enjoy or which seem to have relevance to their problems."..."that serious problem arises when young people refuse to serve in the armed forces and desert or defect to other countries"...what must be changed are the contigencies which induce young people to behave in given ways toward their governments". (SPAN, August 1974, p. 14)

পাভলভ কখনও সামাজিক মানুষকে ল্যাবরেটরির কুকুর মনে করেন নি। মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির অংশ এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষমতার বলে অনন্য। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে অর্থাৎ সমাজের দুর্নীতি বঞ্চনার নির্মম প্রতিযোগিতা ইত্যাদির অবসান ঘটাতে পারলে, মস্তিষ্ককোষের বিশেষ নমনীয়তার জন্য তার মধ্যে মানবিকতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কিন্তু সমাজের পরিবর্তন সাধন না করে, শুধু তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, তার বা সমাজের কোনো বিশেষ উপকার সাধন করা যায় না। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নিঃসন্দেহে নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত তৈরীর পক্ষে উপযুক্ত,—একথার মানে এই নয় যে তার স্বাধীন ইচ্ছা, ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধকে, তার আদর্শনিষ্ঠাকে যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।*

আমেরিকায় এই ধরনের যান্ত্রিক উপায়ে, সমাজকে অপরিবর্তিত রেখে, মানুষকে বদলে, স্বর্গরাজ্য গড়ার কল্পনা অনেকেই করছেন। ডেলগার্ডো মগজে ইলেকট্রোড বসিয়ে মানুষের হিংস্রতা ও আক্রমণমুখিনতা রোধ করতে চান, ম্যাকলুহান মিডিয়া-বিপ্লবের সাহায্যে মানসিকতার বিপ্লব ঘটাতে চান, ফ্রম ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষার দ্বারা মানুষকে মানবিক করে বিপ্লব আনতে চান। বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে মানুষকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য, বুর্জোয়া সমাজকে তার অনাচার দুর্নীতি সমেত টিকিয়ে রাখার জন্যে মালিকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক প্রচার চলেছে বহুকাল ধরে, গণসম্মোহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে নানা উপায়ে, তবুও কিন্তু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-প্রতিবাদের বিরাম নেই। তাই বোধহয় এই আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ 'অপারেন্ট কণ্ডিশনিং' পদ্ধতি প্রয়োগে মগজধোলাই ও মনোহননের পরিকল্পনা। পাভলভীয় মনোবিদ্যার ছাত্র হিসেবে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগসাফল্য সম্পর্কে আমি সন্দিহান। আর স-সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ব্যক্তিত্ব ধ্বংসকর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে বাধ্য। মহত্তর মানব-প্রবৃত্তি গঠনের পূর্বশর্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠাপর্বেই ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিরোধ বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা এবং এর ফলেই নতুন চরিত্র ও ব্যবহারের

* Man is of course a system but it is a system...unique for its extreme power of self-regulation...is not man the pinnacle of nature, the highest embodiment of the resources of infinite nature, the incarnation of her mighty and still unexplored laws?...And everything vital is retained that is implied in the idea of free will, with its personal, social and governmental responsibility. (Pavlov: Collected Works—Vol. III p. 454)

অধিকারী হবে মানুষ। পাভলভপন্থীরা মানবচেতনা ও মানসিকতার সৃজনাত্মক সক্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা ব্যবহারবাদী তত্ত্বের বিরোধী।* শুধু যান্ত্রিক নয়,—ব্যবহারবাদ, অতি সরল ও স্থূল। স্কিনার পাভলভ প্রভাবিত, কিন্তু তাঁর উচ্চস্নায়ুবিজ্ঞানে বিশ্বাসী নন।

যাঁরা উইলিয়াম সারজেন্ট প্রণীত 'Battle for the Mind' (London, 1970) বইটি পড়েছেন তাঁরা অনেকেই পাভলভ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারেন। শ্রদ্ধেয় একজন অধ্যাপক ও মার্কসীয় পণ্ডিত** এই দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন। বইটি রাসেল, হাক্সলী প্রমুখ মহা-প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য: উইলিয়াম সারজেন্ট-এর বইটি ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন কোরিয়াযুদ্ধের উপর যবনিকা নেমেছে, কিন্তু ঠাণ্ডালড়াই-এর তীব্রতা বেড়েছে। তখনকার সোভিয়েত-বিরোধিতার মধ্যে প্রায়ই ষ্টালিনযুগের নিষ্ঠুরতা ও বিচার প্রহসনের কথা উল্লিখিত হত। আদালতে আসামীর স্বীকারোক্তি ও আত্মসমালোচনা অন্যদেশে বিশেষভাবে সমালোচিত হত। আমেরিকা, ইংলণ্ডের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন পাভলভ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আসামীদের কণ্ডিশনিং করার ফলে তারা এইসব আত্মঘাতী স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া ষ্ট্যালিনযুগে জীববিজ্ঞানে লাইসেংকোর অতিরঞ্জিত দাবীদাওয়া নিয়ে দুই শিবিরের বিজ্ঞানীরা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে জুলিয়ান হাক্সলী এই শিবিরের সেনাপতি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্কসবাদে আস্থাহীন ছিলেন, জীবনের শেষ কয়বছর ছাড়া, সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কোনদিন ভালচোখে দেখেননি। আলডু হাক্সলী সমাজবাদের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এই সময়ে 'কণ্ডিশনিং'-এর যান্ত্রিক ধারণায় অনেক পণ্ডিতই আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং দু'চারজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই সমাজতন্ত্র বিরোধিতার সঙ্গে পাভলভতত্ত্বের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে পাভলভের শিক্ষা নিয়ে সোভিয়েতে সাতদিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবার ফলে দেশবিদেশে পাভলভ সম্পর্কে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার

---

* The dialectico-materialist view of consciousness as an active and creative process contradicts the behaviourist conception of consciousness, which is specially popular in the United States. The behaviourist view of the psychical activity of animals and men is purely mechanical, over-simple and vulgar. (Kursanov : Fundamentals of Dialectical Materialism, Moscow, 1967, pp. 108-109)

** Prof. Hirendranath Mukherjee—(মানবমন, অক্টোবর, ১৯৭৪)

হয়। আর একটি ব্যাপারে পাভলভের কণ্ডিশনিং পদ্ধতি এই সময় বুর্জোয়া প্রেসে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কোরিয়া যুদ্ধে বন্দী কয়েকজন পাইলট চীনদেশ ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে যে সব বিবৃতি প্রচার করেন, তাতে সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে যায়। সেই সময়ই বোধ হয় মগজধোলাই বা 'ব্রেইন ওয়াশিং' কথাটি পাভলভীয় পদ্ধতিতে কণ্ডিশনিং এর পরিবর্তে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এইসব যুদ্ধবন্দীদের পাভলভপদ্ধতিতে মগজ ধোলাই করার ফলে তারা ঐ সব বিবৃতি দিয়েছে—এই প্রচার আমেরিকায় ব্যাপকভাবে করা হয়। ১৯৫৬ সালে এডওয়ার্ড হাণ্টার নামে একজন সাংবাদিকের লেখা একটি পুস্তকে* পাভলভ ও লেনিন সম্পর্কে যে কুৎসা রচনা করা হয়, কিছু সৎ বিজ্ঞানীও সেগুলো গলাধঃকরণ করেন। অনেকের লেখনী এই সময় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারের নতুন উপলক্ষ পেয়ে সচল হয়ে ওঠে। উইলিয়াম সারজেণ্টের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এঁদের মগজধোলাই ও মনোহনন-এর অভিযোগের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন পাভলভ এবং তাঁর কণ্ডিশনিং পদ্ধতি। তাই পাঠকদের কাছে আমি পাভলভতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারবাদের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

এক সময়, ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছিল ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ফ্রয়েডীয় নিজ্ঞ্ানতত্ত্ব দ্বারা সীমিত করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ব্যক্তি মনে করে সে স্বাধীন, কিন্তু আসলে সে নিজ্ঞ্ানতাড়িত, সে এক অস্বেচ্ছিক বাধ্যকারী শক্তির অধীন। এই প্রচার দ্বারা বুর্জোয়া মনস্তত্ত্ব ধনতন্ত্রের বাধ্যকারিতা ও স্বেচ্ছাচারকে অন্যভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিল। আর আজ শেষ দশায়, ব্যবহারবাদী তত্ত্ব, মগজধোলাই ও মনোহননপদ্ধতিতে জনমানসকে নিয়ন্ত্রিত করে বুর্জোয়া সভ্যতা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট।

---

* Edward Hunter : Brain Washing—The Story of Men Who Defied It, New York, 1956